ফালুন গোংগ
法輪功

(বাংলা - প্রথম সংস্করণ)

লি হোংগ জি
李洪志

লুন্যু[1]

দাফা[2] হচ্ছে বিশ্বস্রষ্টার প্রজ্ঞা। এটাই সৃষ্টির ভিত্তিপ্রস্তর, যার উপরে এই স্বর্গ, মর্ত্য এবং বিশ্ব নির্মিত হয়েছে। ক্ষুদ্রতম থেকে বৃহত্তম, সমস্ত কিছুই এর অন্তর্ভুক্ত, অথচ বিভিন্ন জ্যোতিষ্কসমূহের (গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি) স্তরগুলির মধ্যে এর প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন। জ্যোতিষ্কসমূহের সব থেকে আণুবীক্ষণিক পর্যায় শুরু হওয়ার পরে প্রথমে সূক্ষ্মতম কণা আবির্ভূত হয়েছে, এরপরে ছোট থেকে বড়ো আকারের অসংখ্য কণার স্তরের পর স্তর রয়েছে, আরও বাইরের স্তরে পৌঁছে গেলে সেখানে আছে মানবজাতির অবগত পরমাণু, অণু, গ্রহ ও নক্ষত্রপুঞ্জ, এরও পরে আছে যা আরও বিশাল, বিভিন্ন আকারের কণা দিয়ে নির্মিত বিভিন্ন আকারের জীবন এবং বিভিন্ন আকারের জগৎ, যেগুলো বিশ্বের জ্যোতিষ্কসমূহের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। বিভিন্ন স্তরের কোনও একটি কণার জীবনগুলির কাছে পরবর্তী বৃহত্তর স্তরের কণাগুলি তাদের আকাশের গ্রহ হিসাবে প্রতীয়মান হয় এবং প্রত্যেকটি স্তরের ক্ষেত্রে এটা সত্য। বিশ্বের প্রতিটি স্তরের জীবনগুলির ক্ষেত্রে এটা সম্ভবত সীমাহীনভাবে হতে থাকবে। এই দাফাই রচনা করেছে সময় ও মাত্রা (dimension), বিপুল সংখ্যক জীবন ও প্রজাতি, এবং যাবতীয় সৃষ্টিকার্য; সমস্ত কিছুই এর অন্তর্গত, এর বাইরে কিছুই নেই। এগুলোই হচ্ছে দাফার প্রকৃতির, অর্থাৎ সত্য-করুণা-সহনশীলতার (জেন-শান-রেন)[3], বিভিন্ন স্তরে প্রকটিত নির্দিষ্ট রূপ।

বিশ্ব এবং জীবনের অনুসন্ধানের ব্যাপারে মানবজাতি যত উন্নত পন্থাই প্রয়োগ করুক না কেন, বিশ্বের নীচু স্তরের এই মাত্রাটার যে অংশে মানবজাতি বিরাজ করছে, তারা সেটুকুই শুধুমাত্র জানতে পেরেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে আবির্ভূত অনেকগুলো সভ্যতার সময়ে মানবজাতি অন্য গ্রহগুলোতে অনুসন্ধান করেছিল, কিন্তু তারা যতটা উচ্চতা এবং যতটা দূরত্বই উড়ে থাকুক না কেন, যে মাত্রাতে মানবজাতি বিরাজ করছে,

---

[1] লুন্যু - টিপ্পনী, বক্তব্য, মন্তব্য।

[2] দাফা - মহান পথ বা মহান বিধি ; মূল নীতি।

[3] জেন-শান-রেন - জেন (সত্য, সততা); শান (করুণা, সহমর্মিতা, সহানুভূতি, সমবেদনা, দয়া); রেন (সহনশীলতা, ধৈর্য্য, সহ্যশক্তি)।

সেটাকে তারা কখনোই অতিক্রম করতে পারে নি। এই বিশ্বের বাস্তব ছবিটা সম্ভবত মানবজাতির কাছে আবহ-মান কাল ধরে সত্যি সত্যিই অজানা থেকে যাবে। কোন মানুষ যদি এই বিশ্ব, সময়-মাত্রা এবং মানব শরীরের রহস্য সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে চায় তাহলে তাকে অবশ্যই একটা সৎপথে সাধনা করতে হবে, তাকে সত্যিকারের আলোকপ্রাপ্তি লাভ করতে হবে এবং তার নিজের জীবন সত্তার স্তরের উন্নতি ঘটাতে হবে। সাধনার মাধ্যমে যখন তার নৈতিক গুণের উন্নতি ঘটবে, তখন সে সত্যি সত্যি সদাচার থেকে কদাচারকে এবং ভালো থেকে মন্দকে আলাদা করতে পারবে, একই সাথে সে মানুষের স্তরের উর্দ্ধে উন্নীত হবে, একমাত্র তখনই সে বিশ্বের বিভিন্ন স্তরের ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার জীবনদের দেখতে পারবে এবং সত্যি সত্যি তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে।

মানবজাতি প্রযুক্তিবিদ্যা-সংক্রান্ত প্রতিযোগীতার জন্য বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানগুলি করে যাচ্ছে এবং দাবি করছে যে তারা জীবনের গুণগত মান উন্নত করতে চায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা আধ্যাত্মিকতা এবং আত্মসংযমরক্ষাকারী নৈতিকতা মূলগতভাবে বর্জন করছে। একমাত্র এই কারণগুলির জন্যই অতীতের মানবসভ্যতাগুলি অনেকবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অথচ মানবজাতি যা কিছু অনুসন্ধান করছে সেসব শুধুমাত্র পার্থিব জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, পদ্ধতিগুলো এইরকমই যে, কোন কিছু জ্ঞাত হলে একমাত্র তখনই সেটার উপরে গবেষণা করা হবে। এছাড়া মানবজাতির এই মাত্রার মধ্যে, যে জিনিসগুলো ধরাছোঁয়ার বাইরে এবং দর্শনাতীত, কিন্তু বস্তুগতভাবে বিদ্যমান এবং সত্য ঘটনা হিসাবে মানবজাতির বাস্তবিক ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হচ্ছে ----- যেমন আধ্যাত্মিকতা, ঈশ্বর বিশ্বাস, ঈশ্বরীয় বচন এবং অলৌকিকতা, লোকেরা এগুলোর সংস্পর্শে আসতেও সাহস করে না এবং তারা ঐশ্বরিকতা পরিত্যাগ করছে।

মানবজাতি যদি নৈতিকতার উপরে ভিত্তি করে তাদের স্বভাব, আচরণবিধি এবং চিন্তাধারার উন্নতিসাধন করতে পারে একমাত্র তাহলেই মানব সভ্যতা দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে এমন কি মানব-সমাজে আবার নতুন করে অলৌকিক ক্ষমতারও আবির্ভাব ঘটবে। অতীতে মানবসমাজে জনসাধারণের সংস্কৃতির মধ্যে মানবতার মতন আধ্যাত্মিকতাও অনেকবার আবির্ভূত হয়েছিল, এবং মানবজাতিকে জীবন ও বিশ্ব সম্বন্ধে

সত্যিকারের উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছিল। যখন জনগণ এই পৃথিবীতে দাফার প্রকটিত রূপের প্রতি যথাযথ আন্তরিকতা এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবে তখন সেই লোকেরা, তাদের জাতি এবং তাদের দেশ অর্জন করবে আশীর্বাদ, সম্মান ও সমৃদ্ধি। যে জীবন দাফার থেকে দূরে চলে যাবে সে সত্যি সত্যিই নীতিভ্রষ্ট হয়ে যাবে, কারণ জ্যোতিষ্কসমূহ, বিশ্ব, জীবন এবং বিশ্বের সমস্ত সৃষ্টিকার্য দাফার থেকেই উৎপন্ন হয়েছে; যে ব্যক্তি দাফার সাথে মিলে যেতে পারবে সে সত্যি সত্যিই একজন ভালো মানুষ হয়ে যাবে এবং একই সাথে সে ভালো কাজের জন্য পুরষ্কৃত হবে, সে আশীর্বাদের সঙ্গে সঙ্গে সুখ এবং দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হবে। যে সাধক দাফার সাথে এক হয়ে যেতে পারবে সে হবে আলোকপ্রাপ্ত------এক ঐশ্বরিক সত্তা।

লি হোংগ জি
May 24,2015

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

লুন্য

অধ্যায়-এক ভূমিকা 1

1. চিগোংগের উৎপত্তি 2

2. চি এবং গোংগ 5

3. গোংগ সামর্থ্য (গোংগ লি) এবং অলৌকিক ক্ষমতা 6

(1) গোংগ সামর্থ্য চরিত্রের (শিনশিংগ) সাধনার উপরে নির্ভর করে বিকশিত হয় 6

(2) সাধক অলৌকিক ক্ষমতার পেছনে ছুটবে না 7

(3) গোংগ সামর্থ্যকে আয়ত্তে রাখা 10

4. দিব্যচক্ষু 11

(1) দিব্যচক্ষুর উন্মোচন 11

(2) দিব্যচক্ষুর স্তর 13

(3) দূর নিরীক্ষণ 16

(4) মাত্রা 17

5. চিগোংগ চিকিৎসা এবং হাসপাতালের চিকিৎসা 19

6. বুদ্ধমতের চিগোংগ এবং বৌদ্ধধর্ম 22

(1) বুদ্ধমতের চিগোংগ 23

(2) বৌদ্ধধর্ম 24

7. সৎ সাধনা এবং অসৎ সাধনা 26

(1) পার্শ্বদ্বার গোলমেলে পথ (*প্যাংগমেন জুয়োতাও*) 26

(2) রণক্রীড়া (Martial Arts) চিগোংগ 27

(3) বিপরীত সাধনা এবং গোংগ ঋণ 28

(4) মহাজাগতিক ভাষা 29

(5) প্রেত ভর করা 31

(6) সৎ সাধনা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও অশুভ অনুশীলন হতে পারে 32

অধ্যায়-দুই ফালুন গোংগ 33

1. ফালুনের কার্যকারিতা 33

2. ফালুনের গঠন 35

3. ফালুন গোংগ সাধনার বৈশিষ্ট্য 36

(1) ফা অনুশীলনকারীকে শোধন করছে 36

(2) মুখ্য চেতনার সাধনা 38

(3) শারীরিক ক্রিয়ার আনুশীলনে দিক বা সময়ের বিবেচনা করা হয় না ... 40

4. মন এবং শরীরের যুগ্ম সাধনা 41

(1) মূল শরীরের পরিবর্তন 41

(2) ফালুন ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ 43

(3) শক্তিনাড়ীর উন্মোচন 45

5. মানসিক ইচ্ছা 46

6. ফালুন গোংগ সাধনার স্তর 49

(1) উঁচুস্তরের সাধনা 49

(2) গোংগ-এর প্রকাশ 50

(3) বহিঃ ত্রিলোক ফা সাধনা 51

অধ্যায় - তিন চরিত্রের *(শিনশিংগ)* সাধনা 53

1. চরিত্রের অন্তনির্হিত অর্থ 53
2. ত্যাগ ও প্রাপ্তি 55
3. সত্য, করুণা এবং সহনশীলতার একসঙ্গে সাধনা 59
4. ঈর্ষা দূর করা 61
5. আসক্তি দূর করা 64
6. কর্ম 66
   (1) কর্মের উৎপত্তি 66
   (2) কর্ম দূর করা 69
7. আসুরিক বাধা 72
8. জন্মগত সংস্কার এবং আলোকপ্রাপ্তির গুণ 74
9. পরিস্কার ও বিশুদ্ধ মন 78

অধ্যায়-চার ফালুন গোংগ অনুশীলন পদ্ধতি 81

1. বুদ্ধ সহস্রহস্ত প্রসারণ ক্রিয়া (*ফো ঝান চিয়েন শোউ ফা*) 82
2. ফালুন দন্ডায়মান অবস্থান ক্রিয়া (*ফালুন ঝুয়াংগ ফা*) 94
3. বিশ্বের দুই প্রান্ত ভেদ ক্রিয়া (*গুয়ান থংগ লিয়াংগ জি ফা*) 99
4. ফালুন ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ ক্রিয়া (*ফালুন ঝোউ থিয়েন ফা*) 105
5. ঐশ্বরিক ক্ষমতার শক্তিবৃদ্ধি ক্রিয়া (*শেন থংগ জিয়া চি ফা*) 113

ফালুন গোংগ অনুশীলনের জন্য কিছু মূল আবশ্যকতা ও মনোযোগের বিষয় 124

অধ্যায়-পাঁচ প্রশ্ন ও উত্তর 127

1. ফালুন এবং ফালুন গোংগ 127

2. অনুশীলনের তত্ত্ব এবং পদ্ধতি 132

3. চরিত্রের সাধনা 160

4. দিব্যচক্ষু 167

5. দুর্ভোগ 177

6. মাত্রা এবং মানবজাতি 179

অধ্যায়-এক
ভূমিকা

আমাদের দেশে (চীন), *চিগোংগ*[4] প্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে এবং এর একটা লম্বা ইতিহাস আছে। সেইজন্য আমাদের লোকেদের চিগোংগ অনুশীলন করার জন্য প্রকৃতিগতভাবে সুবিধাজনক পরিস্থিতি রয়েছে। সৎ সাধনা পদ্ধতি হিসাবে পরিগণিত বুদ্ধ এবং তাও[5], এই দুটো চিগোংগ মতের অনেক মহান সাধনা পথ ইতিমধ্যে জনগণের মধ্যে প্রচলিত হয়ে আছে যেসব পূর্বে একান্তে শেখানো হতো। তাও মতের সাধনা পদ্ধতি খুবই অনুপম, আবার বুদ্ধমতেরও নিজস্ব সাধনা পদ্ধতি রয়েছে। ফালুন[6] গোংগ হচ্ছে বুদ্ধমত চিগোংগের এক উচ্চস্তরের সাধনা পথ। এই বক্তৃতামালায় আমি তোমাদের শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করে উচ্চস্তরে সাধনার উপযুক্ত একটা অবস্থায় নিয়ে যাব। তারপরে আমি তোমাদের শরীরে ফালুন এবং শক্তির যন্ত্রকৌশল স্থাপন করব। আমি তোমাদের শারীরিক ক্রিয়াও শেখাব। এসব কিছুরও উপরে আমার ফা-শরীর (*ফাশেন*)[7] আছে, যে তোমাদের রক্ষা করবে। কিন্তু শুধু এই জিনিসগুলোও খুব যথেষ্ট নয়, কারণ এগুলো দিয়েও গোংগ[8] বিকশিত হওয়ার লক্ষ্যটা অর্জন করা যাবে না, তোমরা অবশ্যই উচ্চস্তরের সাধনার তত্ত্বগুলিও উপলব্ধি করবে। সেগুলোই হচ্ছে এই বইয়ের বর্ণিত বিষয়বস্তু।

---

[4]চিগোংগ - চীনদেশীয় প্রথাগত পদ্ধতি যা ‘‘চি’’ অথবা ‘‘জীবনীশক্তির’’ সাধনা করে। বর্তমানে চিগোংগ পদ্ধতি চীন দেশে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়েছে।

[5]তাও - যা ‘‘দাও’’ নামেও পরিচিত, তাও শব্দের অর্থ ‘‘প্রকৃতি এবং বিশ্বের পথ’’; মহান আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি, যিনি তাও প্রাপ্তি করেছেন।

[6]ফালুন - ধর্মচক্র বা বিধিচক্র ; ফা - বিধি, ধর্ম, নিয়ম, বুদ্ধমতের মূল নীতি ; লুন - চক্র বা চাকা।

[7]ফা-শরীর (ফাশেন) - ধর্ম শরীর বা ধর্ম-কায়া; গোংগ এবং ফা দিয়ে তৈরি শরীর।

[8]গোংগ - 1. সাধনা শক্তি; 2. যে পদ্ধতিতে এই শক্তির জন্য সাধনা করা হয়।

আমি উচ্চস্তরের সাধনা প্রণালী শেখাব, সেইজন্য আমি সাধনার ক্ষেত্রে কোন নাড়ীর কথা, আকুপাংচার বিন্দুর কথা অথবা শক্তিপথের কথা বলব না, আমি সাধনার এক মহান পথ(দাফা)-এর শিক্ষা প্রদান করব, যা সত্যি সত্যি এক উচ্চস্তরের সাধনা পথ। শুরুতে এটা শুনে সম্ভবত অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু সংকল্পযুক্ত চিগোংগ শিক্ষার্থীরা যতক্ষণ মনোযোগের সঙ্গে এই সাধনার অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে থাকবে, ততই তারা এর মধ্যে সমস্ত রহস্য এবং গভীরতার সন্ধান পাবে।

1.চিগোংগের উৎপত্তি

বর্তমানে আমরা যাকে চিগোংগ বলি, তাকে প্রকৃতপক্ষে চিগোংগ বলা হতো না। এর উৎপত্তি হয়েছে প্রাচীন চীন দেশের লোকেদের একান্ত সাধনার থেকে এবং ধর্মীয় সাধনার থেকে। *দ্যান জিংগ, তাও জাংগ,*[9]এবং *ত্রিপিটক*[10]এই বইগুলির কোথাও এই দুই অক্ষরের শব্দ ‘চি গোংগ’ এর উল্লেখ নেই। আমাদের এই বর্তমান মানবসভ্যতার বিকাশক্রমে চিগোংগ এমন একটা সময়ের মধ্য দিয়ে গেছে যখন ধর্মগুলি অপরিণত অবস্থায় ছিল। ধর্মগুলির বিকাশের পূর্বেও চিগোংগের অস্তিত্ব ছিল। ধর্মগুলি তৈরি হওয়ার পরে এর মধ্যে কিছুটা ধর্মীয় রঙ-এর প্রভাব এসে যায়। চিগোংগ-এর আদি নামগুলি ছিল ‘‘বুদ্ধের মহান সাধনা পথ,’’ ‘‘তাও এর মহান সাধনা পথ,’’ এর আরও নাম ছিল ‘‘নবম আবর্তনযুক্ত আভ্যন্তরীণ রসায়ন,’’ ‘‘অর্হৎ[11]-এর পথ,’’ ‘‘বজ্রর ধ্যান’’ ইত্যাদি। আমরা এখন একে চিগোংগ বলি যাতে এটা আমাদের আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে আরও মানানসই হয়, এবং আরও সহজে সমাজে জনপ্রিয় হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের চীন দেশে এই চিগোংগ হচ্ছে পুরোপুরি মানব শরীরের সাধনার জিনিস।

চিগোংগ আমাদের এই পর্বের মানব সভ্যতার দ্বারা উদ্ভাবিত জিনিস নয়। এর ইতিহাস খুবই লম্বা এবং বহু কাল আগে থেকে চলে

---

[9]দ্যান জিংগ, তাও জাংগ - সাধনার জন্য প্রাচীন চীনের ধর্মগ্রন্থ।

[10]ত্রিপিটক - পালি ভাষায় বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ।

[11]অর্হৎ - একজন আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি, বুদ্ধমত অনুযায়ী যার সিদ্ধিলাভ জনিত অবস্থান ত্রিলোকের উপরে কিন্তু বোধিসত্ত্বের নীচে।

আসছে। তাহলে চিগোংগ কোন্ সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল? কেউ কেউ বলে চিগোংগ-এর ইতিহাস তিন হাজার বছরের এবং তাংগ রাজবংশের[12] সময়ে এটা খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। কিছু লোক বলে এর ইতিহাস পাঁচ হাজার বছরের যা চীনের সভ্যতার মতই প্রাচীন। প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষগুলো দেখে কিছু লোক বলে এর ইতিহাস সাত হাজার বছরের, আমি দেখেছি যে, চিগোংগ এখনকার এই মানব সভ্যতার দ্বারা উদ্ভাবিত হয় নি। এটা প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিদের অনুসন্ধান অনুযায়ী, আমরা যে বিশ্বে বসবাস করি সেটা ইতিমধ্যেই 'নয়'বার বিস্ফোরণের পরেও পুনর্গঠন করা হয়েছে। যে গ্রহে আমরা জীবনযাপন করি সেটাও অনেকবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। প্রত্যেকবারে সবকিছু একত্রিত করে গ্রহটিকে নতুন করে গঠন করার পরে, আবার নতুন করে মানবজাতির বংশবৃদ্ধি ঘটেছে। বর্তমানে আমরা অনেক জিনিস ইতিমধ্যে এই পৃথিবীতে আবিষ্কার করেছি যেগুলো এখনকার সভ্যতারও পূর্বের। ডারউইনের বিবর্তনের তত্ত্ব অনুযায়ী, মানুষ বানরের থেকে বিবর্তিত হয়ে এসেছে, এবং এই মানব সভ্যতা দশ হাজার বছরও অতিক্রম করে নি। অথচ প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের দ্বারা ইউরোপের আল্পস পর্বতমালার গুহার মধ্যে দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বের দেওয়ালচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যাদের শৈল্পিকমূল্য খুব উঁচু এবং আমাদের এখনকার লোকেদের ক্ষমতার বাইরে। পেরুর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জাদুঘরে একটা বড় পাথরের উপরে একটা মানুষের প্রতিকৃতি খোদাই করা আছে, মানুষটি একটি দূরবিন দিয়ে জ্যোতিষ্ক পর্যবেক্ষণ করছে, এই প্রতিকৃতিটার ইতিহাস ত্রিশ হাজার বছরেরও বেশী। সবাই জান গ্যালিলীও, 1609 সালে 30xমহাকাশীয় দূরবিন উদ্ভাবন করেছিল এখন থেকে 300 বছরের কিছু পূর্বে, তাহলে ত্রিশ হাজার বছর আগে কোথা থেকে দূরবিন এল? ভারতবর্ষে একটা লোহার স্তম্ভ আছে, এই লোহাটা নিরানব্বই ভাগেরও বেশী খাঁটি, এমন কি আধুনিক ধাতু বিগলন প্রযুক্তি ব্যবহার করেও এত উঁচুমানের খাঁটি লোহা তৈরি করা সম্ভব নয়, যা ইতিমধ্যে আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার মানকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। ওই সভ্যতাগুলোকে কারা সৃষ্টি করেছিল? মানবজাতি সে সময়ে, যারা সম্ভবত জীবানু ছিল, কীভাবে এই সব জিনিস সৃষ্টি করেছিল? এই সব জিনিস আবিষ্কৃত হওয়ার কারণে পৃথিবী জুড়ে বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকর্ষিত হল। যেহেতু তারা কোনও

[12]তাংগ রাজবংশ - চীনের ইতিহাসে সবথেকে সমৃদ্ধশালী একটা সময়কাল (618 A.D. – 907A.D.)

ব্যাখ্যা দিতে পারল না, সেইজন্য তারা এগুলোর নাম দিল প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা।

এমন কি প্রত্যেকটা সভ্যতার পর্বের বিজ্ঞানের মানও আলাদা আলাদা ছিল, কয়েকটা পর্বে বিজ্ঞানের মান খুব উঁচু ছিল যা আমাদের বর্তমান মানবজাতির মানকে অতিক্রম করে গিয়েছিল। কিন্তু সেসব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেছে, সেইজন্য আমি বলছি, যে এখনকার লোকেরা এই চিগোংগের উদ্ভাবন বা সৃষ্টি করে নি, তবে এখনকার লোকেরা এটা আবিষ্কার করেছে এবং এর উন্নতি ঘটিয়েছে, এটা প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি।

চিগোংগ অবশ্যই আমাদের দেশের নিজস্ব বস্তু নয়, বিদেশেও এর অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু তারা একে চিগোংগ বলে না, পশ্চিমের দেশগুলোতে, যেমন, আমেরিকা, ইংল্যান্ড ইত্যাদি এই সব দেশে একে জাদুবিদ্যা বলে। আমেরিকাতে একজন জাদুকর আছেন, যিনি প্রকৃতপক্ষে অলৌকিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে একজন উঁচুস্তরের শিক্ষক, তিনি একবার চীনের মহান প্রাচীর ভেদ করা প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি প্রাচীর ভেদ করার সময়ে একটা সাদা কাপড় ব্যবহার করে নিজেকে ঢেকে নিয়েছিলেন, নিজেকে প্রাচীরে সেঁটে নিয়ে, তারপরে প্রাচীর ভেদ করে বেরিয়ে এসেছিলেন। তিনি ওটা কেন করেছিলেন? এইভাবে করার ফলে, বেশীরভাগ লোক ওটাকে জাদুর প্রদর্শনী মনে করেছিল। কারণ হচ্ছে এইভাবে না করলে ব্যাপারটা ঠিক হতো না। তিনি জানতেন আমাদের চীন দেশে অনেক উঁচুমানের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি আছেন, তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে, তাঁরা বাধা সৃষ্টি করতে পারেন, সেইজন্য তিনি প্রাচীর ভেদ করার পূর্বে নিজেকে ঢেকে নিয়েছিলেন। আবার বেরিয়ে আসার সময়ে, একটা হাত প্রসারিত করে কাপড়টা মাথার উপর থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে হেঁটে বাইরে এসেছিলেন। ‘‘দক্ষ ব্যক্তি কৌশলের প্রতি লক্ষ্য রাখে আর সাধারণ মানুষ রোমাঞ্চের সন্ধান করে।’’ [13] এইভাবে দর্শকরা মনে করেছিল এটা জাদু প্রদর্শনী। তাদের এই সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতাগুলোকে জাদুবিদ্যা বলা হয়, কারণ তারা এই জিনিসগুলিকে মানব শরীরের সাধনার জন্য ব্যবহার করে না। তারা মঞ্চের উপরে বিস্ময়কর অনুষ্ঠান প্রদর্শন করে দর্শকদের মনোরঞ্জন করে। নীচুস্তরের চিগোংগ কোন ব্যক্তির শারীরিক অবস্থার

---

[13] ‘‘দক্ষ ব্যক্তি কৌশলের প্রতি লক্ষ্য রাখে আর সাধারণ মানুষ রোমাঞ্চের সন্ধান করে।’’- চীনের প্রবাদবাক্য

পরিবর্তন ঘটাতে পারে এবং ব্যক্তির রোগ দূর করে শরীর সুস্থ রাখার লক্ষ্যটা অর্জন করতে পারে, আর উচ্চস্তরের চিগোংগ, ব্যক্তির মূল শরীর (বেন্তি)[14]-এর সাধনাকে ইঙ্গিত করে।

2.চি এবং গোংগ

এখন আমরা যাকে *চি*[15] বলি, প্রাচীন কালে লোকেরা তাকে *ছি* বলত। দুটো শব্দ মূলত একই, কারণ এই দুটোই বিশ্বের চি-কে নির্দিষ্ট করে যা এই বিশ্ব জুড়ে অবস্থিত এক ধরনের অদৃশ্য, নিরাকার পদার্থ। চি বায়ুকে ইঙ্গিত করে না। সাধনার মাধ্যমে এই পদার্থের শক্তিটা মানব শরীরের মধ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে, যা ভৌতিক শরীরের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় এবং রোগ দূর করে শরীরকে সবল করে তোলে। কিন্তু চি শুধু চি-ই, তোমারও চি আছে, তারও চি আছে, একটা চি আর একটা চি-কে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কিছু লোক বলে চি রোগ নিরাময় করতে পারে অথবা তুমি কিছুটা চি নিঃসৃত করে কাউকে দিলে তারও রোগ নিরাময় হয়ে যাবে। এই সমস্ত মন্তব্য খুবই অবৈজ্ঞানিক। কারণ চি একেবারেই রোগ নিরাময় করতে পারে না। অনুশীলনকারীর শরীরে এখনও চি থাকার অর্থ হচ্ছে তার শরীর এখনও দুগ্ধ-শুভ্র শরীর হয় নি, অর্থাৎ তার এখনও রোগ আছে।

যে ব্যক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে উন্নত ক্ষমতা প্রাপ্ত করেছে, সে চি নিঃসৃত করে না, পরিবর্তে গুচ্ছ গুচ্ছ উচ্চশক্তি নির্গত করতে থাকে। এই উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থটি আলোর রূপ নিয়ে প্রকাশমান হয়, এর কণাগুলি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় এবং এর ঘনত্বও খুব বেশী হয়, এটাই হচ্ছে গোংগ যা সাধারণ লোকেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে, এবং একমাত্র এটাই রোগ নিরাময় করতে পারে। একটা কথা প্রচলিত আছে, ‘‘বুদ্ধ আলো সর্বত্র আলোকিত করে এবং সমস্ত অস্বাভাবিকতাকে সংশোধন করে,’’ এর অর্থ যারা সত্যিকারের সাধনা করে, তারা শরীরে প্রচন্ড শক্তি বহন করে। এই ব্যক্তি যে স্থান দিয়ে যাবে, সেখানেই তার এই শক্তি তার পরিধির অন্তর্ভুক্ত এলাকার মধ্যে যে কোনও অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে ত্রুটিমুক্ত করে

---

[14]মূল শরীর (বেন্তি)- ব্যক্তির ভৌতিক শরীর এবং অন্য সব মাত্রার শরীর।

[15]চি - চীনের সংস্কৃতি অনুযায়ী এটি প্রাণশক্তি বা জীবনীশক্তি, কিন্তু গোংগ-এর তুলনায় নিম্নস্তরের শক্তি।

এবং স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনে। ঠিক যেমন, কোন ব্যক্তির শরীরে রোগ থাকাটা তার শরীরের পক্ষে অস্বাভাবিক অবস্থা, এই অবস্থাটা সংশোধিত হয়ে গিয়ে তার রোগটাও দূর হয়ে যাবে। আরও সাধারণভাবে বলা যায় গোংগ একটা শক্তি, গোংগ-এর পদার্থগত বৈশিষ্ট্য আছে, অনুশীলনকারীরা সাধনার মাধ্যমে বস্তুগতভাবে এর উপস্থিতি অনুভব করতে পারে এবং উপলব্ধি করতে পারে।

3.গোংগ সামর্থ্য (গোংগ লি) এবং অলৌকিক ক্ষমতা

(1) গোংগ সামর্থ্য চরিত্রের (শিনশিংগ)[16] সাধনার উপরে নির্ভর করে বিকশিত হয়

যে গোংগ-এর দ্বারা কোনও ব্যক্তির প্রকৃত গোংগ সামর্থ্যের স্তর নির্ধারণ করা হয়, সেটা শারীরিক ক্রিয়া করার মাধ্যমে বিকশিত হয় না। এটা সদ্‌গুণ(*দ্য*)[17] পদার্থটির রূপান্তরের দ্বারা এবং চরিত্রের সাধনার উপরে নির্ভর করে বিকশিত হয়। এই রূপান্তর প্রক্রিয়াটা সাধারণ লোকেদের কল্পনার মত, চুল্লির উপরে গলনাধার স্থাপন করে তার মধ্যে *দ্যান*[18]তৈরি করার জন্য ঔষধীয় জড়িবুটি একত্রিত করা[19] নয়। আমাদের উল্লেখিত গোংগ শরীরের বাইরে উৎপন্ন হয় এবং শরীরের নীচের ভাগ থেকে শুরু হয়; চরিত্রের উন্নতির সাথে সাথে এটা পাক খেয়ে খেয়ে উপরের দিকে বাড়তে থাকে, শরীরের বাইরেই পুরোটা তৈরি হয়, এর পরে মাথার উপরে উঠে এটা গোংগ স্তম্ভ তৈরি করে। এই গোংগ স্তম্ভের উচ্চতার দ্বারাই সেই ব্যক্তির গোংগের উচ্চতা নির্ধারণ করা হয়। গোংগ স্তম্ভ খুব গভীর মাত্রার অন্তরালে থাকে, সাধারণ লোকেরা সহজে দেখতে পারে না।

---

[16] চরিত্র (শিনশিংগ) - মন এবং হৃদয়ের প্রকৃতি, স্বভাব।

[17] সদ্‌গুণ (দ্য) - সৎকর্ম বা সদাচার, ব্যক্তির শরীরে অবস্থিত একটি সাদা পদার্থ।

[18]দ্যান - সাধকের শরীরে অবস্থিত শক্তিপুঞ্জ, যা অন্য ম্যত্রা থেকে সংগৃহীত।

[19]এটা তাও মত অনুযায়ী, শরীরের আভ্যন্তরীণ রসায়নের একটা পরোক্ষ উপমা।

অলৌকিক ক্ষমতা নির্ভর করে গোংগ সামর্থ্যের শক্তিশালী হওয়ার উপরে। গোংগ সামর্থ্য উঁচু হলে, ব্যক্তির স্তরও উঁচু হয়, অলৌকিক ক্ষমতাও বেশী হয়, এবং এর প্রয়োগও সহজতর হয়। যাদের গোংগ সামর্থ্য কম থাকে তাদের অলৌকিক ক্ষমতা কম হয়, তাদের পক্ষে এর প্রয়োগও কঠিন হয়ে যায়, এমন কি ব্যবহারও করতে পারে না। শুধু অলৌকিকক্ষমতা দেখে, কোন ব্যক্তির গোংগ সামর্থ্য বেশী না কম, অথবা ব্যক্তির সাধনার স্তর, এসব কোন কিছুই বিচার করা যায় না। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির স্তর তার গোংগ সামর্থ্য দিয়েই নির্ধারণ করা যায়, অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে নয়। কিছু লোক শরীরের সবকিছুতে ''তালাবন্ধ'' পন্থা প্রয়োগ করা অবস্থায় সাধনা চালিয়ে যায়, এবং এদের গোংগ সামর্থ্য খুব উঁচু থাকে, কিন্তু এটা আবশ্যক নয় যে এরা অনেক অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবে। এব্যাপারে গোংগ সামর্থ্যই হচ্ছে নির্ধারণকারী এবং এটা চরিত্রের সাধনার দ্বারা বিকশিত হয়, যা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস।

(2) সাধক অলৌকিক ক্ষমতার পেছনে ছুটবে না

সব সাধকেরই অলৌকিক ক্ষমতার প্রতি উৎসাহ থাকে। জাদুক্ষমতা সমাজে খুবই আকর্ষণীয়, অনেক লোকই কিছু অলৌকিক ক্ষমতা পেতে চায়। কিন্তু চরিত্র উন্নত না হলে অলৌকিক ক্ষমতা পাওয়া যাবে না।

সাধারণ লোকেরা সম্ভবত কিছু অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে যেমন, দিব্য চক্ষু(তিয়ান মু)[20] খুলে যাওয়া, দূর শ্রবণ, টেলিপ্যাথি, পূর্বাভাস ইত্যাদি। কিন্তু পর্যায়ক্রমিক আলোকপ্রাপ্তির অবস্থায় সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতার উদয় হয় না, যেহেতু এসব এক একজনের ক্ষেত্রে এক একরকম হয়। কিছু অলৌকিক ক্ষমতা সাধারণ লোকের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব, যেমন এই ভৌতিক মাত্রায়, এক ধরনের বস্তুকে আর এক ধরনের বস্তুতে পরিবর্তিত করা, এটা সাধারণ লোকের পক্ষে করা অসম্ভব। মহান অলৌকিক ক্ষমতাগুলিকে শুধুমাত্র জন্মের পরে সাধনার মাধ্যমে বিকশিত করা যায়। ফালুন গোংগ-এর বিকাশ ঘটেছে বিশ্বের মূল তত্ত্বের উপরে ভিত্তি করে, সেইজন্য বিশ্বের সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতাই ফালুন গোংগ-এর মধ্যে বিদ্যমান, একজন ব্যক্তি কীভাবে সাধনা করছে, তার উপরেই

---

[20]দিব্যচক্ষু (তিয়ান মু) - তৃতীয় নয়ন হিসাবেও পরিচিত।

এগুলোর বিকাশ নির্ভর করে। কিছু অলৌকিক ক্ষমতা পাওয়ার কথা চিন্তা করলে সেটা দোষের ব্যাপার নয়, কিন্তু এগুলোর জন্য অতিরিক্ত প্রয়াস করাটা স্বাভাবিক চিন্তা নয়, এবং একটা ক্ষতিকর পরিণাম সৃষ্টি হয়। নীচু স্তরে অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়ার খুব একটা প্রয়োজন নেই, সেক্ষেত্রে সে সাধারণ লোকেদের মধ্যে নিজের পারদর্শিতা প্রদর্শন করতে চাইবে এবং নিজে তাদের মধ্যে ক্ষমতাবান হতে চাইবে। যদি এইরকম হয়, তাহলে এটা বাস্তবিক প্রমাণ করে যে ব্যক্তির চরিত্রের মান উঁচু নয় এবং তাকে অলৌকিক ক্ষমতাটা দেওয়াটা ঠিক নয়। যার চরিত্র উঁচু নয়, তাকে যদি কিছু অলৌকিক ক্ষমতা দেওয়া হয়, তাহলে সে দুষ্কর্ম করতে পারে, যেহেতু তার চরিত্র দৃঢ় নয় সেইজন্য এটা নিশ্চিত নয় যে সে দুষ্কর্ম করবে না।

অপরদিকে কোনও একটা অলৌকিকক্ষমতা প্রদর্শন করে বা উপস্থাপন করে মানব সমাজে পরিবর্তন ঘটানো যায় না অথবা স্বাভাবিক সামাজিক জীবনযাত্রাকে পাল্টানো যায় না। সত্যিকারের উঁচুস্তরের অলৌকিক ক্ষমতাকে বাইরে এনে প্রদর্শন করতে দেওয়া যায় না, কারণ এর প্রভাব এবং বিপদ খুবই বেশী। ঠিক যেমন, শুধুমাত্র প্রদর্শনের জন্য একটা বৃহৎ অট্টালিকাকে কখনোই মাটিতে নামিয়ে আনতে পার না। বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে আসা ব্যক্তি ছাড়া, মহান অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে দেওয়া হয় না, এবং প্রকাশ করতেও দেওয়া হয় না, কারণ উঁচুস্তরের মাস্টাররা এসব নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন।

কিন্তু কিছু সাধারণ মানুষ বার বার চিগোংগ মাস্টারদের প্রদর্শন করার জন্য জোর করতে থাকে এবং অলৌকিক ক্ষমতা দেখানোর জন্য বাধ্য করে। অলৌকিকক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি এসবের প্রদর্শনে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, যেহেতু এসব প্রকাশে নিষেধ আছে এবং এসবের প্রদর্শনে সম্পূর্ণ সামাজিক অবস্থার উপরে প্রভাব পড়ে। সত্যিকারের মহান সদ্‌গুণযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতে অনুমতি দেওয়া হয় না। এসব প্রদর্শনের সময়ে কোন কোন চিগোংগ মাস্টার খুব অস্বস্তি বোধ করে এবং এর জন্য পরবর্তীকালে তাদের খুব করে কাঁদতে ইচ্ছা হয়। তোমরা অবশ্যই তাদের প্রদর্শন করার জন্য জোর করবে না! এই সব জিনিস প্রকাশ করা তাদের পক্ষে কষ্টকর। একজন শিক্ষার্থী একটা সাময়িক পত্রিকা নিয়ে এসেছিল। একবার দেখেই আমার ভীষণ বিরক্তি বোধ হয়েছিল। এতে আন্তর্জাতিক চিগোংগ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার উল্লেখ ছিল, সেখানে

অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা একটা প্রতিযোগীতায় অংশ গ্রহণ করবে, যাদের বিরাট অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তারা অংশ গ্রহণ করতে পারবে। এটা পড়ার পরে, বেশ কয়েকদিন আমি বিচলিত বোধ করেছিলাম। অলৌকিক ক্ষমতাগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রতিযোগিতায় প্রদর্শনের জিনিস নয়, জনসাধারণের মধ্যে প্রদর্শন করাটা দুঃখজনক। সাধারণ মানুষ পার্থিব জগতের বাস্তবসম্মত জিনিসগুলোর প্রতি মনোযোগ দিয়ে থাকে, কিন্তু একজন চিগোংগ মাস্টারের আত্মসম্মান বজায় রাখা উচিৎ।

অলৌকিক ক্ষমতা চাওয়ার উদ্দেশ্যটা কি? এটা সাধকের মানসিক গঠন এবং তার প্রবল আকাঙ্খাকে প্রতিফলিত করে। অসৎ আকাঙ্খা এবং অনির্ভরযোগ্য মন নিয়ে উঁচু স্তরের অলৌকিক ক্ষমতাগুলোকে পাওয়া যায় না। এর কারণ সম্পূর্ণ আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বে তুমি যা কিছু ভালো বা খারাপ দেখছ সেটা শুধুমাত্র এই পৃথিবীর আদর্শের উপরে ভিত্তি করে দেখছ, সেইজন্য তুমি কোন জিনিসের সত্যটা দেখতে পারছ না এবং তার পূর্বনির্ধারিত কর্মের সম্পর্কটাও দেখতে পারছ না। সাধারণ লোকেদের মধ্যে লড়াই করা, অপমান করা, খারাপ ব্যবহার করা সব কিছুরই পূর্বনির্ধারিত কর্মের সম্পর্ক রয়েছে, তুমি যদি এগুলোকে পুরোপুরি বুঝতে না পার, তাহলে সাহায্যের পরিবর্তে কেবল বাধাই সৃষ্টি করবে। সাধারণ লোকেদের কৃতজ্ঞতা, এবং বিরক্ত হওয়া, ঠিক এবং ভুল, সবই এই পৃথিবীর নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হয়, সাধকের এই সব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা উচিৎ নয়। যেহেতু তুমি পূর্ণ আলোকপ্রাপ্ত হও নি, সুতরাং তোমার চোখ দিয়ে তুমি যেটা দেখছ সেটা নিশ্চিতভাবে সত্যি নাও হতে পারে। যখন কেউ কাউকে ঘুষি মারছে, তখন তারা হয়তো কর্মের ঋণ মিটিয়ে নিচ্ছে। তোমার হস্তক্ষেপে হয়তো তাদের কর্মের ঋণ মেটানোর ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। ‘‘কর্ম’’ হচ্ছে মানুষের শরীরকে ঘিরে থাকা একটা কালো বস্তু, যা অন্য মাত্রাতে বস্তুগতভাবে বিদ্যমান এবং যা রূপান্তরিত হয়ে রোগ এবং দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করতে পারে।

প্রত্যেকটা মানুষেরই অলৌকিক ক্ষমতা আছে এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, নিরন্তর সাধনার মাধ্যমে এগুলোর বিকাশ ঘটানো এবং শক্তিবৃদ্ধি করা। সাধক হিসাবে যদি একজন ব্যক্তি শুধু অলৌকিক ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করে যায় তবে সে অদূরদর্শী এবং তার মন অসৎ। যাই হোক, সে অলৌকিক ক্ষমতা যে কারণের জন্যই অর্জনের প্রয়াস করুক না

কেন তার মধ্যে স্বার্থপর মানসিকতা রয়ে গেছে, যা অবশ্যই সাধনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে, তার ফলে সে অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে না।

(3) গোংগ সামর্থ্যকে আয়ত্তে রাখা

কিছু সাধক বেশী সময় অনুশীলন করেনি, তবুও কার্যকারিতা দেখার জন্য, অন্যদের চিকিৎসা করতে চায়, গোংগ সামর্থ্য উঁচু নয়, এইরকম ব্যক্তি হিসাবে তুমি হাত প্রসারিত করে একবার চেষ্টা করলে, তুমি রোগীর শরীরের প্রচুর পরিমাণ কালো চি, অস্বাস্থ্যকর চি এবং কর্দমাক্ত চি, তোমার নিজের শরীরে শোষণ করে নেবে। যেহেতু অস্বাস্থ্যকর চি-কে প্রতিহত করার ক্ষমতা তোমার নেই, আবার তোমার শরীরে কোনও সুরক্ষা কবচও নেই, সেক্ষেত্রে তুমি, অসুস্থ রোগীর সাথে থেকে একত্রে একটা ক্ষেত্র তৈরি করে ফেল, তোমার গোংগ সামর্থ্য উঁচু না হলে অস্বাস্থ্যকর চি থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না, তুমি নিজে অনেক অস্বস্তি অনুভব করবে। যদি কেউ তোমার প্রতি লক্ষ্য না রাখে, তাহলে একটা সময়ের পরে রোগটা তোমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়বে। সেইজন্য যাদের গোংগ সামর্থ্য উঁচু নয়, তাদের পক্ষে অন্যদের রোগের চিকিৎসা করা উচিৎ নয়। শুধু যদি তোমার মধ্যে অলৌকিক ক্ষমতা ইতিমধ্যেই বিকশিত হয়ে থাকে, এবং একই সাথে তুমি কিছুটা গোংগ সামর্থ্যের অধিকারী হতে পার, তবেই তুমি চিগোংগ ব্যবহার করে রোগের চিকিৎসা করতে পারবে। কিছু লোকের যদিও অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটে গেছে, এবং তারা রোগের চিকিৎসাও করতে পারে, কিন্তু তাদের স্তর খুবই নীচুতে, বাস্তবে তারা সঞ্চিত গোংগ সামর্থ্য ব্যবহার করে রোগীর চিকিৎসা করছে, নিজের শক্তি ব্যবহার করে রোগের চিকিৎসা করছে। যেহেতু গোংগ একটা শক্তি এবং বুদ্ধিমান সত্তা, সেহেতু এর সঞ্চয় করা খুব সহজ নয়। এই গোংগ নিঃসরণ করার অর্থ নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলা। গোংগ বাইরে নিঃসরণ করার সাথে সাথে তোমার মাথার উপরে অবস্থিত গোংগ স্তম্ভের উচ্চতা হ্রাস পেতে থাকে, এবং নিঃশেষিত হতে থাকে। এই গোংগ নিঃশেষিত হওয়াটা একেবারেই সমীচীন নয়। সেইজন্য যখন তোমার গোংগ সামর্থ্য উঁচু নয়, সেক্ষেত্রে অন্যের রোগের চিকিৎসা করা আমি অনুমোদন করি না। যাই হোক তোমার কৌশল যত উন্নতই হোক না কেন, তুমি তবুও শুধু নিজের শক্তিই নিঃশেষ করে ফেলছ।

যখন কোন ব্যক্তির গোংগ সামর্থ্য একটা নির্দিষ্ট স্তরে পৌঁছে যায়, তখন বিভিন্ন ধরনের অলৌকিক ক্ষমতার উদয় হয়। যখন অলৌকিক ক্ষমতা ব্যবহার করবে তখন অত্যন্ত সাবধান হওয়া প্রয়োজন। যেমন কোন ব্যক্তির দিব্যচক্ষু খুলে গেলে সেটা দিয়ে না দেখাটাও ঠিক নয়, এটা কখনোই ব্যবহার না করলে সহজেই বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আবার দেখলেও বারংবার এটা দিয়ে দেখবে না। খুব বেশী বার দেখলে, তোমার শক্তিও বেশী করে নির্গত হতে থাকবে। তাহলে তোমরা কি কখনোই এটা ব্যবহার করবে না? সেটা অবশ্যই নয়। যদি কখনোই এটা ব্যবহার করা না যায়, তবে সাধনা কিসের জন্য? প্রশ্নটা হচ্ছে কোন্ সময়ে এটা ব্যবহার করা যাবে। শুধু যখন সাধনায় একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছে যাবে, এবং নিজে নিজে ক্ষতিপূরণ করার ক্ষমতার অধিকারী হবে, তখনই এটা ব্যবহার করতে পারবে। ফালুন গোংগ-এর সাধক একটা বিশেষ ধাপে পৌঁছানোর পরে, তার গোংগ যত বেশীই নির্গত হোক না কেন, ফালুন নিজে নিজেই সেটা রূপান্তরিত করে ক্ষতিপূরণ করতে পারবে। ফালুন স্বয়ংক্রিয়ভাবে সাধকের গোংগ সামর্থ্যের স্তরটা বজায় রাখতে পারবে এবং গোংগ কোন সময়েই কমে যাবে না, এটাই ফালুন গোংগ-এর বৈশিষ্ট্য। কেবল এই সময়টাতে পৌঁছে গেলে, তবেই অলৌকিক ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারবে।

4.দিব্যচক্ষু

(1) দিব্যচক্ষুর উন্মোচন

দিব্যচক্ষুর প্রধান পথ থাকে কপালের মধ্যস্থল থেকে *শানগেন* বিন্দু[21]- র মধ্যে। সাধারণ লোকেরা ভৌতিক চোখ দিয়ে যে ভাবে কোন বস্তুকে দেখে, সেটা ক্যামেরায় ছবি তোলার যে নীতি সেই রকম। বস্তুর দূরত্ব এবং আলোর তীব্রতার উপরে নির্ভর করে চোখের লেন্সের আকার এবং মণির আকার ঠিক করা হয়। ছবিটা অক্ষিস্নায়ুর মধ্য দিয়ে গিয়ে মস্তিষ্কের পেছনে অবস্থিত পিনিয়াল গ্রন্থিতে তৈরি হয়। অন্তর্ভেদী দৃষ্টির অলৌকিক ক্ষমতা প্রকৃতপক্ষে পিনিয়াল গ্রন্থির ক্ষমতা, যা দিব্যচক্ষুর মাধ্যমে বাইরেটা সরাসরি দেখায়। একজন সাধারণ মানুষের দিব্যচক্ষু বন্ধ থাকে, যেহেতু প্রধান পথটা

---

[21]শানগেন বিন্দু - দুটি ভুর মাঝে একটু নীচে অবস্থিত আকুপাংচার বিন্দু।

খুবই সঙ্কীর্ণ এবং ভীষণ অন্ধকার। এর ভিতরে কার্যকরী চি নেই, এবং এটা আলোকিত নয়। কিছু লোকের এই পথ অবরুদ্ধ থাকে, সেইজন্য তারা দেখতে পায় না।

দিব্যচক্ষু উন্মোচনের জন্য প্রথমত আমরা বাইরের শক্তির ব্যবহারের দ্বারা অথবা নিজস্ব সাধনার দ্বারা পথটা খোলার ব্যবস্থা করি। এই পথটা প্রত্যেক লোকের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন, ডিম্বাকার হতে পারে, গোলাকার হতে পারে, হীরকাকার হতে পারে, ত্রিকোনাকার হতে পারে। যত সাধনা করতে থাকবে, ততই পথটা গোলাকার হতে থাকবে। দ্বিতীয়ত মাস্টার তোমাকে একটা চোখ দেবেন; আর তুমি যদি নিজে নিজে সাধনা কর, তাহলে তোমাকে নিজেকেই এর জন্য সাধনা করতে হবে। তৃতীয়ত চি-এর সারবস্তু যেন দিব্যচক্ষুর জায়গায় বিদ্যমান থাকে।

আমরা সাধারণত এই দুটো চোখ দিয়েই সব জিনিস দেখি, আবার ঠিক এই দুটো চোখই আমাদের সঙ্গে অন্য মাত্রার সংযোগগুলিকে ছিন্ন করে রাখে, যেহেতু এরা একটা আবরণ হিসাবে কাজ করে, আমরা শুধু এই ভৌতিক মাত্রাতে বিদ্যমান বস্তুগুলোই দেখতে পারি। দিব্যচক্ষু খুলে গেলে, আমরা এই দুটো চোখ না খুলেও, দেখতে পারি। খুব উঁচু স্তরে যাওয়ার পরে, একটা সত্যিকারের চোখের উদয় হওয়ার জন্য সাধনা করতে পার। তখন তুমি দিব্যচক্ষুর সত্যিকারের চোখ দিয়ে অথবা শানগেন বিন্দুর সত্যিকারের চোখ দিয়ে দেখতে পার। বুদ্ধমতে বলা হয়: শরীরের প্রতিটি ছিদ্রই হচ্ছে একটা করে চোখ, শরীরের সব জায়গায় চোখ আছে। তাও মতে বলা হয়: প্রতিটি আকুপাংচার বিন্দুই একটা করে চোখ। প্রধান পথটা দিব্যচক্ষুর ওখানেই থাকে, এবং অবশ্যই এটা প্রথমে খুলবে। ক্লাসে শেখানোর সময়ে আমি প্রত্যেকের মধ্যে দিব্যচক্ষু খোলার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তু স্থাপন করে দিয়েছি। প্রত্যেকের শরীরের গুণগত তারতম্যের জন্য ফলেরও তারতম্য ঘটে। কিছু লোক গভীর কূপের মতো অন্ধকার গর্ত দেখতে পায়, এর অর্থ দিব্যচক্ষুর পথটা অন্ধকার। কিছু লোক সাদা সুড়ঙ্গ দেখতে পায়, যদি বস্তুগুলোকে সামনে দেখা যায়, এর অর্থ দিব্যচক্ষু খুলবে। কিছু লোক দেখে বস্তুগুলো ঘুরছে, এই বস্তুগুলোই মাস্টার স্থাপন করে দেন দিব্যচক্ষু খোলার জন্য। দিব্যচক্ষুর মধ্যে ছিদ্র করে পথ তৈরি করা হয়ে গেলে তখন দেখা যাবে। কেউ কেউ দিব্যচক্ষু দিয়ে একটা বিরাট চোখ দেখতে পায় এবং মনে করে বুদ্ধের চোখ, প্রকৃতপক্ষে এটা তার

নিজেরই চোখ, প্রায়শই এই সব লোকেদের জন্মগত সংস্কার অপেক্ষাকৃত ভালো থাকে।

আমাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রত্যেকবার বক্তৃতার পর্বে যারা উপস্থিত থাকেন তাদের অর্ধেকের বেশী লোকের দিব্যচক্ষু খুলে যায়। দিব্যচক্ষু খোলার পরে একটা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, যে ব্যক্তির চরিত্র উঁচু নয় সে সহজেই এটা ব্যবহার করে খারাপ কাজ করতে পারে। এই সমস্যাটা এড়াবার জন্য আমি তোমার দিব্যচক্ষু সোজাসুজি জ্ঞানদৃষ্টির স্তরে খুলে দিই, অন্যভাবে বলা যায়, উঁচুস্তরে খুলে দিই যাতে তুমি অন্যমাত্রার দৃশ্যাবলি সরাসরি দেখতে পার এবং সাধনার ফলে উদয় হওয়া জিনিসগুলিও দেখতে পার। যার ফলে এগুলোর প্রতি তোমার বিশ্বাস উৎপন্ন হবে, এতে তোমার সাধনার উপরে আস্থাটা আরও দৃঢ় হবে। যাদের সবে সাধনা শুরু হয়েছে এবং চরিত্র এখনও উন্নত লোকেদের স্তরে পৌঁছায় নি, তারা অতিপ্রাকৃত জিনিস প্রাপ্ত হলে সহজেই খারাপ কাজ করে ফেলতে পারে। একটা মজার উদাহরণ বলব, যদি তুমি বড়ো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে লটারি বিক্রির জায়গা দেখতে পাও, সেক্ষেত্রে হয়তো প্রথম পুরস্কার জিতে নিয়ে চলে যাবে, বিষয়টার অর্থটা বললাম এবং এই রকম হতে দেওয়া যায় না। তার একটা কারণ হচ্ছে আমরা বিরাট সংখ্যক লোকের দিব্যচক্ষু খুলে দিচ্ছি। ধরা যাক, সবারই দিব্যচক্ষু নিচের স্তরে খুলে দেওয়া হল, সবাই চিন্তা কর, যদি তোমরা প্রত্যেকে মানব শরীরের ভিতরটা দেখতে পার এবং দেওয়ালের পেছনের জিনিস দেখতে পার, তাহলে সেটাকে কি মানব সভ্যতা বলা যাবে? সাধারণ মানুষের সামাজিক পরিস্থিতিতে ভীষণভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে, সেইজন্য এটা হতে দেওয়া যাবে না এবং এরকম করতেও পারবে না। এছাড়া এটা সাধকের কোন উপকার করবে না, বরঞ্চ সাধকের আসক্তিগুলোকে প্রশয় দেবে। সেইজন্য তোমার দিব্যচক্ষু নীচের স্তরে খুলব না, তার পরিবর্তে এটাকে সরাসরি উঁচুস্তরে খুলে দেব।

(2) দিব্যচক্ষুর স্তর

দিব্যচক্ষুর অনেক ধরনের স্তর আছে, বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী এটা ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা দেখতে পায়। বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী, পাঁচটা স্তর আছে বলা যায়। যেমন, ভৌতিক দৃষ্টি, দিব্যদৃষ্টি, জ্ঞান দৃষ্টি, ফা দৃষ্টি এবং বুদ্ধদৃষ্টি। প্রত্যেকটা

স্তরকে আবার উচ্চ, মধ্য এবং নিম্নভাগে ভাগ করা যায়। দিব্যদৃষ্টি অথবা তার নিচের স্তরে থাকলে, শুধু এই পার্থিব জগৎকেই দেখা যাবে। জ্ঞান দৃষ্টি অথবা তার উপরের স্তরে গেলে তবেই শুধু অন্য মাত্রাগুলোকে দেখা যাবে। কিছু লোকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন অলৌকিক ক্ষমতা থাকে, তারা সবকিছু একেবারে সঠিকভাবে দেখতে পারে, এবং CT স্ক্যান-এর থেকেও বেশী পরিষ্কার দেখতে পারে। কিন্তু তারা যা কিছু দেখতে পারে সে সবই এই পার্থিব জগতের মধ্যে, আমরা যে মাত্রায় বিরাজ করি, তাকে অতিক্রম করতে পারে না; এটাকে দিব্যচক্ষুর উঁচুস্তর হিসাবেও গণ্য করা যায় না।

একজন লোকের দিব্যচক্ষুর স্তর নির্ধারিত হয় তার চি-এর সারবস্তুর পরিমাণ-এর উপরে, এর সাথে প্রধান পথের প্রশস্ততা, উজ্জ্বলতা, এবং প্রতিবন্ধকতার মাত্রার উপরে। দিব্যচক্ষু পুরোপুরি খুলবে কি খুলবে না তার জন্য এর ভিতরের চি-এর সারবস্তু হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ। ছয় বছর বা তার নিচের বয়সের শিশুদের ক্ষেত্রে দিব্যচক্ষু খোলা বিশেষ ভাবে সহজ। এমন কি আমি হাত-ও ব্যবহার করি না। আমি কথা বলতে শুরু করলেই এটা খুলে যায়। কারণ শিশুরা পার্থিব জগতের খারাপ প্রভাব অল্পই প্রাপ্ত হয় এবং তারা নিজেরাও কোন খারাপ কাজ করে না। তাদের জন্মগত চি-এর সারবস্তু খুব ভালোভাবে সংরক্ষিত থাকে। ছয় বছরের বেশী বয়সের শিশুদের দিব্যচক্ষু খোলা ক্রমশ কঠিন হতে থাকে। কারণ তারা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে বাইরের প্রভাবও বেশী করে প্রাপ্ত হতে থাকে। বিশেষত জন্মের পরের খারাপ শিক্ষা, উচ্ছৃঙ্খলতা, নীতিহীনতা, এই সব কিছুর দ্বারা, চি-এর সারবস্তুর অপচয় হতে থাকে, এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছে যাওয়ার পরে এর পুরোটাই অন্তর্হিত হয়ে যায়, সেটাকে সাধনার দ্বারা ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। কিন্তু এর জন্য লম্বা সময় এবং অনেক শ্রম ব্যয় করা প্রয়োজন, সেইজন্য এই চি-এর সারবস্তু অত্যন্ত মূল্যবান।

আমি কখনোই এটা অনুমোদন করব না যে ব্যক্তির দিব্যচক্ষু, দিব্যদৃষ্টির স্তরে খোলা হোক, যেহেতু সাধকের গোংগ সামর্থ্য কম, সে সাধনার দ্বারা যে শক্তি সঞ্চয় করবে, তার থেকে বেশী শক্তি কোন বস্তু দেখার জন্য ব্যয় করে ফেলবে। কার্যকরী চি খুব বেশী ক্ষয় হয়ে গেলে দিব্যচক্ষু পুনরায় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। একবার বন্ধ হয়ে গেলে আবার খোলা সহজ নয়। সেইজন্য আমি সাধারণত লোকেদের দিব্যচক্ষু জ্ঞানদৃষ্টির

স্তরে খুলে দিই। যাই হোক সে পরিষ্কার দেখতে পারুক বা না পারুক, সাধক অন্য মাত্রার বস্তুগুলোকে দেখতে পারবে। সহজাতগুণের প্রভাবে কিছু লোক স্পষ্ট দেখতে পারে, কিছু লোক মাঝে মাঝে দেখতে পারে, এবং কিছু লোক অস্পষ্ট দেখে, কিন্তু ন্যূনতম, তুমি অন্তত একটা আলো দেখতে পারবে। এটা সাধককে উঁচুস্তরে অগ্রসর হওয়ার পক্ষে সহায়তা করবে। যারা স্পষ্ট দেখতে পারছে না তারা সাধনার মাধ্যমে এর প্রতিবিধান করে ফেলবে।

যে ব্যক্তির চি-এর সারবস্তু কম থাকে, সে দিব্যচক্ষুর মাধ্যমে দৃশ্যগুলি সাদা-কালো দেখে। যে ব্যক্তির চি-এর সারবস্তু অপেক্ষাকৃত বেশী থাকে, সে দিব্যচক্ষুর মাধ্যমে দৃশ্যগুলি রঙ্গিন দেখে এবং আরও স্পষ্ট দেখে। চি-এর সারবস্তু যত বেশী হবে তত বেশী স্পষ্টতর হবে। কিন্তু প্রত্যেকটা মানুষ আলাদা, কিছু লোক দিব্যচক্ষু খোলা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, কিছু লোকের দিব্যচক্ষু অপেক্ষাকৃত শক্তভাবে অবরুদ্ধ থাকে। দিব্যচক্ষু খোলার দৃশ্যটা ফুল প্রস্ফুটিত হওয়ার মতো, একটা স্তরের পর আর একটা স্তর খুলতে থাকে। বসে ধ্যান করার সময়ে প্রথম প্রথম দিব্যচক্ষুর জায়গায় একটা জ্যোতি দেখতে পাবে, প্রথমে জ্যোতিটা খুব উজ্জ্বল থাকে না, পরে এটা রূপান্তরিত হয়ে লাল হয়ে যায়। কিছু লোকের দিব্যচক্ষু শক্তভাবে বন্ধ থাকে, সেইজন্য তাদের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া হয়তো অত্যন্ত তীব্র হতে পারে। তারা তাদের প্রধান পথ এবং শানগেন বিন্দুর জায়গায় চারিদিক থেকে মাংসপেশীগুলোর একটা শক্ত চাপ অনুভব করে। ঠিক যেন পেশীগুলো জড় হয়ে মোচড় দিয়ে জায়গাটাকে ফুঁড়ে ভিতরের দিকে ঢুকে যেতে চাইছে। তাদের রগ এবং কপাল ফুলে গেছে এই রকম বোধ হতে থাকে এবং ব্যাথাও বোধ হতে থাকে, এ সবই দিব্যচক্ষু খোলার প্রতিক্রিয়া। যাদের দিব্যচক্ষু সহজে খুলে যায় তারা কখনো কখনো কিছু নির্দিষ্ট জিনিস দেখতে পারে। কিছু লোক ক্লাসে শেখানোর সময়ে বিনা ইচ্ছাতেই আমার ফা-শরীর দেখতে পেরেছে, অবশ্য যখন ইচ্ছা নিয়ে দেখতে চেয়েছে তখন দেখতে পারে নি, যেহেতু তারা তাদের পার্থিব চোখ দিয়ে দেখতে চাইছিল। যখন তুমি চোখ দুটো বন্ধ অবস্থায় কোন কিছু দেখতে পাও, সেক্ষেত্রে সেই দেখার অবস্থাটা ধরে রাখার চেষ্টা কর, তাহলে ধীরে ধীরে তুমি জিনিসগুলো আরও স্পষ্ট দেখতে পারবে। যদি তুমি কোন জিনিস মনোযোগ দিয়ে দেখতে চাও, তখন তুমি প্রকৃতপক্ষে দেখাটা নিজের চোখ দুটোতে বদলে নিলে এবং চোখের স্নায়ু ব্যবহার করলে, তখন কিছুই আর দেখতে পারবে না।

দিব্যচক্ষুর বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন মাত্রাগুলিকে দেখা যায়। কিছু বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এই তত্ত্বটা বুঝতে পারে না, সেইজন্য কিছু চিগোংগ পরীক্ষায় প্রত্যাশিত ফল পাওয়া যায় নি। এমন কি, বিপরীত ফলও পাওয়া গেছে। উদাহরণস্বরূপ একটা প্রতিষ্ঠান অলৌকিক ক্ষমতাগুলিকে পরীক্ষা করার জন্য একটা পদ্ধতির পরিকল্পনা করেছিল। চিগোংগ মাস্টারদের একটা বন্ধ বাক্সের অভ্যন্তরের বস্তুগুলোকে দেখার জন্য বলা হয়েছিল। যেহেতু চিগোংগ মাস্টারদের দিব্যচক্ষুর স্তর ভিন্ন ভিন্ন ছিল, সেইজন্য উত্তরগুলো সব একইরকম হয় নি। সেই কারণে গবেষণার লোকেরা দিব্যচক্ষুর ব্যাপারটাকে মিথ্যা এবং বিভ্রান্তিকর মনে করল। যাদের দিব্যচক্ষু নীচুস্তরের তাদের এই ধরনের দেখার পরীক্ষায় ভালো ফল হয়। যেহেতু তাদের দিব্যচক্ষু শুধু দিব্যদৃষ্টির স্তরে খোলা ছিল, যা শুধু এই ভৌতিক মাত্রার বস্তুগুলোকে দেখার পক্ষে উপযুক্ত, সুতরাং, যাদের দিব্যচক্ষু সম্বন্ধে ধারণা নেই, তাদের মনে হবে ওই লোকগুলোর অলৌকিক ক্ষমতা সব থেকে বেশী। সমস্ত পদার্থ, জৈব অথবা অজৈব, বিভিন্ন মাত্রাতে বিভিন্ন আকার এবং রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়। উদাহরণস্বরূপ যখন একটা গ্লাস তৈরি হয়, একই সাথে একটা বুদ্ধিমান সত্তা অন্য মাত্রাতে এসে বিরাজমান হয়। এছাড়া এই সত্তার অস্তিত্বের পূর্বে, সেটা অন্য কোন জিনিস হিসাবে ছিল। দিব্যচক্ষুর সবথেকে নীচু স্তরে গ্লাসটাকে দেখা যাবে; একটা স্তর উঁচুতে, অন্য মাত্রাতে অবস্থিত সেই বুদ্ধিমান সত্তাকে দেখা যাবে; আরও উঁচু স্তরে সেই বুদ্ধিমান সত্তার আগেকার বস্তুগত রূপকে দেখা যাবে।

(3) দূর নিরীক্ষণ

দিব্যচক্ষু খুলে যাওয়ার পরে কিছু লোকের দূর নিরীক্ষণের অলৌকিক ক্ষমতার উদয় হয় এবং হাজার হাজার মাইল দূরের জিনিস সে দেখতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে অনেকগুলো মাত্রা জুড়ে থাকে, সেই মাত্রাগুলোতে তার আয়তন একটা বিশ্বেরই মতন। কোন একটা বিশেষ মাত্রার মধ্যে তার কপালের সামনে একটা আয়না আছে, যদিও সেটাকে এই মাত্রাতে দেখা যাবে না। প্রত্যেকেরই একটা করে আয়না থাকে, যে সাধনা করে না তার ক্ষেত্রে আয়নার সামনেটা ভিতরের দিকে মুখ করে থাকে, সাধকের ক্ষেত্রে এই আয়নাটা ধীরে ধীরে অন্য পাশে ঘুরতে থাকে। একবার অন্য পাশে ঘুরে যাওয়ার পরে, সাধক যা কিছু দেখতে চায়, সবকিছুই এই

আয়নায় প্রতিফলিত হবে। তার বিশেষ মাত্রায় সে বেশ বিরাট, তার দেহটা বিরাট হওয়ায় তার আয়নাটাও খুব বিরাট হয়, সাধক যা দেখতে চাইবে সবই এই আয়নাতে প্রতিফলিত হবে। কিন্তু আয়নাতে ছবিটা বন্দি হলেও সে এখনও দেখতে পারছে না, যেহেতু ছবিটাকে আয়নার উপরে একটা ক্ষণ থাকা প্রয়োজন। এবার আয়নাটা আগের অবস্থায় ঘুরে গিয়ে প্রতিফলিত হওয়া জিনিসগুলোর ছবি দেখতে দেয়, এবং আবার আয়নাটা উল্টে যায়, খুব তাড়াতাড়ি এটা উল্টে যায়, আয়নাটা না থেমে আগেপিছে ওল্টাতেই থাকে। চলচিত্রের ফিল্মের ক্ষেত্রে প্রতি সেকেন্ডে চব্বিশটা করে চিত্র এগিয়ে যাওয়ার ফলে একটা ধারাবাহিক গতি দেখতে পাওয়া যায়। এই আয়নার ওল্টানোর গতি তার থেকে আরও দ্রুত হয়। সেইজন্য দৃশ্যগুলিকে ধারাবাহিক মনে হয় এবং দেখতে খুব পরিষ্কার লাগে, এটাই দূর নিরীক্ষণ। দূর নিরীক্ষণের এটাই সরল তত্ত্ব। এসব অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার মনে করা হতো, আমি এটা কয়েকটা বাক্যে প্রকাশ করলাম।

(4) মাত্রা

মাত্রা, আমাদের দৃষ্টিতে খুবই জটিল। মানবজাতি কেবল এই মাত্রাটাই জানে, যেটাতে বর্তমানে মানবজাতি বিরাজ করছে, অথচ অন্য মাত্রাগুলি সম্বন্ধে এখনও খোঁজ করা হয় নি অথবা কিছু জানাও যায় নি। অন্য মাত্রাগুলি প্রসঙ্গে বলতে গেলে আমরা চিগোংগ মাস্টাররা ইতিমধ্যেই কয়েক ডজন স্তরের মাত্রা দেখেছি, তাত্ত্বিক দিক দিয়ে এগুলোর ব্যাখ্যা করা সম্ভব, কিন্তু বিজ্ঞানের দ্বারা এখনও প্রমাণিত হয় নি। যদিও কিছু জিনিসের অস্তিত্ব তোমরা স্বীকার কর না, কিন্তু বাস্তবে আমাদের এই মাত্রাতে তাদের প্রতিফলন ঘটেই যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ এই পৃথিবীতে একটা জায়গা আছে নাম বারমুডা দ্বীপপুঞ্জ, লোকেরা বলে শয়তানের ত্রিকোণ, যেখানে কিছু জাহাজ এবং এরোপ্লেন অদৃশ্য হয়ে গিয়ে, অনেক বছর পরে আবার আবির্ভূত হয়েছিল। এর কারণ কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে নি, যেহেতু কেউই আধুনিক মানবজাতির প্রচলিত ধ্যানধারণা এবং তত্ত্বগুলির বাইরে বের হতে পারেনি। বস্তুত এই ত্রিকোণ হচ্ছে অন্য মাত্রাতে প্রবেশ করার রাস্তা, এটা ঠিক আমাদের স্বাভাবিক দরজার মতো নয় যার নির্দিষ্ট অবস্থান আছে। এটা একটা অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে থাকে। যখন এই প্রবেশ করার রাস্তা কোন অনিশ্চিত কারণে খোলা থাকে, তখন একটা জাহাজ সহজেই এর মধ্য দিয়ে অন্য মাত্রাতে প্রবেশ করে

যেতে পারে। মাত্রাগুলির মধ্যে পার্থক্যটা মানুষ উপলব্ধি করতে পারে না এবং মুহূর্তের মধ্যে তারা অন্য মাত্রায় ঢুকে যায়, সেই মাত্রার এবং আমাদের মাত্রার সময়-মাত্রার পার্থক্যটা মাইলের হিসাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়, হাজার হাজার মাইলের দূরত্ব হয়তো এখানে একটা বিন্দুর মধ্যেই আছে, অর্থাৎ তারা হয়তো একই স্থানে, এবং একই সময়ে বিরাজ করছে। জাহাজটা দুলতে দুলতে নিমেষে ভেতরে ঢুকে গেল এবং হঠাৎ করে আবার ফিরে এল, অথচ এই পৃথিবীতে কয়েকটা দশক পেরিয়ে গেছে, যেহেতু দুটো মাত্রার সময় আলাদা। এর উপরে প্রত্যেক মাত্রাতে একক জগৎও আছে। এটা ঠিক যেন আমাদের পরমাণুর গঠন প্রণালী-র মডেলের মতো, যেখানে একটা বল আর একটার সঙ্গে সুতো দ্বারা যুক্ত থাকে, এইভাবে প্রচুর বল, সবই সুতোর মাধ্যমেই যুক্ত থাকে, যেটা অত্যন্ত জটিল।

ইংল্যান্ডের বিমান বাহিনীর একজন পাইলট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চার বছর পূর্বে একটা বিশেষ দায়িত্ব পালন করার জন্য আকাশে উড়ছিল, এই ওড়ার মাঝে সে প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টির সম্মুখীন হল, সে অতীতের অভিজ্ঞতার দ্বারা একটা পরিত্যক্ত বিমানবন্দর খুঁজে পেল। যে মুহূর্তে চোখের সামনে বিমানবন্দরটা আবির্ভূত হল, তখনই সম্পূর্ণ অন্য একটা দৃশ্য ফুটে উঠল। হঠাৎ-ই পুরো আকাশটা রৌদ্রোজ্জ্বল এবং মেঘ শূন্য হয়ে গেল, ঠিক যেন সে এইমাত্র একটা অন্য জগৎ ছেড়ে বেরিয়ে এল। বিমানবন্দরের বিমানগুলি হলুদ রঙের ছিল এবং লোকেরা সেখানে নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিল, তার খুব আশ্চর্য বোধ হচ্ছিল! সে ভূমিতে অবতরণ করার পরে কোন লোক তার সাথে কথা বলল না, এমন কি নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষও তার সঙ্গে যোগাযোগ করল না। সে দেখল আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে, সেইজন্য জায়গাটা ছেড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং আবার উড়তে শুরু করল। কিছুটা দূরত্ব উড়ে আসার পরে, ঠিক যেখান থেকে সে কিছুক্ষণ আগে বিমানবন্দরটা দেখেছিল সেইখানে পৌঁছানোর পরে সে আবার প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যে গিয়ে পড়ল, অবশেষে সে ফিরে এসেছিল। সে পরিস্থিতিটা তার প্রতিবেদনে জানিয়ে ছিল, সে তার উড়ানের নথিতেও এসব লিপিবদ্ধ করেছিল, কিন্তু তার ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা বিশ্বাস করে নি। চার বছর পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল। তাকে সেই পরিত্যক্ত বিমানবন্দরে বদলি করা হল। তৎক্ষণাৎ তার মনে পড়ল এটা তার চার বছর পূর্বে দেখা সেই একই দৃশ্য। আমরা চিগোংগ মাস্টাররা জানি এটা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। চার বছর পরে যেটা করার কথা ছিল সেটা সে আগেই

করে ফেলেছিল। প্রথম কাজটা শুরু হওয়ার পূর্বেই সে সেখানে গিয়েছিল এবং তার ভূমিকাটা পালন করেছিল, পরে জিনিসগুলি সঠিক ক্রমে ফিরে এসেছিল।

5.চিগোংগ চিকিৎসা এবং হাসপাতালের চিকিৎসা

তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বললে চিগোংগ চিকিৎসা হাসপাতালের চিকিৎসার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থায় সাধারণ মানব সমাজের পদ্ধতিগুলোই ব্যবহার করা হয়। যদিও গবেষণাগারের পরীক্ষা, X- Ray পরীক্ষা ইত্যাদি উপায় ব্যবহার করা হয়, কিন্তু এসব দিয়ে কেবল এই মাত্রার মধ্যে রোগের প্রধান উৎসস্থলের অনুসন্ধান করা হয়, এই বিষয়ে অন্য মাত্রাতে অবস্থিত তথ্যগুলোকে দেখা হয় না, সেইজন্য রোগ হওয়ার কারণটাও বোঝা যায় না। যদি ব্যক্তির রোগটা অপেক্ষাকৃত হাল্কা ধরনের হয়, তাহলে ওষুধের দ্বারা রোগের কারণটাকে (পশ্চিমী চিকিৎসায় একে বলে জীবাণু, চিগোংগ-এ বলে কর্ম) দূর করা হয় বা তাড়িয়ে দেওয়া হয়। রোগটা খুব গুরুতর হলে ওষুধ কার্যকরী হবে না। যদি ওষুধের পরিমাণ বাড়ানো হয় তাহলে ব্যক্তি হয়তো সহ্য করতে পারবে না। যেহেতু কিছু রোগ আছে যেগুলো এমন কি এই ত্রিলোকের নিয়মকানুনের মধ্যে সীমিত নয়, এবং কিছু রোগ খুবই গুরুতর যেগুলো এই ত্রিলোকের নিয়মকানুনের সীমা অতিক্রম করে গেছে, সেই কারণে হাসপাতাল এই রোগগুলোকে নিরাময় করতে পারে না।

চীনের চিকিৎসা হচ্ছে আমাদের দেশের প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা, যা আমাদের মানব শরীরের সাধনার মাধ্যমে বিকশিত অলৌকিক ক্ষমতাগুলোর থেকে আলাদা কিছু নয়। অতীতে লোকেরা শরীরের সাধনার উপরে খুব মনোযোগ দিত। কনফুসিয়াস-মত, তাও-মত, বুদ্ধ-মত, এমন কি কনফুসিয়াস মতের শিক্ষার্থীরাও বসে ধ্যান করার কথা বলত। বসে ধ্যান করাটা একধরনের দক্ষতা মনে করা হতো, যদিও তারা শরীর সঞ্চালন করত না, কিন্তু একটা সময়ের পরে তাদের মধ্যে গোংগ বিকশিত হতো এবং অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটত। চীন দেশে আকুপাংচার দ্বারা মানব শরীরের শক্তি নাড়ী[22] গুলোকে কীভাবে এত স্পষ্টভাবে খুঁজে

[22]শক্তিনাড়ী - মানবশরীরে শক্তি প্রবাহের পথ।

বের করা হয়েছিল? আকুপাংচার বিন্দুগুলি অনুপ্রস্থভাবে যুক্ত নয় কেন? রেখাগুলো একে অপরকে ছেদ করে না কেন? কেন রেখাগুলি উল্লম্বভাবে যুক্ত? কীভাবে রেখাগুলিকে এতটা নিখুঁত ভাবে চিত্রিত করা হয়েছিল। বর্তমানে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি তার নিজের চোখ দিয়ে একই জিনিস দেখতে পায়, যা চীনের চিকিৎসকরা চিত্রিত করে গেছেন। কারণ প্রাচীন কালের চীনের বিখ্যাত চিকিংসকরা সবাই সাধারণভাবে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। চীনের ইতিহাসে চিকিংসকদের মধ্যে লি শিঝেন, সুন সিমিয়াও, বিয়েন চুয়ে, হুয়াতুয়ো[23] এঁরা সবাই প্রকৃতপক্ষে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন মহান চিগোংগ মাস্টার ছিলেন। বর্তমান সময় পর্যন্ত হস্তান্তরিত হয়ে আসার সময়ে চীনের চিকিৎসার অলৌকিক ক্ষমতার ভাগটা হারিয়ে গেছে, শুধু কলাকৌশলের ব্যাপারগুলো রয়ে গেছে। প্রাচীন কালে চীনের চিকিৎসকরা চোখের (অলৌকিক ক্ষমতা সমেত) সাহায্যে রোগীকে পরীক্ষা করতেন। পরবর্তীকালে তাঁরা আবার ধমনীর স্পন্দন পরীক্ষা পদ্ধতির বিকাশ ঘটিয়ে ছিলেন। যদি অলৌকিক ক্ষমতাগুলিকে, চীনের চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তাহলে এটা বলা যায় যে পশ্চিমী চিকিৎসা অনেক বছর পর্যন্ত চীনের চিকিৎসার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না।

চিগোংগ চিকিৎসায় রোগের মূল কারণটাকে দূর করা হয়। আমি মনে করি, রোগ এক ধরনের কর্ম। রোগ নিরাময় করার অর্থ, কর্ম দূর করতে সাহায্য করা। কিছু চিগোংগ মাস্টার রোগ নিরাময় করার জন্য চি নির্গত করা এবং পূরণ করার মাধ্যমে তার কালো চি দূর করার কথা বলে, অত্যন্ত নীচু স্তরের এই মাস্টাররা কালো চি নির্গত করার ব্যবস্থা করে, কিন্তু তারা এই কালো চি উৎপন্ন হওয়ার মূল কারণটা জানে না। সেইজন্য এই কালো চি নূতন করে দেখা দেয় এবং রোগের পুনরাক্রমণ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে কালো চি রোগের কারণ নয়, শুধু এই কালো চি থাকার জন্যই তাকে কষ্টটা সহ্য করতে হয়। তার রোগের উৎপত্তির মূল কারণ হচ্ছে একটা বুদ্ধিমান সত্তা যা অন্য মাত্রাতে থাকে। অনেক চিগোংগ মাস্টারই এই ব্যাপারটা জানে না। এই বুদ্ধিমান সত্তা খুবই ভয়ঙ্কর, সাধারণ লোক একে কিছু করতে পারে না এবং কিছু করতে সাহসও পাবে না।

[23] লি শিঝেন, সুন সিমিয়াও, বিয়েন চুয়ে, হুয়াতুয়ো- এঁরা সবাই চীন দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের ইতিহাসে বিখ্যাত চিকিৎসক।

ফালুন গোংগ দিয়ে চিকিৎসা করার সময়ে এই বুদ্ধিমান সত্তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই চিকিৎসা শুরু করা হয়, রোগের মূল কারণগত জিনিসটাকে উপড়ে ফেলা হয়, এছাড়া ওই জায়গায় একটা সুরক্ষা-কবচ স্থাপন করা হয় যাতে রোগটা পুনরায় আক্রমণ করতে না পারে।

চিগোংগ রোগ নিরাময় করতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানব সমাজের পরিস্থিতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না। যদি বড়ো আকারে এর প্রয়োগ করা হয় তাহলে এটা সাধারণ মানব সমাজের পরিস্থিতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে, সেটা হতে দেওয়া যাবে না এবং এর পরিণামও ভালো হবে না। তোমরা সবাই জান, কিছু লোক চিগোংগ পরীক্ষা কেন্দ্র, চিগোংগ হাসপাতাল এবং চিগোংগ আরোগ্য কেন্দ্র খুলেছে। তারা এই ব্যবসা খোলার আগে, তাদের চিকিৎসার কার্যকারিতা ভালোই ছিল, কিন্তু একবার চিকিৎসার ব্যবসা শুরু করার পরে এগুলোর কার্যকারিতা একেবারে তলানিতে নেমে গেছে। এর অর্থ সাধারণ মানবসমাজের কাজকর্ম অতিপ্রাকৃত জিনিষের মাধ্যমে সম্পাদন করার ক্ষেত্রে নিষেধ আছে। এই রকম করলে এর কার্যকারিতা অবশ্যই সাধারণ মানবসমাজের নীতির মত নিম্নস্তরে নেমে যাবে।

অলৌকিক ক্ষমতা প্রয়োগ করে মানব শরীরের ভেতরটাকে স্তরের পর স্তর দেখা সম্ভব ঠিক যেমন চিকিৎসা বিদ্যায় পর পর ছেদ করে দেখা যায় এবং কোমল কোষসমুহ থেকে শুরু করে শরীরের যে কোনও অংশ দেখা সম্ভব। যদিও এখনকার C T স্ক্যান দ্বারা বেশ পরিষ্কার ভাবে দেখা সম্ভব, তথাপি এর জন্য একটা যন্ত্রের আবশ্যক, অনেক সময় ব্যয় হয়, প্রচুর ফিল্মের দরকার হয়, খুব ধীরে ধীরে হয় এবং অনেক খরচ সাপেক্ষ। এটা মানুষের অলৌকিক ক্ষমতার মতো সুবিধাজনক এবং নিখুঁত নয়। চিগোংগ মাস্টার একবার চোখদুটো বন্ধ করে শরীরের উপর দিয়ে দ্রুত বুলিয়ে নিলে সরাসরি এবং স্পষ্টভাবে রোগীর শরীরের যে কোন অংশ দেখতে পারে। এটা উন্নত প্রযুক্তি নয় কি? এই উন্নত প্রযুক্তি বর্তমানের উন্নত প্রযুক্তির থেকেও আরও উন্নত। অথচ প্রাচীন চীনদেশে এই ধরনের দক্ষতার অস্তিত্ব ছিল যা ছিল প্রাচীন কালের উন্নত প্রযুক্তি বিদ্যা। চিকিৎসক হুয়াতুয়ো সম্রাট সাওসাও[24]-এর মস্তিষ্কে একটা টিউমার বৃদ্ধি হতে দেখে সেটা অপারেশন করতে চেয়েছিলেন। সাওসাও ভাবলেন এটা

[24]সাও সাও--তিনটি রাজ্যের মধ্যে একটির সম্রাট (220 A.D.- 265 A.D.)।

তাকে ক্ষতি করার ষড়যন্ত্র, সেইজন্য হুয়াতুয়োকে বন্দি করেছিলেন। শেষে এই মস্তিষ্কের টিউমারের জন্য সাওসাও এর মৃত্যু হয়েছিল। চীনদেশের ইতিহাসে অনেক চিকিৎসকই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আধুনিক সমাজে মানুষ অপরিমিতভাবে কেবল ব্যবহারিক জিনিষের পেছনে ছুটে বেড়াচ্ছে এবং প্রাচীনকালের প্রথাগুলো ভুলে যাচ্ছে।

আমাদের উচ্চস্তরের চিগোংগ সাধনার দ্বারা প্রথাগত জিনিসগুলোকে নতুন করে জানার চেষ্টা করব, এবং এগুলোর উত্তরাধিকারী হয়ে অনুশীলনের মাধ্যমে বিকাশ ঘটাবো যাতে নতুনভাবে মানবসমাজের কল্যানে ব্যবহার করা যায়।

6. বুদ্ধমতের চিগোংগ এবং বৌদ্ধধর্ম

যখনই আমরা বুদ্ধমতের চিগোংগ-এর উল্লেখ করি, অনেক লোক এই বিষয়টা চিন্তা করে: যেহেতু বুদ্ধমতের লক্ষ্য বুদ্ধত্বের সাধনা, তারা একে বৌদ্ধধর্মের জিনিসগুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মনে করে। আমি এখানে আন্তরিকভাবে ও পরিষ্কার করে বলতে চাই যে ফালুন গোংগ হচ্ছে বুদ্ধমতের চিগোংগ। এটা একটা সৎ এবং মহান সাধনা পথ, বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। বুদ্ধমতের চিগোংগ হচ্ছে বুদ্ধমতেরই চিগোংগ এবং বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম, যদিও এদের সাধনার লক্ষ্য একই, কিন্তু পথ আলাদা, পদ্ধতি আলাদা, এবং আবশ্যকতাও আলাদা। ‘‘আমি এখানে ‘‘বুদ্ধ’’ শব্দের উল্লেখ করেছি, আমি পরে আবার এর উল্লেখ করব যখন উঁচুস্তরের সাধনার ব্যাখ্যা করব, এই শব্দটা স্বয়ং কোন অন্ধবিশ্বাসের সূচক নয়। কিছু লোক এই ‘‘বুদ্ধ’’ শব্দটা শুনলে, একেবারেই সহ্য করতে পারে না, দাবি করবে: ‘‘তোমরা অন্ধবিশ্বাসের প্রচার করছ,’’ কিন্তু এটা সেইরকম নয়। ‘‘বুদ্ধ’’ মূলত সংস্কৃত শব্দ, ভারতবর্ষ থেকে এটা প্রচারিত হয়েছিল। উচ্চারণ অনুযায়ী চীনা ভাষায় একে অনুবাদ করে বলা হতো ‘‘ফো তুয়ো’’[25]। লোকেরা তুয়ো শব্দটা বাদ দিয়ে বলত ‘‘ফো’’। চীনাভাষায় অনুবাদ করলে এর অর্থ, ‘‘আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি,’’ যে ব্যক্তির আলোকপ্রাপ্তি হয়েছে (চি হাই[26] শব্দ কোষ অনুসারে)।

---

[25]ফো তুয়ো - ‘‘বুদ্ধ’’

[26]চি হাই - চীনের একটি শব্দকোষের বই।

(1) বুদ্ধমতের চিগোংগ

বর্তমানে দুই ধরনের বুদ্ধমতের চিগোংগ প্রচারিত আছে। এর মধ্যে একটা বৌদ্ধধর্মের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিল এবং এর কয়েক হাজার বছরের বিকাশের মধ্যে এতে অনেক উন্নত সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁদের এই সাধনার প্রক্রিয়ার সময়ে যখন তাঁরা সাধনার খুব উঁচু স্তরে পৌঁছে যেতেন, তখন উন্নত স্তরের মাস্টাররা তাঁদের কিছু জিনিস শেখাতেন, যার ফলে তাঁরা আরও উন্নত স্তরের সত্যিকারের শিক্ষাপ্রাপ্ত হতেন। এই সমস্ত জিনিস বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে একজনের মাধ্যমেই হস্তান্তরিত করা হতো। একজন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী যখন তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে যেতেন, তখন শুধু একজন শিষ্যকেই এসব হস্তান্তরিত করে যেতেন, এবং সে বৌদ্ধধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী সাধনা করে যেত এবং সামগ্রিকভাবে উন্নতিসাধন করত। এই ধরনের চিগোংগের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের আপাতদৃষ্টিতে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পরবর্তীকালে সন্ন্যাসীদের মন্দিরের বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছিল যেমন, ‘‘মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব’’[27]-এর সময়ে। তখন ওই সমস্ত অনুশীলন ক্রিয়াগুলি জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং সংখ্যার দিক দিয়ে তাদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিকশিত হতে থাকে।

বুদ্ধমতের আর এক ধরনের চিগোংগ আছে যা ইতিহাসের কোন কালেই বৌদ্ধধর্মের অর্ন্তগত ছিল না এবং এই সাধনা সবসময়েই জনগণের মধ্যে অথবা দূর পাহাড়ে নিভৃতে করা হতো। এই ধরনের সব সাধনা পদ্ধতিগুলোর প্রত্যেকটাই অতুলনীয় ছিল, তাঁরা তাঁদের আবশ্যকতা অনুযায়ী একজন ভালো শিষ্যকে বাছাই করত যে সত্যি সত্যি উঁচু স্তরে সাধনা করার মতো বিরাট সদ্‌গুণের অধিকারী। পৃথিবীতে অনেক অনেক বছর পর একবারই এই ধরনের ব্যক্তির আর্বিভাব হয়ে থাকে। এই পদ্ধতিগুলো জনগণের মধ্যে প্রচার করা যায় না, কারণ এক্ষেত্রে আবশ্যক খুব উন্নত চরিত্রসম্পন্ন ব্যক্তির, যাদের গোংগ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এই ধরনের অনুশীলন পদ্ধতি সংখ্যায় কম নয়। একই কথা প্রযোজ্য তাও মতের ক্ষেত্রেও। তাও চিগোংগ, যদিও সবই তাও মতের অন্তর্গত, একে আবার কুনলুন, ইমেই, উদাংগ ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রত্যেক শ্রেণীতে আবার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি আছে, প্রত্যেকটা পদ্ধতি একে অন্যের

---

[27]মহান সাংস্কৃতিক বিপ্লব - চীনের এক কম্যুনিষ্ট রাজনৈতিক আন্দোলন (1966-1976) যা চীনের প্রথাগত মূল্যবোধ এবং সংস্কৃতির নিন্দা করেছিল।

থেকে অনেকটাই আলাদা, এগুলোকে মিশ্রিত করা যাবে না এবং এগুলোর সাধনাও একত্রে করা যাবে না।

(2) বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে একটা সাধনা প্রণালী যার মাধ্যমে ভারতবর্ষে দুই হাজার বছরেরও বেশী আগে শাক্যমুনি[28] স্বয়ং আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং যার ভিত্তি ছিল তাঁরই আদি সাধনার পদ্ধতি। তিনটে শব্দ দিয়ে এর সার কথা ব্যাখ্যা করা যায়: অনুশাসন, সমাধি[29] এবং প্রজ্ঞা। অনুশাসন হচ্ছে সমাধির জন্য। যদিও বৌদ্ধধর্মে শারীরিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করা হয় না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শারীরিক ক্রিয়া আছে, তারা আসনে বসে ধ্যান করার সময়ে শারীরিক ক্রিয়া করে এবং শান্ত অবস্থায় প্রবেশ করে। কারণ যখন ব্যক্তি শান্ত হয় এবং তার মন স্থির হয়, তখন এই বিশ্বের শক্তি তার শরীরে সংহত হতে থাকে এবং শারীরিক ক্রিয়ার ফল প্রাপ্ত হতে থাকে। বৌদ্ধধর্মের অনুশাসনগুলি হচ্ছে সাধারণ মানুষের সমস্ত আকাঙ্খা দূর করার জন্য এবং বস্তুগুলোর প্রতি সমস্ত আসক্তি পরিত্যাগ করার জন্য, যার ফলে সে শান্তিপূর্ণ এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে, সমাধিতে প্রবেশ করতে পারে। সমাধির মাধ্যমে ব্যক্তির স্তর নিরন্তর উঁচু হতে থাকে, তারপরে সে আলোকপ্রাপ্ত হয় এবং প্রজ্ঞাবান হয়, সে বিশ্বকে জানতে পারে এবং বিশ্বের সত্যটা দেখতে পারে।

শাক্যমুনি প্রথমদিকে তাঁর ধর্ম শেখানোর সময়ে প্রত্যেকদিন শুধু তিনটে কাজ করতেন: তাঁর শিষ্যদের ধর্ম শেখাতেন (প্রধানত অর্হৎ-এর ধর্ম), একটি পাত্র হাতে নিয়ে ভিক্ষা (খাদ্যের জন্য ভিক্ষা) চাইতেন এবং বসে ধ্যানের মাধ্যমে সাধনা করতেন। শাক্যমুনি এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে ব্রাহ্মণ ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়, পরে দুটো ধর্ম মিলে এক হয়ে যায় যাকে বলে হিন্দুধর্ম। সেইজন্য ভারতবর্ষে বর্তমানে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্ব নেই। পরবর্তীকালের বিকাশ এবং বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মহাযান বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব ঘটে যা চীনের অভ্যন্তরে বিস্তারলাভ করে, যেখানে এটাই হচ্ছে বর্তমানের বৌদ্ধধর্ম। মহাযান

---

[28]শাক্যমুনি - বুদ্ধ শাক্যমুনি, গৌতম বুদ্ধ, সিদ্ধার্থ ।

[29]সমাধি - বৌদ্ধধর্মের ধ্যান অবস্থা।

বৌদ্ধধর্মে প্রতিষ্ঠাকর্তা হিসাবে শুধু শাক্যমুনির উপাসনা করা হয় না, এখানে অনেক বুদ্ধের উপরে বিশ্বাসের ব্যাপার আছে, এরা অনেক তথাগতর[30] উপরে বিশ্বাস করে, যেমন অমিতাভ বুদ্ধ, ঔষধীয় বুদ্ধ ইত্যাদি। এখানে অনুশাসনও অনেক বেড়ে গেছে, সাধনার লক্ষ্যটাও আরও উঁচু হয়ে গেছে। তখনকার সময়ে শাক্যমুনি কয়েকজন শিষ্যকে বোধিসত্ত্ব-র ধর্ম শিখিয়েছিলেন। এই শিক্ষাগুলোকে পরবর্তীকালে সুসংবদ্ধ করা হয় এবং সেটা বিকশিত হয়ে হয়েছে এখনকার মহাযান বৌদ্ধধর্ম যা একটা বোধিসত্ত্ব-ক্ষেত্রের সাধনা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে এখনও হীনযান বৌদ্ধধর্মের পরম্পরাগত প্রথা বজায় রয়েছে, এবং অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয়। বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের পর্বে, একটা সাধনার পথ শাখা হয়ে আমাদের দেশের তিব্বত এলাকায় চলে আসে, যাকে বলা হয় তিব্বতের তন্ত্রবিদ্যা। অন্য আর একটা সাধনা পথ শাখা হয়ে শিনজিয়াংগ[31] হয়ে হান[32] এলাকায় প্রচারিত হয়েছিল, যাকে বলা হতো তাংগ তন্ত্রবিদ্যা (হুই ছাঙ্গ[33] বর্ষকালে যখন বৌদ্ধধর্মকে দমন করা হয় তখন এটা অন্তর্হিত হয়েছিল); আর একটা শাখা ভারতবর্ষে যোগ-এ রূপান্তরিত হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্মে কোনও শারীরিক ক্রিয়ার কথা বলা হয় না এবং চিগোংগ অনুশীলনও করা হয় না। এটা বৌদ্ধধর্মের চিরাচরিত সাধনা পদ্ধতিকে সংরক্ষিত রাখার জন্য। এটাও একটা প্রধান কারণ যার ফলে বৌদ্ধধর্ম দুই হাজারেরও বেশী বছর ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত না হয়েও প্রচলিত রয়েছে। যেহেতু এর মধ্যে কোন বাইরের জিনিস গ্রহণ করা হয় নি, সেইজন্য এই ধর্ম সহজেই নিজস্ব ঐতিহ্য সঠিকভাবে বজায় রাখতে পেরেছে। বৌদ্ধধর্মে বিভিন্ন রকমের সাধনার পথ রয়েছে। হীনযান বৌদ্ধধর্মে নিজের উদ্ধার এবং নিজের সাধনার প্রতি বিশেষ জোর দেওয়া হয়, মহাযান বৌদ্ধধর্ম ইতিমধ্যেই বিকশিত হয়েছে নিজের এবং অন্যের উদ্ধারের জন্য, অর্থাৎ সমস্ত জীবন সত্তার উদ্ধারের জন্য।

---

[30] তথাগত - বুদ্ধ মত অনুযায়ী একজন আলোকপ্রাপ্ত সত্তার সিদ্ধিলাভ জনিত অবস্থান যখন অর্হৎ এবং বোধিসত্ত্বের থেকে উঁচুতে।

[31]শিনজিয়াংগ - উত্তরপশ্চিম চীনের একটি প্রদেশ।

[32]হান - চীনের দেশের প্রধান জাতি

[33]হুই ছাংগ - তাংগ বংশের রাজত্বকালে সম্রাট যু জোংগের সময়কাল (841 A.D. – 846 A.D.)।

7.সৎ সাধনা এবং অশুভ সাধনা

(1) পার্শ্বদ্বার গোলমেলে পথ (*প্যাংগমেন জুয়োতাও*)

পার্শ্বদ্বার গোলমেলে পথকে অ-প্রথাসম্মত(চিমেন) সাধনা পথও বলা হয়। ধর্মগুলি উদ্ভব হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন ধরনের চিগোংগ সাধনা পথ বিদ্যমান ছিল। ধর্মগুলির বাইরে অনেক সাধনা পদ্ধতি জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, যাদের বেশীর ভাগেরই সুসম্বদ্ধ তত্ত্বের অভাব ছিল, সেইজন্য এগুলো কখনোই সম্পূর্ণ সাধনা প্রণালী হিসাবে বিকশিত হতে পারে নি। কিন্তু এই অ-প্রথাসম্মত সাধনার পথগুলোতে নিজস্ব সুসম্বদ্ধ, সম্পূর্ণ এবং অত্যধিক তীব্র সাধনা পদ্ধতি আছে, এবং জনসাধারণের মধ্যে এগুলোও প্রচলিত ছিল। ঐ সব সাধনা প্রণালীগুলোকে সাধারণত পার্শ্বদ্বার গোলমেলে পথ বলা হতো। কেন এইরকম বলা হতো? আক্ষরিক ভাবে প্যাংগমেন-এর অর্থ ‘‘পার্শ্বদ্বার’’ এবং জুয়োতাও-এর অর্থ ‘‘গোলমেলে পথ’’। লোকেরা বুদ্ধমত এবং তাওমতের সাধনাকে সৎ এবং অন্য সব পদ্ধতিগুলিকে পার্শ্বদ্বার গোলমেলে পথ অথবা অশুভ সাধনা পথ মনে করত। প্রকৃতপক্ষে এটা এইরকম নয়। প্রাচীন কাল থেকে এই পার্শ্বদ্বার গোলমেলে পথের সাধনা গোপনেই অনুশীলন করা হতো এবং একটা সময়ে একজন শিষ্যকেই শেখানো হতো। জনগণের মধ্যে প্রচার করার অনুমতি ছিল না। একবার প্রচার করলেও লোকেরা খুব ভালো বুঝতে পারে নি। তাদের শিক্ষার্থীরাও বলে যে তাদের পদ্ধতি বুদ্ধমতও নয় তাওমতও নয়। এদের সাধনার পদ্ধতিতে চরিত্রের আবশ্যকতায় কড়াকড়ি আছে। এদের সাধনা বিশ্বের প্রকৃতিকে অনুসরণ করে, ভালো কাজ করতে বলে এবং চরিত্রকে রক্ষা করতে বলে। এই পদ্ধতির উন্নত কৃতবিদ্য মাস্টাররা সবাই অনুপম দক্ষতার অধিকারী, তাদের কিছু কলাকৌশল প্রচন্ড শক্তিসম্পন্ন, আমি এই অ-প্রথাসম্মত সাধনা পদ্ধতির তিনজন উন্নত কৃতবিদ্য মাস্টারের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম, তাঁরা আমাকে কিছু জিনিস শিখিয়েছিলেন যা বুদ্ধমত অথবা তাওমতের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। সাধনা প্রক্রিয়ার সময়ে তাঁদের প্রদান করা প্রত্যেকটা জিনিসের অনুশীলন বেশ কঠিন ছিল, যে গোংগ বিকশিত হয়েছিল সেটাও খুব অতুলনীয় ছিল। অপরদিকে বর্তমানে প্রচলিত কিছু তথাকথিত বুদ্ধমতের বা তাওমতের সাধনার ক্ষেত্রে কঠোরভাবে চরিত্র বজায় রাখাটা আবশ্যক নয়, সেই কারণে তাদের

সাধনায় উন্নতিলাভ হয় না। সুতরাং প্রত্যেকটা সাধনা পদ্ধতিকে নিরপেক্ষভাবে দেখা উচিৎ।

(2)রণক্রীড়া (Martial Arts) চিগোংগ

রণক্রীড়া চিগোংগ সূদূর অতীতকাল থেকে চলে আসছে, এক্ষেত্রে তত্ত্বগুলোর সম্পূর্ণ সুসম্বদ্ধ প্রণালী এবং সাধনা পদ্ধতিগুলো মিলে একটা স্বতন্ত্র প্রণালী হিসাবে বিকশিত হয়েছে। তবে সঠিকভাবে বললে এটা শুধু আভ্যন্তরীণ সাধনার সব থেকে নীচুস্তরে উদ্ভুত হওয়া অলৌকিক ক্ষমতাগুলির প্রকাশ মাত্র। রণক্রীড়ার সাধনায় যে সব অলৌকিক ক্ষমতার উদয় হয়, সেগুলো আভ্যন্তরীণ সাধনাতেও আবির্ভূত হয়। রণক্রীড়া চিগোংগ সাধনা শুরু হয় চি-এর শারীরিক ক্রিয়া অনুশীলনের মাধ্যমে। যেমন, একটা পাথরকে আঘাত করার ক্ষেত্রে শুরুতে রণক্রীড়া অনুশীলনকারীকে তার নিজের বাহু ঘোরানোর প্রয়োজন, চি-কে গতিশীল করার জন্য। একটা লম্বা সময়ের পরে চি-এর প্রকৃতি পাল্টে গিয়ে একটা শক্তি-পুঞ্জ হয়ে যায় যা এক ধরনের আলোর মতো রূপ নিয়ে বিরাজ করতে থাকে। এই ধাপটা প্রাপ্ত হওয়ার সময়ে গোংগ কাজ করতে শুরু করে। গোংগের বুদ্ধিমত্তা আছে যেহেতু এটা উঁচুস্তরের পদার্থ, গোংগ অন্য মাত্রাতে থাকে এবং ব্যক্তির মস্তিষ্কের চিন্তার দ্বারা এটা নিয়ন্ত্রিত হয়। কেউ আক্রমণ করলে রণক্রীড়া অনুশীলনকারীর চি কে সঞ্চালনের প্রয়োজন হয় না, চিন্তা হওয়া মাত্রই গোংগ এসে যায়। সাধনার সাথে সাথে নিরন্তর তার গোংগ-এর শক্তিবৃদ্ধি হতে থাকে, গোংগ কণাগুলি সূক্ষ্মতর হতে থাকে এবং শক্তি বেশী করে বাড়তে থাকে, লৌহ পাঞ্জা এবং সিঁদুর পাঞ্জার মতো দক্ষতা আবির্ভূত হয়। সিনেমা পত্রিকা এবং টিভিতে এই কয়েকবছরে স্বর্ণ-ঘন্টার ঢাল, লৌহ জামা এই সব দক্ষতার উদয় হয়েছে। এগুলো প্রকটিত হয় রণক্রীড়া এবং অন্তরের সাধনা একই সাথে করার মাধ্যমে, অর্থাৎ অন্তর এবং বাহিরের যুগ্ম সাধনার ফলে এগুলো প্রকটিত হয়। অন্তরের সাধনার ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে সদ্‌গুণের এর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং চরিত্রের সাধনা করতে হবে। তত্ত্বের দিক দিয়ে ব্যাখ্যা করলে, যখন ব্যক্তির দক্ষতা একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছে যায়, তখন তার গোংগ শরীরের ভিতর থেকে বাহিরের দিকে নির্গত হতে থাকে, এর ঘনত্ব খুব বেশী হলে এটা একটা সুরক্ষা কবচ হিসাবে কাজ করে। তাত্ত্বিক দিক দিয়ে রণক্রীড়া চিগোংগ এবং আমাদের অন্তরের সাধনার মধ্যে সবথেকে বড় পার্থক্য হচ্ছে

রণক্রীড়াতে প্রচন্ড গতির মধ্যে ক্রিয়ার চর্চা করা হয় এবং শান্ত অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করা হয় না। শান্ত অবস্থায় প্রবেশ না করার ফলে চি ত্বকের নীচ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে এবং মাংসপেশীর মধ্যে দিয়ে যায়। যেহেতু চি দ্যান ক্ষেত্রে(*দ্যান তিয়েন*)[34] প্রবেশ করে না, সেইজন্য এরা শরীরের সাধনা করে না এবং করতেও পারে না।

(3) বিপরীত সাধনা এবং গোংগ ঋণ

কোন কোন লোক কোনদিনই চিগোংগ অনুশীলন করে নি। হঠাৎ সে রাতারাতি গোংগ প্রাপ্ত হয়, সঙ্গে অনেকটা শক্তিও প্রাপ্ত হয়, এমন কি সে লোকেদের রোগও সারিয়ে দিতে পারে, লোকেরা তাকে চিগোংগ মাস্টার বলে সম্বোধন করতে থাকে, সেও অন্য লোকেদের শেখাতে থাকে। এইসব লোকেরা কোনদিনই চিগোংগ শেখে নি অথবা শুধু কয়েকটা শরীর সঞ্চালন শিখেছে মাত্র, তারা নিজে নিজে সেগুলোর কিছুটা রদবদল করে লোকেদের শেখাতে থাকে। এই ধরনের লোকেরা চিগোংগ মাস্টার হওয়ার যোগ্য নয়। অন্য লোকেদের শেখানোর মত কোন কিছুই এদের নেই। বস্তুত এদের শেখানো জিনিস দিয়ে উঁচু স্তরের সাধনাও সম্ভব নয়, এরা সবথেকে বেশী যা করতে পারে সেটা হচ্ছে রোগ দূর করে শরীর সুস্থ রাখা। এই ধরনের গোংগ কীভাবে এল? প্রথমে বিপরীত সাধনার কথা বলা যাক। সাধারণভাবে পরিচিত বিপরীত সাধনা সেইসব লোকেদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যাদের চরিত্র অত্যন্ত উন্নত, খুবই ভালো মানুষ, বয়স বেশী, যেমন পঞ্চাশের উপর, এদের নতুন করে সাধনা করার জন্য যথেষ্ট সময় নেই। কারণ সেইরকম উঁচুস্তরের মাস্টারের সাক্ষাৎ পাওয়া সহজ নয় যিনি মন এবং শরীরের সাধনার জন্য শারীরিক ক্রিয়া শেখাবেন। যে মুহূর্তে এই ধরনের ব্যক্তি সাধনা করতে চায়, তখনই উঁচুস্তরের একজন মাস্টার তার চরিত্রের উপরে ভিত্তি করে বেশ অনেকটা শক্তি তার শরীরে যোগ করে দেন। এর ফলে সে বিপরীত দিক থেকে অর্থাৎ উপর থেকে নীচে সাধনা করতে পারে, এটা এইভাবে তাড়াতাড়ি হবে। অন্য মাত্রাতে উচ্চস্তরের মাস্টার এই রূপান্তরটা করেন এবং নিরন্তর ব্যক্তির শরীরে বাইরে থেকে শক্তি যুক্ত করতে থাকেন। বিশেষত যখন ব্যক্তি কোন রোগীর চিকিৎসা করছে এবং একটা শক্তিক্ষেত্র তৈরি করছে, তখন মাস্টারের প্রদান করা শক্তিটা ঠিক যেন

---

[34]দ্যান ক্ষেত্র (*দ্যানতিয়েন*) - এটি তলপেটে থাকে।

একটা পাইপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে এসে ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে থাকে। এমন কি কিছু লোক জানেই না যে শক্তিটা কোথা থেকে আসছে। এটাই বিপরীত সাধনা।

আরও এক ধরনের ব্যাপার আছে ---- গোংগ ঋণ, এতে বয়সের কোন সীমাবদ্ধতা নেই। একজন ব্যক্তির মুখ্য চেতনা ছাড়াও সহ চেতনা থাকে এবং প্রায়ই মুখ্য চেতনার তুলনায় সহ চেতনার স্তর উঁচুতে থাকে। কিছু সহচেতনার স্তর এত উঁচুতে থাকে যে সে আলোকপ্রাপ্ত সত্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। যখন এই ধরনের কোন ব্যক্তি সাধনা করতে চায়, তখন সহ চেতনাও তার স্তর উঁচু করতে চায়। তৎক্ষণাৎ সে মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে গোংগ ঋণ নেয়। গোংগ ঋণ নেওয়ার ফলে ব্যক্তির কাছে রাতারাতি গোংগ এসে যায়। গোংগ প্রাপ্ত হওয়ার পরে সে লোকেদের রোগের চিকিৎসা করতে পারে, অসুস্থ লোকেদের যন্ত্রণা লাঘব করতে পারে। এর জন্য সে সাধারণত একটা শক্তিক্ষেত্র তৈরি করে। এইভাবে সে ব্যক্তিগত ভাবে লোকেদের শক্তি প্রদান করে এবং কিছু কৌশলও লোকেদের শেখাতে থাকে।

এই ধরনের ব্যক্তি শুরুর দিকে সাধারণত বেশ ভালই থাকে। গোংগের অধিকারী হয়ে এবং সুপরিচিত হওয়ার ফলে সে খ্যাতি এবং লাভ দুটোই প্রাপ্ত হয়। যখনই খ্যাতি এবং লাভ তার চিন্তার বেশীর ভাগ অংশ দখল করে ----- যা সাধনার থেকেও বেশী, তখন থেকে তার গোংগ নীচে নামতে শুরু করে। তার গোংগ কমতেই থাকে, কমতেই থাকে, শেষে একেবারেই থাকে না।

(4)মহাজাগতিক ভাষা

কিছু লোক হঠাৎ এক বিশেষ ধরনের ভাষায় কথা বলতে থাকে, তারা এই ভাষায় অপেক্ষাকৃত সাবলীলভাবেই কথা বলে; কিন্তু এটা মানবসমাজের কোন ভাষা নয়। এটাকে কি বলে? এটাকে বলে মহাজাগতিক ভাষা। তথাকথিত এই মহাজাগতিক ভাষা, খুব উঁচু নয় সেইরকম জীবনসত্তাদের একধরনের ভাষা। বর্তমানে দেশের মধ্যে বেশ কিছু চিগোংগ অনুশীলনকারীর ক্ষেত্রে এইরকম ঘটনা ঘটেছে। এদের মধ্যে কিছু লোক এমন কি কয়েকটা আলাদা আলাদা ভাষাতেও কথা বলতে পারে। অবশ্য

আমাদের মানব সমাজের ভাষাও খুবই জটিল, এক হাজারেরও বেশী প্রকারের আছে। এই মহাজাগতিক ভাষাকে অলৌকিক ক্ষমতা হিসাবে গণ্য করা হবে কি? আমি বলব: গণ্য করা যাবে না। এটা কারোও নিজস্ব অলৌকিক ক্ষমতা নয় এবং এটা বাইরের থেকে তোমাকে প্রদান করা কোনও ক্ষমতাও নয়। বরঞ্চ এটা বাইরের জীবনসত্তাদের দ্বারা একরকম কৌশলীকৃত পরিচালনা। এই জীবনসত্তাদের উৎপত্তি কিছুটা উঁচু স্তরে যা সবথেকে কম করে ধরলেও মানবজাতির একটু উপরে, এদেরই কেউ একজন কথাটা বলে। যে ব্যক্তি মহাজাগতিক ভাষায় কথা বলছে সে একটা মাধ্যম হিসাবে কাজ করে। বেশীর ভাগ লোক এমন কি নিজেরাও জানে না যে তারা কি বলছে। শুধু যাদের অন্য লোকের মন পড়তে পারার ক্ষমতা আছে তারা কথাগুলোর অর্থ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করতে পারে। যদিও এটা অলৌকিক ক্ষমতা নয়, অনেক লোক যারা এই ভাষায় কথা বলতে পারে, তারা নিজেদের উন্নত মনে করে আত্মতৃপ্ত থাকে এবং তারা মনে করে এটা কোন অলৌকিক ক্ষমতা, সেইজন্য তারা নিজেদের অসাধারণ মনে করে। বস্তুত যে ব্যক্তির দিব্যচক্ষু উঁচুস্তরের, সে নিশ্চিতভাবে দেখতে পারে যে একটা জীবনসত্তা সেই ব্যক্তির থেকে উপরে কোনাকুনিভাবে অবস্থান নিয়ে ব্যক্তির মুখ দিয়ে কথা বলছে।

সেই সত্তা ব্যক্তিকে মহাজাগতিক ভাষা শেখানোর সময়ে একই সাথে তার কিছুটা গোংগও ব্যক্তিকে প্রদান করে। কিন্তু এর পরে ব্যক্তি তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে, সেইজন্য এটা সৎ সাধনা পথ নয়। যদিও এই জীবনসত্তা কিছুটা উপরের মাত্রায় থাকে, সে সৎপথে সাধনা করে না। সেইজন্য সে জানে না যে কীভাবে সাধকের রোগ নিরাময় করবে এবং শরীর সুস্থ রাখবে। সেইজন্য সে কথা বলার মাধ্যমে শক্তি পাঠানোর এই পদ্ধতিটা ব্যবহার করে। যেহেতু এই শক্তিটা ছড়ানো অবস্থায় থাকে সেইজন্য এর ক্ষমতা খুবই কম। সে কিছু ছোটখাট অসুস্থতা অবশ্যই ঠিক করতে পারে, কিন্তু গুরুতর রোগ ঠিক করতে পারে না। বৌদ্ধধর্মে বলা আছে যে উপরের স্তরের লোকেদের কোন কষ্ট সহ্য করতে হয় না, সেখানে কোন দ্বন্দ্ব নেই, সেইজন্য তারা সাধনা করতে পারে না, দৃঢ়তা লাভ করতে পারে না এবং নিজেদের স্তরের উন্নতি ঘটাতে পারে না। সেইজন্য তারা যে কোন উপায়ে লোকেদের রোগ নিরাময় করে ও শরীর সুস্থ করে সাহায্য করতে চায়, যাতে তারা নিজেরা কিছুটা উন্নতি অর্জন করতে পারে। এটাই হচ্ছে মহাজাগতিক ভাষা। এটা কোনও অলৌকিক ক্ষমতা নয় এবং চিগোংগও নয়।

(5)প্রেত ভর করা

সব থেকে সাংঘাতিক ধরনের প্রেত ভর করা অবস্থা হচ্ছে যখন কোন নিম্নস্তরের সত্তা ভর করে, যা অশুভ পথের সাধনার দ্বারা হয়। এটা লোকেদের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক। প্রেত ভর করার পরিণাম খুবই ভয়াবহ। কিছু লোক অনুশীলন শুরু করার পরে, বেশী সময় যেতে না যেতেই একটা মোহের মধ্যে পড়ে যায়, সে রোগের চিকিৎসা করতে চায়, সে ধনী হতে চায়, সে সর্বদা এই সব জিনিসই চিন্তা করতে থাকে। প্রথমে লোকটা বেশ ভালোই ছিল, অথবা ইতিমধ্যেই কোন মাস্টার তার প্রতি লক্ষ্য রাখছিলেন। কিন্তু যেই সে রোগ নিরাময় করার কথা এবং ধনী হওয়ার কথা চিন্তা করল, তখনই সবকিছু গন্ডগোল হয়ে গেল এবং এই সব সত্তাগুলো আকৃষ্ট হল। এগুলো আমাদের এই বস্তুগত মাত্রাতে থাকে না, কিন্তু এদের সত্যিই অস্তিত্ব আছে।

এই অনুশীলনকারী হঠাৎ অনুভব করে যে তার দিব্যচক্ষু খুলে গেছে এবং সে গোংগ প্রাপ্ত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ভর করা প্রেত তার মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করছে। এর দেখা দৃশ্য অনুশীলনকারীর মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয় এবং তার বোধ হয় যেন দিব্যচক্ষু খুলে গেছে। প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির দিব্যচক্ষু একেবারেই খোলে নি। ভর করা প্রেত কেন তাকে গোংগ দিতে চাইছে? এটা কেন তাকে সাহায্য করতে চাইছে? এর কারণ আমাদের এই বিশ্বে পশুদের সাধনা করা নিষেধ আছে, পশুরা চরিত্রের ব্যাপারে কিছু জানে না, সেইজন্য নিজেদের উন্নত করতে পারে না এবং সৎ সাধনার পথ প্রাপ্ত হয় না। সেইজন্য এরা মানুষের শরীরে ভর করে তার মূল নির্যাসটা অধিকার করতে চায়। এই বিশ্বে আরও একটা নিয়ম আছে, না ক্ষতি, না লাভ। এরা তোমার বিখ্যাত হওয়ার ইচ্ছা এবং লাভ করার ইচ্ছাটাকে পূরণ করতে চাইবে, এরা তোমাকে ধনী করে দেবে এবং বিখ্যাত করে দেবে। কিন্তু এরা এমনি এমনি তোমাকে সাহায্য করবে না, এরাও তোমার কাছে কিছু পেতে চায়, এরা তোমার শরীরের মূল নির্যাসটা প্রাপ্ত করতে চায়। যখন এরা তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে তখন তোমার কাছে কোনও কিছুই আর থাকবে না, তোমাকে খুবই দুর্বল করে দেবে অথবা এক চলচ্ছক্তিহীন মানুষে রূপান্তরিত করে ছাড়বে! তোমার চরিত্র সত্যনিষ্ঠ না থাকার জন্যই এটা হয়েছে। একটা সৎ চিন্তা একশটা অশুভকে দমন করতে পারে। তোমার মন খুব সৎ হলে কোন অশুভই তোমার প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

অন্যভাবে বলা যায় ন্যায়পরায়ণ সাধক হও, সমস্ত অর্থহীন আচরণ থেকে বিরত থাক এবং সৎ পথে সাধনা কর।

(6) সৎ সাধনা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও অশুভ অনুশীলন হতে পারে

যদিও কিছু লোক সৎ সাধনা পদ্ধতির অনুশীলন প্রণালীটা শিখেছে কিন্তু তারা নিজেদের আবশ্যকতাগুলোকে কঠোরভাবে মেনে চলে না, চরিত্রের সাধনা করে না এবং শারীরিক ক্রিয়ার সময়ে খারাপ জিনিস চিন্তা করে অর্থাৎ নিজেদের অজান্তে অশুভ সাধনার অনুশীলন করে। উদাহরণস্বরূপ, যখন কোন ব্যক্তি দন্ডায়মান অবস্থান ক্রিয়া করছে অথবা বসে ধ্যান করছে, তখন সে বস্তুত টাকা পয়সা, খ্যাতি এবং ব্যক্তিগত লাভ নিয়ে চিন্তা করছে, অথবা সে ভাবছে: ''অমুক আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে, অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হলে আমি ওকে দেখে নেব,'' অথবা সে কোন একটা অলৌকিক ক্ষমতার কথা চিন্তা করছে। এইভাবে কিছু খারাপ জিনিস তার গোংগের সাথে যুক্ত হয়ে যায়, বস্তুত এটাই অশুভ সাধনার অনুশীলন। ব্যাপারটা খুবই বিপজ্জনক, কিছু খারাপ জিনিসকে আকৃষ্ট করতে পারে, যেমন নিম্নস্তরের কিছু সত্তা, সম্ভবত ব্যক্তি নিজেও জানে না যে সেই এদের আহ্বান করে এনেছে। তার আসক্তিগুলো খুবই তীব্র, মনের মধ্যে ইচ্ছা নিয়ে সাধনা করলে সেটা ফলপ্রসূ হবে না, তার মন সত্যনিষ্ঠ না হলে এমন কি তার মাস্টারও তাকে কোনওভাবে রক্ষা করতে পারবেন না। সেইজন্য সাধক অবশ্যই চরিত্রটাকে কঠোরভাবে বজায় রাখবে, মনকে সৎ রাখবে এবং কোন ইচ্ছা রাখবে না, তা না হলে হয়তো সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

অধ্যায়-দুই
ফালুন গোংগ

বুদ্ধমতের ফালুন শিয়ুলিয়ান[35] দাফা থেকে ফালুন গোংগ-এর উৎপত্তি হয়েছে, এটা বুদ্ধমতের চিগোংগ-এর সাধনার একটি বিশেষ পদ্ধতি। কিন্তু এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য একে বুদ্ধমতের অন্যান্য সাধারণ সাধনা পদ্ধতির থেকে পৃথক করা যায়। অতীতে এই বিশেষ তীব্র সাধনা পদ্ধতির জন্য সাধককে অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের একজন উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক ছিল। আরও অধিক সংখ্যক অনুশীলনকারীর উন্নতির জন্য, একই সাথে বিশাল সংখ্যক নিষ্ঠাবান সাধকদের চাহিদা পূরণ করার জন্য আমি সাধনা পদ্ধতিগুলোর এই প্রণালীকে পুনর্বিন্যাস করে, জনসাধারণের উপযোগী করে প্রচার করেছি। এই রকম পরিবর্তন সত্ত্বেও আমাদের এই সাধনা, অন্য সাধারণ অনুশীলন পদ্ধতিগুলির শিক্ষা এবং স্তরের থেকে অনেক দূর এগিয়ে আছে।

1.ফালুনের কার্যকারিতা

ফালুন গোংগ এর ফালুনের প্রকৃতি বিশ্বের প্রকৃতির মতনই, কারণ এটি বিশ্বেরই একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। ফালুন গোংগ-এর সাধকের শুধু যে অলৌকিক ক্ষমতা এবং গোংগ সামর্থ্যের বিকাশ খুব দ্রুত ঘটে তা নয়, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অতুলনীয় শক্তিশালী এই ফালুনের আবির্ভাব হয়। বিকশিত হওয়ার পরে ফালুন এক বুদ্ধিমান জীবনসত্তা হিসাবে বিরাজ করতে থাকে। সাধারণত এটা সাধকের তলপেটের জায়গায় স্বয়ংক্রিয় ভাবে অবিরাম ঘুরতে থাকে। এটা সারাক্ষণ এই বিশ্ব থেকে শক্তি আহরণ করে শক্তিটাকে বিবর্তন করছে, সব শেষে সেটাকে সাধকের মূল শরীরের মধ্যে গোংগ-এ রূপান্তরিত করছে। এইভাবে ''ফা অনুশীলনকারীকে শোধন করছে,'' এই কার্যকারিতা পাওয়া যায়। অর্থাৎ এটাও বলা যায় যে যদিও

[35]শিউলিয়ান - সাধনা অনুশীলন।

একজন ব্যক্তি প্রতি মিনিটে শারীরিক ক্রিয়া করছে না, কিন্তু ফালুন নিরন্তর ব্যক্তিকে শোধন করে যাচ্ছে। আভ্যন্তরীণ দিক থেকে, ফালুন ব্যক্তিকে মুক্তি প্রদানের ব্যবস্থা করে, ব্যক্তিকে আরও বলবান এবং স্বাস্থ্যবান করে, ব্যক্তিকে আরও বুদ্ধিমান এবং আরও জ্ঞানী করে এবং অনুশীলনকারীকে বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করে। এছাড়া নীচু চরিত্রের লোকেদের বাধার থেকে সাধককে সুরক্ষা প্রদান করে। বাহ্যিক দিক থেকে, ফালুন অন্য লোকেদের মুক্তিতে সাহায্য করে। তাদের রোগ আরোগ্য করে, অশুভকে দূর করে, এবং সমস্ত অস্বাভাবিক পরিস্থিতি পাল্টে দেয়। ফালুন তলপেটের জায়গায় অবিরাম ঘুরতে থাকে, ঘড়ির কাঁটার দিকে নয়বার এবং ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে নয়বার। যখন ঘড়ির কাঁটার দিকে ঘোরে তখন ফালুন প্রবলভাবে বিশ্ব থেকে শক্তি শোষণ করে, এই শক্তিটা প্রচন্ড ক্ষমতাশালী। যতই ব্যক্তির গোংগ সামর্থ্য বাড়তে থাকে, ততই ফালুনের ঘোরার শক্তিও বৃদ্ধি পেতে থাকে, ইচ্ছাকৃতভাবে চি-কে ধরে মাথার উপর থেকে ঢেলে দিলেও এই অবস্থাটা প্রাপ্ত হওয়া যাবে না। ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরলে এ শক্তি নির্গত করে, সমস্ত জীবনসত্তার মুক্তির জন্য সাহায্য করে এবং সমস্ত অস্বাভাবিক পরিস্থিতিকে ত্রুটিমুক্ত করে, অনুশীলনকারীর আশেপাশের লোকেদেরও উপকার হয়। আমাদের দেশে যতগুলো চিগোংগ পদ্ধতি প্রচলিত আছে তার মধ্যে ফালুন গোংগ হচ্ছে প্রথম এবং একমাত্র সাধনা পদ্ধতি যেখানে অর্জিত হয় ''ফা অনুশীলনকারীকে শোধন করছে। ''

ফালুন সব থেকে মূল্যবান, অর্থের বিনিময়ে একে পাওয়া যায় না। যখন ফালুন আমাকে প্রদান করা হয়েছিল, তখন আমার মাস্টার আমাকে বলেছিলেন: ''এই ফালুন অন্য কাউকে হস্তান্তর করা যাবে না।'' এমন কি যে সমস্ত লোকেরা হাজার হাজার বছর ধরে সাধনা করে আসছেন তাঁরাও এটা পেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পায় নি। আমাদের এই সাধনা পদ্ধতি অনেক অনেক লম্বা সময়কালের পরে একজন ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়। এটা অন্য পদ্ধতিগুলোর মতো নয় যেগুলো কয়েক দশক পরে পরে একজনকে হস্তান্তর করা যায়। সেইজন্য ফালুন খুবই মূল্যবান। যদিও আমরা জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য একে পরিবর্তন করে কম শক্তিশালী করেছি, তথাপি এটিও অত্যন্ত মূল্যবান। যে সব সাধক এটা প্রাপ্ত হয়েছে তাদের সাধনার অর্ধেকটা পথ অতিক্রম করা হয়ে গেছে। সাধনার যেটুকু বাকি থাকছে সেটা হচ্ছে তোমার চরিত্রকে শুধু উন্নতি করতে হবে, ভবিষ্যতে একটা খুব উঁচুস্তর তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

অবশ্য যারা পূর্বনির্ধারিত নয়, তারা নিজেরা হয়তো কিছুটা সাধনা করার পর আর করল না, তাহলে তাদের ফালুনও আর থাকবে না।

ফালুন গোংগ হচ্ছে বুদ্ধমতের চিগোংগ, কিন্তু এটা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধমতের সীমানা অতিক্রম করে গেছে, এবং পুরো বিশ্বের সাধনা করছে। অতীতে বুদ্ধমতের সাধনায় বুদ্ধমতের তত্ত্বগুলি আলোচনা করা হতো এবং তাওমতের সাধনায় তাওমতের তত্ত্বগুলি আলোচনা করা হতো। কেউই মূলগতভাবে এই বিশ্বকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে নি। এই বিশ্ব একটা মানুষেরই মত, এর মধ্যে গঠনকারী পদার্থগুলি ছাড়া আছে এর নিজস্ব চরিত্র, যেটাকে তিনটে শব্দে সংক্ষিপ্ত করা যায় সত্য(জেন), করুণা(শান) ও সহনশীলতা(রেন)। তাওমতের সাধনায় প্রধান উপলব্ধি ‘‘সত্য’’-এর উপরে-----সত্য কথা বল, সৎ কার্য কর এবং নিজের মূল সত্যে ফিরে যাও, শেষে সৎ মানুষ হও। বুদ্ধমতের সাধনায় গুরুত্ব দেওয়া হয় ‘‘করুণা’’-এর উপরে, মহান করুণাপূর্ণ হৃদয়ের উদ্রেক হয়, এবং সমস্ত জীবনসত্তার মুক্তির জন্য সাহায্য করা হয়। আমাদের এই সাধনাপথে সত্য, করুণা এবং সহনশীলতার একসাথে সাধনা করা হয় এবং সরাসরি এই বিশ্বের মূল প্রকৃতির উপরে সাধনার দ্বারা সবশেষে ব্যক্তি এই বিশ্বের সাথে সম্মিলিত হয়ে যায়।

ফালুন গোংগ হচ্ছে মন ও শরীরের যুগ্ম সাধনা পদ্ধতি, ব্যক্তির গোংগ সামর্থ্য ও চরিত্র একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছে যাওয়ার পরে সে অবশ্যই আলোকপ্রাপ্ত(গোংগ উন্মোচিত) অবস্থায় পৌঁছে যাবে এবং সাধনাজাত অমর শরীর প্রাপ্ত হবে। সাধারণভাবে ফালুন গোংগকে ত্রিলোক ফা সাধনা এবং বহিঃ ত্রিলোক ফা সাধনাতে ভাগ করা যায়, যার মধ্যে আছে অনেক স্তর। আমি আশা করব, সমস্ত নিষ্ঠাবান অনুশীলনকারী অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাধনা করবে এবং নিরন্তর তাদের চরিত্রের উন্নতি করে সাধনায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে।

2.ফালুনের গঠন

ফালুন গোংগ-এর ফালুন হচ্ছে উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থ দিয়ে তৈরি বুদ্ধিমান এবং ঘূর্ণায়মান এক অবয়ব, যা সম্পূর্ণ মহাবিশ্বের গতির নিয়ম অনুযায়ী

ঘুরতেই থাকে। বিশেষ অর্থে এটা বলা যায় যে ফালুন হচ্ছে এই বিশ্বেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ।

ফালুনের ঠিক মধ্যিখানে আছে বুদ্ধমতের প্রতীক শ্রীবৎস "卍" (সংস্কৃততে শ্রীবৎস-এর অর্থ ''সৌভাগ্য একত্রিত করা''- সি হাই শব্দকোষ অনুসারে) যা ফালুনের কেন্দ্র, এর রঙ স্বর্ণাভ হলুদের কাছাকাছি, এবং বুনিয়াদী রঙ উজ্জ্বল লাল। বাইরের বলয়ের বুনিয়াদী রঙটা হচ্ছে কমলা, চারটে তাইজি প্রতীক এবং চারটে বুদ্ধমতের শ্রীবৎস আট দিকে পর্যায়ক্রমে সাজানো আছে। লাল ও কালো রঙের তাইজি তাওমতের, আর লাল ও নীল রঙের তাইজি মহান আদি তাওমতের। চারটে ছোট শ্রীবৎসের রঙ স্বর্ণাভ হলুদ। ফালুনের বুনিয়াদী রঙ এক একটা পর্যায়ে লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ, ঘন নীল, হাল্কা নীল এবং বেগুনী, এই ক্রম অনুযায়ী পাল্টাতে থাকে। রঙগুলি অতীব সুন্দর (বই এর প্রথমে রঙ্গীন চিত্রটা দেখো)। মধ্যিখানের শ্রীবৎস "卍" এবং তাইজির রঙ পাল্টায় না। বিভিন্ন আকারের ফালুনগুলি এবং শ্রীবৎস "卍" প্রতীকটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘুরতে থাকে। ফালুনের মূল এই বিশ্বের মধ্যে প্রোথিত, এই বিশ্ব ঘুরছে, সমস্ত গ্যালাক্সিগুলোও ঘুরছে, অতএব ফালুনও ঘুরছে। যাদের দিব্যচক্ষু নীচু স্তরের তারা দেখতে পায় যে ফালুন ফ্যানের মতো ঘুরছে; যাদের দিব্যচক্ষু উঁচুস্তরের তারা ফালুনের সম্পূর্ণ ছবিটা দেখতে পারে, যা খুবই সুন্দর এবং অত্যন্ত উজ্জ্বল। এর ফলে সাধক আরও প্রবলভাবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে সাধনার পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত হয়।

3.ফালুন গোংগ সাধনার বৈশিষ্ট্য

(1) ফা অনুশীলনকারীকে শোধন করছে

যারা ফালুন গোংগ-এর অনুশীলন করে, তাদের শুধু যে গোংগ সামর্থ্যের এবং অলৌকিক ক্ষমতাগুলির দ্রুত বিকাশ ঘটে, তা নয়, তারা সাধনার মাধ্যমে ফালুনও প্রাপ্ত হয়। ফালুন খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নির্মিত হয়ে যায়, একবার নির্মিত হয়ে গেলে, এটি খুবই ক্ষমতাসম্পন্ন হয়, অনুশীলনকারীকে বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করে, এছাড়া নীচু চরিত্রের লোকেদের বাধার থেকেও রক্ষা করে। তত্ত্বগতভাবেও, ফালুন গোংগ

প্রচলিত সাধনা পদ্ধতিগুলোর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেহেতু ফালুন তৈরি হওয়ার পরে নিজে নিজেই অবিরাম ঘুরতে থাকে এবং একধরনের বুদ্ধিমান জীবনসত্তা হিসাবে বিদ্যমান থাকে, এটা সাধারণ অবস্থায় অনুশীলনকারীর তলপেটে নিরন্তর শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। ফালুন এইভাবে ঘোরার সময়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই বিশ্ব থেকে শক্তি সংগ্রহ করতে থাকে। ফালুন নিজে অবিরাম ঘুরে যাচ্ছে, ঠিক এই কারণেই ''ফা অনুশীলনকারীকে শোধন করছে,'' এই লক্ষ্যটা পূরণ হচ্ছে অর্থাৎ যদিও ব্যক্তি প্রতিটা মুহূর্তে শারীরিক ক্রিয়া করছে না তবুও ফালুন নিরন্তর ব্যক্তিকে শোধন করে যাচ্ছে। তোমরা জান যে সাধারণ লোকেরা দিনের বেলায় কাজকর্ম করে এবং রাতে বিশ্রাম নেয়, ফলে ক্রিয়া করার সময় খুবই সীমিত। সব সময়ে শারীরিক ক্রিয়া করব এই রকম চিন্তার দ্বারা চব্বিশ ঘন্টা নিরন্তর ক্রিয়া করার লক্ষ্যটা অর্জন করা সম্ভব নয় এবং এমন কি অন্য কোনও উপায় প্রয়োগ করেও পুরো চব্বিশ ঘন্টা অনুশীলন করার লক্ষ্যটা অর্জন করা সত্যিই কঠিন। অথচ ফালুন নিরন্তর ঘুরেই যাচ্ছে। ভেতরের দিকে ঘোরার সময়ে এই বিশ্ব থেকে বিরাট পরিমাণ চি (শক্তির অস্তিত্বের প্রারম্ভিক প্রকাশ) আহরণ করছে। দিবারাত্রি সারাক্ষণ চি শোষণ করে ফালুন তার প্রতিটি অংশে সঞ্চিত করে রূপান্তরিত করে যাচ্ছে এবং চি-কে উচ্চ স্তরের পদার্থে রূপান্তরিত করে, সবশেষে সাধকের শরীরে গোংগ-এ রূপান্তরিত করছে, অর্থাৎ এটাই হচ্ছে ''ফা অনুশীলনকারীকে শোধন করছে।'' ফালুন গোংগের সাধনা, অন্য সব সাধনা প্রণালী অথবা অন্য চিগোংগ অনুশীলন পদ্ধতিগুলোর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যারা দ্যান-এর সাধনা করে।

ফালুন গোংগ সাধনার সব থেকে প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্যানের বদলে ফালুনের সাধনা করা। এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত সাধনা পদ্ধতি জনগণের মধ্যে প্রচারিত হয়ে এসেছে সেগুলো যে মত বা যে সাধনা পথেরই শাখা হোক না কেন, যেমন, বৌদ্ধধর্ম বা তাও ধর্মের বিভিন্ন শাখাপথ, বুদ্ধ-মতের, তাও-মতের বা জনগণের মধ্যে প্রচলিত বিভিন্ন শাখাপথ, অনেক পার্শ্বদ্বার সাধনা, এরা সবাই দ্যানের পথেই সাধনা করে এসেছে, যাকে বলে ''দ্যান পথের চিগোংগ''[36]। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, তাও সাধক সকলেই দ্যানের পথেই সাধনা করে এসেছে। এদের মৃত্যুর পরে শবদাহ করা হলে ''সরীর''[37] তৈরি হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি দিয়ে এর গঠনকারী

---

[36]দ্যানের পথের চিগোংগ - যে সব চিগোংগ পদ্ধতিতে দ্যানের সাধনা করা হয়।

[37]সরীর - কিছু সাধকের শবদাহের পরে পড়ে থাকা এক বিশেষ অবশেষ।

উপাদানগুলি এখনও জানা সম্ভব হয় নি। এই সরীর খুবই শক্ত এবং দেখতে খুব সুন্দর। প্রকৃতপক্ষে এটা অন্যমাত্রা থেকে সংগৃহীত উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থ, আমাদের এই মাত্রার বস্তু নয়। এটাই হচ্ছে দ্যান। এই দ্যান পথের চিগোংগ অনুশীলনের মাধ্যমে একটা জীবনে আলোকপ্রাপ্তির অবস্থায় পৌঁছান খুবই কঠিন। অতীতে দ্যান পথের চিগোংগ সাধনায় অনেক লোক তাদের দ্যানকে উত্তোলন করার চেষ্টা করত। একবার নিওয়ান মহলে[38] পৌঁছে যাওয়ার পরে, ওখান থেকে আর উত্তোলন করে বার করতে পারত না এবং লোকেরা ওখানেই আটকে যেত এবং মৃত্যুবরণ করত। কিছু লোক ইচ্ছাকৃতভাবে ফাটাতে চাইত, কিন্তু এটা করার কোন উপায় ছিল না। কিছু ঘটনা এইরকম হতো, যেমন কোনও ব্যক্তির দাদু সাধনায় সফল না হওয়ায়, তার জীবনের শেষে সে ওই দ্যানটা বের করে এনে ওই ব্যক্তির বাবাকে হস্তান্তরিত করেছিল, তার বাবা সাধনায় সফল না হওয়ায়, তার জীবনের শেষে ওটাকে বের করে ওই ব্যক্তিকে হস্তান্তরিত করে গেল, সেও এখনও পর্যন্ত কোনও কিছু করে উঠতে পারে নি। ব্যাপারটা এতই কঠিন! অবশ্য খুব ভালো সাধনা পদ্ধতিও অনেক আছে। ব্যাপারটা অতটা খারাপ হবে না যদি সত্যিকারের শিক্ষা কারোর থেকে প্রাপ্ত হতে পার, কিন্তু খুব সম্ভবত সে তোমাকে উঁচুস্তরের জিনিস শেখাবে না।

(2) মুখ্য চেতনার সাধনা

প্রত্যেকটা লোকেরই একটা মুখ্য চেতনা থাকে, কাজ করার সময়ে এবং চিন্তা করার সময়ে সে সাধারণত মুখ্য চেতনার উপরেই নির্ভর করে। মুখ্য চেতনা ছাড়া একজন ব্যক্তির একটা অথবা কয়েকটা সহ চেতনা থাকতে পারে। একই সাথে বংশানুক্রমে প্রাপ্ত বার্তাগুলিও বিদ্যমান থাকে। মুখ্য চেতনা এবং সহ চেতনার নাম সবই এক। সাধারণত সহ চেতনার ক্ষমতা বেশী, স্তরও উঁচু হয়, সে আমাদের মানব সমাজের মিথ্যা মায়ার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে না এবং সে তার বিশেষ মাত্রাটাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে। অনেক সাধনা পদ্ধতিতেই সহ চেতনার সাধনার পথটাকে গ্রহণ করা হয়, যেখানে ব্যক্তির ভৌতিক শরীর এবং মুখ্য চেতনা কেবল বাহক হিসাবে

[38]নিওয়ান মহল - পিনিয়াল গ্রন্থিকে তাও মতে এই নামে উল্লেখ করা হয়।

কাজ করে। অনুশীলনকারী সাধারণত এই ধরনের ব্যাপার জানেই না, এমন কি সে মনে মনে আত্মপ্রসাদে ভুগতে থাকে। সমাজে জীবনযাপন করার সময়ে লোকেদের পক্ষে ব্যবহারিক জিনিসগুলোকে পরিত্যাগ করা খুবই কঠিন, বিশেষত যে জিনিসগুলোর প্রতি তার আসক্তি আছে। সেইজন্য অনেক সাধনা পদ্ধতিতে আচ্ছন্ন অবস্থাতে ক্রিয়া করার ওপরে জোর দেওয়া হয়, একেবারে পূর্ণ আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে। এই আচ্ছন্ন অবস্থার মধ্যে রূপান্তর ঘটে, সহ চেতনা অন্য সামাজিক পরিস্থিতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়, এই রূপান্তরের মাধ্যমে সে উন্নতি সাধন করে। একদিন সহ চেতনা সাধনায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় এবং তোমার গোংগ নিয়ে চলে যায়। তোমার মুখ্য চেতনা এবং মূল শরীরের জন্য কোন কিছুই পড়ে থাকে না, তোমার সারাজীবনের সাধনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, যা খুবই দুঃখজনক। কিছু বিখ্যাত চিগোংগ মাস্টার অনেক ধরনের মহান অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, তারা খুবই বিখ্যাত এবং সম্মানিত, কিন্তু তারা এটা জানেই না যে তাদের গোংগ প্রকৃতপক্ষে তাদের নিজেদের শরীরে বিকশিত হয় নি।

আমাদের ফালুন গোংগ সরাসরি মুখ্য চেতনারই সাধনা করে, এবং এটা আবশ্যক যে গোংগ যেন বাস্তবে তোমার শরীরেই সত্যি সত্যি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তবে সহ চেতনাও একটা অংশ প্রাপ্ত হয়, সহায়ক অবস্থানে থাকার ফলে এরও উন্নতি হয়। আমাদের সাধনা পদ্ধতিতে কঠোরভাবে চরিত্রকে বজায় রাখার আবশ্যকতা রয়েছে, তোমাকে সাধারণ মানব সমাজের সব থেকে জটিল অবস্থার মধ্যে চরিত্রকে দৃঢ় করে নিজের উন্নতিসাধন করতে হবে, ঠিক যেমন পাঁকের মধ্য থেকে একটা পদ্মফুল ফুটে ওঠে, এইভাবে তোমাকে সাধনায় সাফল্যলাভ করতে দেওয়া হয়। এই কারণে ফালুন গোংগ এত মূল্যবান। এটা এত মূল্যবান এই কারণে যে তুমি নিজে গোংগ প্রাপ্ত হচ্ছ। কিন্তু এটা আবার সবথেকে কঠিনও। এটা কঠিন, কারণ তুমি যে পথটা গ্রহণ করেছ সেখানে সবথেকে জটিল পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে তোমাকে দৃঢ় করা হবে এবং পরীক্ষা করা হবে।

যেহেতু আমাদের অনুশীলনের উদ্দেশ্য মুখ্য চেতনার সাধনা, সেইজন্য সর্বদা নিজের সাধনাকে পরিচালনা করার জন্য অবশ্যই মুখ্য চেতনাকে ব্যবহার করবে, মুখ্য চেতনারই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিৎ এবং সহ চেতনাকে এই কর্মভার দেওয়া উচিৎ নয়। তা না হলে, একদিন আসবে যখন সহচেতনা উঁচুস্তরে সাধনা সম্পূর্ণ করে, তোমার গোংগ সঙ্গে নিয়ে চলে যাবে, তোমার মূল শরীর এবং মুখ্য চেতনার কাছে কোন কিছুই

থাকবে না। তোমার উঁচুস্তরে সাধনা করার সময়ে তোমার মুখ্য চেতনা যদি ঘুমিয়ে পড়ার মত অচেতন অবস্থায় থাকে এবং কি ক্রিয়া করছ, সে সম্বন্ধে অচেতন থাকে, সেরকম হলে ঠিক হবে না। তোমার কাছে এটা অবশ্যই পরিষ্কার থাকা উচিৎ যে তুমিই ক্রিয়া করছ, সাধনার মাধ্যমে উঁচুতে উঠছ এবং চরিত্র-এর উন্নতি করছ, একমাত্র তাহলেই তোমার নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং তাহলেই তুমি গোংগ প্রাপ্ত হবে। কোন সময়ে অন্যমনস্কভাবে তুমি কোন কাজ সম্পন্ন করলে, অথচ তুমি জানই না কীভাবে এটা সম্পন্ন হল, প্রকৃতপক্ষে এটা তামার সহ চেতনার দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে এবং তোমার সহ চেতনার নির্দেশেই হয়েছে। যেমন, তুমি ওখানে বসে ধ্যান করার সময়ে যদি চোখ খুলে ঠিক সামনে আর একজন তোমাকে দেখতে পাও তাহলে সেটা তোমার সহ চেতনা। আবার যেমন ধর তুমি উত্তর দিকে মুখ করে বসে ধ্যান করছ, কিন্তু হঠাৎ তুমি দেখলে যে তোমার উত্তরদিকে তুমি বসে আছ, তুমি আশ্চর্যান্বিত হলে, ''আমি কীভাবে আমার শরীরের বাইরে এলাম?'' সেক্ষেত্রে সত্যিকারের তুমি বাইরে বেরিয়ে এসেছ, আর যে ওখানে বসে আছে, সে তোমার রক্তমাংসের শরীর এবং সহ চেতনা। এদেরকে আলাদা করা যায়।

ফালুন গোংগ সাধনায় ক্রিয়া করার সময়ে নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়াটা উচিৎ নয়। নিজেকে ভুলে যাওয়াটা ফালুন গোংগ-এর মহান সাধনা পথের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, ক্রিয়াগুলি করার সময়ে মনটাকে অবশ্যই সজাগ রাখবে। যদি তোমার মুখ্য চেতনা বলশালী হয়, তাহলে অনুশীলনের সময়ে বিপথগামী হবে না, এবং সাধারণভাবে কোনও জিনিসই তোমার ক্ষতি করতে পারবে না। যদি তোমার মুখ্য চেতনা খুব দুর্বল হয়, তাহলে কিছু জিনিস তোমার শরীরে আসতে পারে।

(3) শারীরিক ক্রিয়ার অনুশীলনে দিক বা সময়ের বিবেচনা করা হয় না

অনেক সাধনা পদ্ধতিতে, ক্রিয়া করার ক্ষেত্রে কোন্ দিক ভাল, কোন্ সময় ভাল, এগুলোর প্রতি বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমরা এগুলোকে একেবারেই বিবেচনা করি না। এই বিশ্বের বৈশিষ্ট্য এবং এই বিশ্বের বিবর্তনের তত্ত্ব অনুযায়ী ফালুন গোংগ-এর সাধনাটা অনুশীলন করা হয়, সেইজন্য দিক বা সময় গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা প্রকৃতপক্ষে ফালুনের উপরে

বসে অনুশীলন করি, যেটা সর্বদিকে পরিব্যপ্ত এবং সতত আবর্তনশীল। আমাদের ফালুন এই বিশ্বের সঙ্গে একই ছন্দে চলছে। এই বিশ্ব গতিশীল, ছায়াপথ গতিশীল, 'ন'টা গ্রহ সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, এবং এই পৃথিবী নিজে নিজেও ঘুরছে। পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর কোন্ দিকে আছে? এই পৃথিবীর লোকেরা পৃথিবীর দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর এই দিকগুলো উদ্ভাবন করেছে। অতএব তুমি যে কোন একদিকে মুখ করে অনুশীলন করলে, সেটাই সবদিকে মুখ করে অনুশীলন করা হবে।

কিছু লোক বলে মধ্যরাতে শারীরিক ক্রিয়া করা ভাল, আবার কিছু লোক বলে দুপুরবেলা অথবা অন্য কোনও সময় ভাল, আমরা এই ব্যাপারে উদ্বিগ্ন নই, কারণ তুমি ক্রিয়া না করলেও ফালুনই তোমার অনুশীলন করে দিচ্ছে। ফালুন তোমাকে প্রতিটি মুহূর্তে সাধনা করতে সাহায্য করছে অর্থাং ''ফা অনুশীলনকারীকে শোধন করছে।'' দ্যান পথের চিগোংগ-এ লোকেরা দ্যান-এর বিকাশসাধন করে, আর ফালুন গোংগ-এ ফা লোকেদের বিকাশসাধন করে। সময় বেশী থাকলে তুমি ক্রিয়া বেশী করবে, সময় কম থাকলে ক্রিয়া কম করবে, এটা সবক্ষেত্রেই উপযোগী।

4. মন এবং শরীরের যুগ্ম সাধনা

ফালুন গোংগ মনের সাধনা করে আবার শরীরেরও সাধনা করে। ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রথমে ব্যক্তির মূল শরীরের পরিবর্তন ঘটে। মূল শরীরকে পরিত্যাগ না করে, মুখ্য চেতনা ভৌতিক শরীরের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে পুরো সত্তার সাধনা সম্পূর্ণ করে।

(1) মূল শরীরের পরিবর্তন

মানুষের শরীর পেশী, রক্ত এবং হাড়পাঁজরা দিয়ে তৈরি, যেগুলোর আণবিক গঠনপ্রণালী এবং গঠনকারী উপাদানগুলি ভিন্ন ভিন্ন। মানব শরীরের আণবিক উপাদানগুলি সাধনার মাধ্যমে এক উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থে রূপান্তরিত হয়। মানব শরীর আর আদি পদার্থগুলোর দ্বারা গঠিত থাকে না, এর মূল প্রকৃতিটাই পাল্টে যায়। কিন্তু সাধক সাধারণ মানুষদের মধ্যে সাধনা করছে এবং তাদের সঙ্গে একত্রে জীবন যাপন করছে, সে সাধারণ মানুষের সামাজিক অবস্থায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে না, সেইজন্য এই ধরনের

পরিবর্তনের ফলে শরীরের মূল আণবিক গঠনপ্রণালী এবং বিন্যাসক্রম পাল্টায় না, শুধু মূল আণবিক উপাদানগুলি পাল্টে যায়। ব্যক্তির শরীরের পেশী নরমই থাকে, হাড়-পাঁজরাও শক্তই থাকে, রক্ত তরল ভাবেই বইতে থাকে এবং ছুরি দিয়ে কাটলে এখনও রক্তই বের হবে। প্রাচীন চীন দেশের পাঁচ উপাদানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধাতু, কাঠ, জল, আগুন এবং মাটি দিয়ে সব কিছু তৈরি হয়, মানুষের শরীরের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। যখন সাধকের মূল শরীরের পরিবর্তন ঘটে তখন উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থ শরীরের মূল আণবিক উপাদানগুলিকে প্রতিস্থাপিত করে, সেইসময় মানব শরীর আর মূল পদার্থগুলি দিয়ে গঠিত থাকে না। তথাকথিত ‘‘পাঁচ উপাদানকে বা পঞ্চতত্ত্বকে পার করে যাওয়া’’ এই বক্তব্যটার পিছনে এটাই হচ্ছে কারণ।

মন এবং শরীরের এই যুগ্মসাধনা পদ্ধতিতে সবথেকে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর দ্বারা পরমায়ু বৃদ্ধি হয় এবং বয়সটা পিছিয়ে যায়, আমাদের ফালুন গোংগ-এও এই বৈশিষ্ট্যটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। ফালুন গোংগ এই পথেই কাজ করে: এটা মানবশরীরের আণবিক উপাদানগুলিকে মূলগতভাবে পাল্টে দিয়ে, প্রতিটি কোষের মধ্যে সংগৃহীত উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থ সঞ্চিত করে, সবশেষে এই উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থ কোষের উপাদানগুলিকে প্রতিস্থাপিত করে। শরীরে আর বিপাক হয় না, ব্যক্তি এইভাবে পাঁচ উপাদানকে বা পঞ্চতত্ত্বকে পার করে যায়, তার শরীরটা তখন অন্য মাত্রার বস্তু দ্বারা গঠিত হয়, সে এই মাত্রার সময়ের নিয়ন্ত্রণে আর থাকে না, এই ব্যক্তি চিরকাল তরুণ রয়ে যায়।

ইতিহাস অনুযায়ী অতীতে অনেক সিদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন যাদের জীবনকাল অনেক লম্বা ছিল। এখনও কিছু লোক রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন যাদের জীবনকাল কয়েক‘শ’ বছর, অথচ তুমি তাঁদের দেখে চিনতে পারবে না। তাঁরা দেখতে খুব অল্পবয়সি, সাধারণ লোকেদের মতই জামাকাপড় পরে থাকেন, কিন্তু তুমি দেখে বুঝতে পারবে না। মানুষের জীবনকাল এখনকার মতো কম হওয়া উচিৎ নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মানুষ দুশো বছরেরও বেশী বাঁচতে পারে। নথি অনুযায়ী বৃটেনের ফেম কাথ নামে এক ব্যক্তি দুশ সাত বছর বেঁচেছিল। জাপানে মিৎসু টায়রা নামে এক ব্যক্তি দুশ বিয়াল্লিশ বছর পর্যন্ত বেঁচেছিল। আমাদের দেশে তাংগ রাজবংশের সময়ে হুই ঝাও নামে এক সন্ন্যাসী দুশ নব্বই

বছর বেঁচেছিল। ফুজিয়ান[39] প্রদেশে ইয়ং তাই জেলার বর্ষানুক্রমিক ঘটনা বিবরণী অনুসারে, ছেন জুন-এর জন্ম হয়ছিল তাংগ রাজবংশের সম্রাট শী জোংগ-এর রাজত্বকালে, ঝোংগ হা সময় (881 AD)- এর প্রথম বছরে। তার মৃত্যু হয়েছিল ইউয়ান রাজবংশের থাই ডিং সময় (1324 AD)-এ, চারশ তেতাল্লিশ বছর সে বেঁচেছিল। এ সবই নথি দ্বারা সমর্থিত এবং এসবের জন্য অনুসন্ধানও করা যেতে পারে-----এ সব কোন রূপকথার গল্প নয়। সাধনার মাধ্যমে আমাদের ফালুন গোংগ শিক্ষার্থীদের মুখমন্ডলের বলিরেখা স্পষ্টতই কম হয়ে যায়, তাদের চেহারায় একটা লাল আভা ফুটে ওঠে, শরীরটা খুব হাল্কা এবং শিথিল বোধ হয়। হাঁটলে বা কাজ করলে তারা ক্লান্ত বোধ করে না, এসব হামেশাই ঘটে থাকে। আমি নিজে কয়েক দশক ধরে সাধনা করেছি, অন্য লোকেরা সবাই বলে যে বিগত কুড়ি বছরে আমার চেহারায় খুব বেশি পরিবর্তন হয় নি, এটাই এর কারণ। আমাদের ফালুন গোংগ-এর মধ্যে শরীরের সাধনার জন্য প্রচন্ড শক্তিশালী জিনিস আছে। ফালুন গোংগ সাধককে বয়সের দিক দিয়ে দেখলে সাধারণ লোকেদের থেকে অনেকটাই আলাদা মনে হয়, প্রকৃত বয়সের মতো তাকে দেখতে লাগে না। অতএব মন এবং শরীরের যুগ্ম সাধনায় সবথেকে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে, জীবনকাল বেড়ে যায়, বার্ধক্য পিছিয়ে যায় এবং ব্যক্তির সম্ভাব্য আয়ুষ্কালের বৃদ্ধি ঘটে।

(2) ফালুন ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ

আমাদের মানব শরীর একটা ছোট বিশ্ব। মানব শরীরের শক্তি শরীরের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে, যাকে বলে ‘‘ছোট বিশ্বের প্রদক্ষিণ’’ অথবা ‘‘ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ।’’ স্তর অনুযায়ী দেখলে, রেন এবং দু[40] এই দুটো শক্তিনাড়ীকে যুক্ত করলে, শুধু একটা অগভীর ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ তৈরি হয় যা শরীরের সাধনার ক্ষেত্রে কার্যকরী নয়। সত্যিকারের ছোট ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ নিওয়ান মহল থেকে দ্যান ক্ষেত্র পর্যন্ত বিস্তৃত,

---

[39]ফুজিয়ান প্রদেশ - চীনের দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত ।

[40]রেন এবং দু - দু শক্তি নাড়ী অথবা ‘‘সঞ্চালক বাহিকা’’ শ্রোণী গহ্বর থেকে আরম্ভ হয়ে, পিঠের মাঝখান দিয়ে উপরে যায়। রেন শক্তি নাড়ী অথবা ‘‘ধারক বাহিকা’’ শ্রোণী গহ্বর থেকে উঠে শরীরের সামনের অংশের মাঝখান দিয়ে উপরে যায়।

শরীরের ভিতরে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। আভ্যন্তরীণ প্রদক্ষিণের মাধ্যমে সমস্ত শক্তিনাড়ীগুলি উন্মোচিত হয়ে যায় যা শরীরের ভিতর থেকে বাইরের দিকে সম্প্রসারিত হতে থাকে। আমাদের ফালুন গোংগ-এ প্রারম্ভেই সমস্ত শক্তিনাড়ীগুলির উন্মোচন হওয়া আবশ্যক।

বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ হচ্ছে আটটা অতিরিক্ত শক্তিনাড়ীর[41] আবর্তন যা পুরো শরীরটাকে একবার করে প্রদক্ষিণ করে। যদি বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ উন্মোচিত হয়ে যায়, তাহলে একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন অনুশীলনকারী ভূমি থেকে উঠে শূন্যে ভাসমান থাকতে পারে। ''দ্যান জিংগ'' বইতে লেখা ''দিনের আলোয় ঊর্ধ্বে আরোহণ'' কথাটার এটাই অর্থ। কিন্তু তোমার শরীরের কোন একটা অংশ সাধারণত তালাবন্ধ করে রাখা হয় যাতে তুমি উপরে ভেসে উঠতে না পার। তবে এটা তোমার মধ্যে একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে, যার ফলে তুমি অনায়াসে খুব দ্রুত হাঁটতে পারবে, তুমি যখন উপরের দিকে হেঁটে উঠবে, তোমার বোধ হবে কেউ যেন তোমাকে পেছন থেকে ঠেলছে। বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ উন্মোচনের ফলে এক ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা সৃষ্টি হতে পারে, এটা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের চি-এর স্থান বদলাবদলি করতে পারে। হৃদয়ের চি সঞ্চালিত হয়ে পাকস্থলীতে যেতে পারে, পাকস্থলীর চি সঞ্চালিত হয়ে অন্ত্রে যেতে পারে, ইত্যাদি। ব্যক্তির গোংগ সামর্থ্য বৃদ্ধির পরে, যদি এই ক্ষমতাটাকে শরীরের বাইরে ছাড়া হয়, তবে সেটা দূর স্থানান্তরণের অলৌকিকক্ষমতা হয়ে যাবে। এই ধরনের ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথকে, ''শক্তিনাড়ীর ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ''- ও বলা যায়, অথবা ''স্বর্গ মর্ত্য ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ''- ও বলা যায়। কিন্তু এটা গতিশীল হলেও শরীরের রূপান্তরের বা বিবর্তনের লক্ষ্যটা তবুও পূরণ হবে না। এর সঙ্গে সংগতিপূর্ণ আরও একটি ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ অবশ্যই বিদ্যমান থাকে যাকে বলে ''মাওইয়ো(সীমান্ত রেখা) ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ।'' সীমান্ত রেখা ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথের আবর্তনটা এইভাবে হয়: এটা *হুইয়িন*[42] বা

---

[41]আটটা অতিরিক্ত শক্তিনাড়ী - চীনের চিকিৎসা বিদ্যায় এগুলো বারোটা নিয়মিত শক্তিনাড়ীর অতিরিক্ত। আটটি অতিরিক্ত শক্তি নাড়ীর অধিকাংশই বারোটা নিয়মিত নাড়ীকে ছেদ করে, সেইজন্য এগুলোকে স্বাধীন নাড়ী অথবা প্রধান নাড়ী হিসাবে গণ্য করা হয় না।

[42] *হুইয়িন* বিন্দু - পায়ু এবং জননেন্দ্রিয়র মধ্যে অবস্থিত একটি আকুপাংচার বিন্দু।

বাইহুই[43] বিন্দু থেকে বেরিয়ে এসে শরীরের পাশ দিয়ে অর্থাৎ য়িন এবং য়িয়াংগ[44]-এর সংযোগ স্থল দিয়ে আবর্তিত হতে থাকে।

ফালুন গোংগ-এর ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ, সাধারণ সাধনা পদ্ধতিগুলোতে উল্লেখিত আটটা অতিরিক্ত শক্তিনাড়ীর আবর্তনের তুলনায় অনেক বিরাট। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ শরীরের সমস্ত আড়াআড়িভাবে ছেদ করা শক্তিনাড়ীগুলির সঞ্চালন, এক্ষেত্রে শরীরের সমস্ত শক্তিনাড়ীগুলির একবারে পুরোপুরি উন্মোচন হওয়া আবশ্যক, এবং এদের সবারই একই সাথে পরিক্রমণ করা আবশ্যক। আমাদের ফালুন গোংগ-এর মধ্যে এই সব জিনিসই নিহিত আছে। সেইজন্য তোমার ইচ্ছাকৃতভাবে এগুলোর অনুশীলন করার প্রয়োজন নেই, তোমার চিন্তার দ্বারাও এগুলোকে পরিচালিত করার প্রয়োজন নেই, এই রকম কাজ করলে তুমি বিপথগামী হয়ে যাবে। আমি ক্লাসে শেখানোর সময়ে তোমার শরীরের বাইরে শক্তির যন্ত্রকৌশল স্থাপন করব যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবর্তিত হতে থাকবে। এই শক্তির যন্ত্রকৌশল, উচ্চস্তরের সাধনায় এক অনুপম জিনিস, এবং আমাদের অনুশীলনের স্বয়ংক্রিয় ভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে এরও একটা অংশ আছে। এটা ফালুনের মতোই অবিরাম ঘুরতে থাকে। এর দ্বারা চালিত হয়ে শরীরের সমস্ত আভ্যন্তরীণ শক্তিনাড়ীগুলি আবর্তিত হতে থাকে। তুমি ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথের ক্রিয়া না করলেও, বস্তুত, ঐ শক্তিনাড়ীগুলি ইতিমধ্যেই চালিত হয়ে একত্রে আবর্তিত হতে থাকে। খুব অভ্যন্তরে এবং বাইরে এগুলো সব একসাথে ঘুরতে থাকে। আমরা ক্রিয়াগুলির মাধ্যমে শরীরের বাইরে আবর্তিত শক্তির যন্ত্রকৌশলের শক্তিবৃদ্ধি করি।

(3) শক্তিনাড়ীর উন্মোচন

শক্তিনাড়ীর উন্মোচনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে শক্তি সংবাহিত হতে পারে এবং কোষের আণবিক উপাদানগুলি পাল্টে গিয়ে উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থে রূপান্তরিত হতে পারে। যারা অনুশীলন করে না তাদের শক্তিনাড়ীগুলি

---

[43] *বাইহুই বিন্দু* - মস্তকের উপরে অবস্থিত আকুপাংচার বিন্দু।

[44]য়িন এবং য়িয়াংগ - তাও মতে বলা হয় সকল বস্তুর মধ্যে য়িন এবং য়িয়াংগ এই দুই বিপরীত শক্তি উপস্থিত আছে যা পরস্পর বিপরীত কিন্তু স্বতন্ত্র, যেমন, স্ত্রী (য়িন) এবং পুরুষ (য়িয়াংগ),শরীরের সামনের অংশ য়িন, শরীরের পিছনের অংশ য়িয়াংগ।

রুদ্ধ থাকে এবং খুব সংকীর্ণ থাকে। অনুশীলনকারীর শক্তিনাড়ীগুলি ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হতে থাকে এবং রূদ্ধ হওয়া স্থানগুলি উন্মোচিত হতে থাকে। অভিজ্ঞ অনুশীলনকারীদের শক্তিনাড়ীগুলি চওড়া হতে থাকে, এবং উচ্চস্তরে সাধনার সময়ে শক্তিনাড়ীগুলি আরও চওড়া হতে থাকে, কিছু লোকের শক্তিনাড়ী আঙ্গুলের মতো চওড়া হয়ে যায়। কিন্তু শক্তিনাড়ীর উন্মোচন নিজে থেকে ব্যক্তির সাধনার স্তর নির্দেশ করে না এবং গোংগের উচ্চতাও নির্দেশ করে না। ক্রিয়াগুলি করতে করতে শক্তিনাড়ীগুলি উজ্জ্বলতর এবং প্রশস্ততর হতে থাকে, শেষে সব শক্তিনাড়ী জুড়ে গিয়ে এক হয়ে যায়, সেই সময়ে এই ব্যক্তির শক্তিনাড়ীও থাকে না এবং আকুপাংচার বিন্দুও থাকে না। অন্য ভাবে বলা যায় ব্যক্তির সম্পূর্ণ শরীরটাই শক্তিনাড়ী এবং আকুপাংচার বিন্দু হয়ে যায়। এমন কি এই অবস্থাতেও, এটা বলা সম্ভব নয় যে, ব্যক্তি ইতিমধ্যে তাও প্রাপ্ত হয়েছে, এটা শুধু ফালুন গোংগ সাধনা পর্বের মধ্যে এক ধরনের অভিব্যক্তি এবং একটা স্তরের অভিব্যক্তি মাত্র। সাধনার এই ধাপে পৌঁছানোর সময়ে, ব্যক্তি ইতিমধ্যেই ত্রিলোক-ফা সাধনার শেষে পৌঁছে গেছে বলা যায়। একই সাথে একটা পরিস্থিতি উৎপন্ন হয় যখন একটা বাহ্যিক রূপ ভীষণ ভাবে দৃষ্টিগোচর হতে থাকে: তিনটে ফুল মাথার উপরে একত্রিত হয়। ব্যক্তির গোংগ প্রবলভাবে বিকশিত হতে থাকে এসবেরই আকার ও রূপ থাকে, গোংগ স্তম্ভটাও খুব উঁচু হয়ে যায়, এছাড়া মাথার উপরে তিনটে ফুল আবির্ভূত হয়, এগুলোর একটা পদ্মফুলের মতো এবং আর একটা চন্দ্রমল্লিকা ফুলের মতো দেখতে। এই তিনটে ফুল প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে ঘুরতে থাকে, একই সাথে একটা আর একটার চারিদিকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। প্রত্যেকটা ফুলের উপরে একটা করে বৃন্ত আছে যা খুব লম্বা স্তম্ভের মতো এবং আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তম্ভগুলিও ফুলগুলোর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে একে অপরকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে এবং নিজেরাও ঘুরতে থাকে। ব্যক্তির মাথাটা খুব ভারী বোধ হতে থাকে। এই সময়ে ব্যক্তি কেবল ত্রিলোক ফা সাধনার শেষ ধাপটা সম্পূর্ণ করেছে।

5. মানসিক ইচ্ছা

ফালুন গোংগ সাধনায় মানসিক ইচ্ছা দিয়ে চালনা করার কোনও ব্যাপার নেই। মানসিক ইচ্ছা নিজে কোনও কিছু করতে পারে না, কিন্তু এ নির্দেশ পাঠাতে পারে। বাস্তবে কাজ করে অলৌকিক ক্ষমতাগুলি, এদের বুদ্ধিমান

সত্তার মতো চিন্তা করার ক্ষমতা থাকে, যা মস্তিষ্কের সংকেতবার্তা থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতে পারে। অথচ অনেক লোক বিশেষত চিগোংগ সমাজের লোকেদের কাছে এ সম্বন্ধে অনেকগুলো তত্ত্ব আছে, তারা মনে করে মানসিক ইচ্ছা অনেক কাজ সম্পন্ন করতে পারে। কিছু লোক বলে যে, মানসিক ইচ্ছার দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত করা যায়, দিব্যচক্ষু খোলা যায়, রোগ নিরাময় করা যায়, দূর স্থানান্তর করা যায় ইত্যাদি। এটা একরকম ভুল বিবেচনা। নীচু স্তরে সাধারণ মানুষরা মানসিক ইচ্ছার দ্বারা ইন্দ্রিয়গুলিকে এবং চার হাত-পাকে নির্দেশ দিয়ে থাকে। উঁচু স্তরে মানসিক ইচ্ছা একজন অনুশীলনকারীকে উন্নত স্তরে নিয়ে যায়, অলৌকিক ক্ষমতাগুলিকে কিছু কাজ করার নির্দেশ দিয়ে থাকে, অন্যভাবে বলা যায় যে অলৌকিক ক্ষমতাগুলো মানসিক ইচ্ছার নির্দেশেই চালিত হয়। অর্থাৎ মানসিক ইচ্ছাকে আমরা এইভাবেই দেখে থাকি। কখনো কখনো আমরা চিগোংগ মাস্টারকে লোকেদের রোগ নিরাময় করতে দেখেছি, রোগীরা বলে যে মাস্টার আঙ্গুল নড়ানোর আগেই সে ভালো হয়ে গেছে, তারা মনে করে মাস্টারের মানসিক ইচ্ছার দ্বারাই রোগ ভালো হয়ে গেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মাস্টার এক ধরনের অলৌকিক ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে সেটাকে নির্দেশ দেয় রোগ সারাবার জন্য অথবা অন্য কিছু করার জন্য। যেহেতু অলৌকিক ক্ষমতাগুলি অন্য মাত্রায় সঞ্চালন করে, সাধারণ লোকেরা এগুলোকে নিজেদের চোখ দিয়ে দেখতে পায় না, সেইজন্য তারা এটা জানে না এবং মনে করে মানসিক ইচ্ছার দ্বারাই রোগ নিরাময় হয়েছে। কিছু লোক বিশ্বাস করে মানসিক ইচ্ছার দ্বারা রোগ নিরাময় করা যায়, যার ফলে লোকেরা ভুলপথে চালিত হয়, এই দৃষ্টিভঙ্গিটা স্পষ্ট হওয়া উচিৎ।

মানুষের চিন্তাটা একধরনের বার্তা, এক ধরনের শক্তি এবং বস্তুর অস্তিত্বের এক ধরনের প্রকাশ। যখন লোকেরা কোন বিষয় চিন্তা করছে তখন মস্তিষ্ক একটা কম্পাঙ্ক উৎপন্ন করে। কখনো কখনো মন্ত্র উচ্চারণ করলে খুব কার্যকরী হয়, কেন হয়? কারণ এই বিশ্বের নিজের স্পন্দনের একটা কম্পাঙ্ক আছে। তোমার উচ্চারিত মন্ত্রের কম্পাঙ্ক এবং বিশ্বের স্পন্দনের কম্পাঙ্ক যদি মিলে যায়, তখন একটা প্রভাব সৃষ্টি হবে। অবশ্য নির্দোষ বার্তা হলে তবেই এটা কার্যকরী হবে। কারণ এই বিশ্বে অশুভ জিনিসকে থাকতে দেওয়া হয় না। মানসিক ইচ্ছাটাও এক বিশেষ ধরনের চিন্তার পদ্ধতি। উচ্চস্তরের চিগোংগ মাস্টারের ফা-শরীর তার প্রধান শরীরের চিন্তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পরিচালিত হয়। ফা-শরীরের নিজস্ব চিন্তা ভাবনাও থাকে, তার স্বতন্ত্রভাবে সমস্যা সমাধানের এবং কার্য সম্পাদন

করার ক্ষমতাও থাকে, সে সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন এক সত্তা। একই সাথে ফা-শরীর, চিগোংগ মাস্টারের প্রধান শরীরের চিন্তাটাও জানে এবং প্রধান শরীরের চিন্তা অনুসারে কার্যসম্পাদন করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি চিগোংগ মাস্টার কোন ব্যক্তির রোগ নিরাময় করতে চায়, ফা-শরীর সেখানে চলে যাবে, এই চিন্তাটা উদয় না হলে সে যাবে না। অবশ্য যদি সে দেখে যে সত্যিকারের ভালো কাজ করতে হবে, তাহলে সে নিজে থেকেই সেটা করে দেবে। কিছু বড়ো মাস্টার আছে যারা আলোকপ্রাপ্তির স্তর অর্জন করতে পারে নি এবং কিছু জিনিস আছে যেগুলো তারা এখনও জানে না, অথচ তাদের ফা-শরীর সেগুলো জানে।

মানসিক ইচ্ছার আরও একটা অর্থ হয়, যাকে বলে প্রেরণা। প্রেরণা মুখ্য চেতনার থেকে আসে না, মুখ্য চেতনার জ্ঞানের পরিধি খুবই সীমিত। সমাজে যে জিনিসটা নেই সেইরকম কিছু নিয়ে কাজ করতে চাইলে, শুধু মুখ্য চেতনার উপরে নির্ভর করলে সেটা ঠিক হবে না। প্রেরণাটা আসে নিজেরই সহচেতনার থেকে। কিছু লোক সৃজনশীল কর্মে অথবা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিয়োজিত আছে, যখন তারা ভীষণভাবে মাথা ঘামানোর পরেও একটা জায়গায় আটকে যায় এবং কোন উপায় বের করতে পারে না, তখন প্রথমে তারা কাজটাকে একপাশে সরিয়ে রেখে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয় অথবা বাইরে একপাক ঘুরতে যায়। তখন হঠাৎ বিনা চিন্তাতেই প্রেরণা চলে আসে, তৎক্ষণাৎ তারা সবকিছু দ্রুত লিখতে শুরু করে এবং এইভাবে কিছু জিনিস সৃষ্টি করে। এর কারণ হচ্ছে, যখন মুখ্য চেতনা খুব শক্তিশালী থাকে, তখন সে মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করে এবং চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুই উদয় হয় না। মুখ্য চেতনা একবার শিথিল হয়ে গেলেই সহ চেতনা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে এবং মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। সহ চেতনা অন্য মাত্রার অন্তর্ভুক্ত, এই মাত্রার আয়ত্তাধীন নয়, সেইজন্য সে নতুন জিনিস সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু সহ চেতনা সাধারণ মানব সমাজের স্থিতিকে অতিক্রম করতে পারে না বা তার মধ্যে হস্তক্ষেপ করতে পারে না, এবং সমাজের বিকাশক্রমেও প্রভাব ফেলতে পারে না।

প্রেরণা দুই দিক থেকে আসতে পারে, একটা হচ্ছে সহ চেতনা এটা প্রদান করতে পারে, সে এই পৃথিবীর মায়ার মধ্যে জড়িয়ে নেই এবং সে প্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে। আর একভাবে প্রেরণা আসতে পারে সেটা হচ্ছে উঁচুস্তরের বুদ্ধিমান সত্তাদের নির্দেশ এবং পথ প্রদর্শনের মাধ্যমে। যখন উঁচুস্তরের বুদ্ধিমান সত্তারা পথপ্রদর্শন করে তখন লোকেদের মানসিকতা

উদার হয়ে যায় এবং তারা দিগন্ত উন্মোচনকারী জিনিস সৃষ্টি করতে পারে। এই সমাজের এবং বিশ্বের সম্পূর্ণ বিকাশ তাদের নিজেদের বিশেষ নিয়মেই ঘটছে, কোন কিছুই হঠাৎ করে ঘটে না।

6.ফালুন গোংগ সাধনার স্তর

(1) উঁচুস্তরের সাধনা

ফালুন গোংগ সাধনা খুব উঁচুস্তরে সাধিত হয়, সেইজন্য গোংগ বেশ দ্রুত উৎপন্ন হয়। মহান সাধনার পথ সরল এবং সহজ হয়। বৃহত্তর দৃষ্টিতে দেখলে ফালুন গোংগ-এ শরীর সঞ্চালন খুব কমই আছে, অথচ এ শরীরের বিভিন্ন দিকগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে, এবং আরও অনেক জিনিস শরীরে উৎপন্ন হবে সেগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করবে। যতক্ষণ চরিত্র উন্নত হতে থাকবে, গোংগও খুব দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকবে, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে উদ্যম ও শক্তি ব্যয় করার কোন প্রয়োজন নেই, কোন বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োগ করে, যেমন, গলনাধার ও চুল্লি স্থাপন করে, ঔষধীয় রসায়ন জড় করে অথবা আগুন যোগ করে এবং ঔষধীয় রসায়ন জড় করে[45] দ্যান তৈরি করার কোন প্রয়োজন নেই। মানসিক ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার উপরে নির্ভর করা খুবই জটিল, ব্যক্তি খুব সহজেই বিপথগামী হয়ে যেতে পারে। আমরা এখানে সবথেকে সুবিধাজনক এবং সর্বোত্তম পদ্ধতি প্রদান করছি, যা আবার সবথেকে কঠিনও। একজন অনুশীলনকারীকে অন্য সাধনা পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে দুগ্ধ-শুভ্র শারীরিক অবস্থায় পৌঁছতে গেলে, এক দশকের বেশী বছর, কয়েক দশকের বেশী বছর, অথবা আরও লম্বা সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। আর আমরা তোমাকে এক্ষুনি এই ধাপে নিয়ে আসব। অবশ্য তুমি হয়তো এটা বোঝার আগেই এই স্তরটা পার হয়ে গেছ, হয়তো এটা শুধু কয়েক ঘন্টা মাত্র থাকল। কোন একদিন এরকম হবে যে তুমি খুব সংবেদনশীল বোধ করছ, আবার কিছুক্ষণ পরেই সংবেদনশীলতা আর থাকবে না, প্রকৃতপক্ষে তুমি একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তর পেরিয়ে এসেছ।

[45]এটা তাওমত অনুযায়ী, শরীরের আভ্যন্তরীণ রসায়নের একটা পরোক্ষ উপমা।

(2) গোংগ-এর প্রকাশ

ফালুন গোংগ শিক্ষার্থীদের ভৌতিক শরীরের সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে ইতিমধ্যে এমন একটা অবস্থা প্রাপ্ত হয় যেটা দাফা-র সাধনা করার উপযুক্ত, অর্থাৎ ‘‘দুগ্ধ-শুভ্র শারীরিক অবস্থা।’’ সামঞ্জস্য বিধানের মাধ্যমে শরীর এই অবস্থায় পৌছালে একমাত্র তাহলেই গোংগ বিকশিত হবে। যাদের দিব্যচক্ষু উঁচু স্তরের তারা দেখতে পায় যে গোংগ ব্যক্তির চামড়ার উপরে বিকশিত হচ্ছে এবং তার পরে এটা নিক্ষিপ্ত হয়ে অনুশীলনকারীর শরীরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে। তারপরে আবার গোংগ চামড়ার উপরে সৃষ্টি হয়ে, আবার শরীরের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, এইভাবে বার বার ঘটনাক্রমটা ঘটতে থাকবে এবং একটা স্তরের পরে আর এক স্তরে, কখনো কখনো খুব দ্রুত এগোতে থাকবে। এটা হচ্ছে প্রথম পর্বের গোংগ। এই প্রথম পর্বের গোংগ সৃষ্টি হওয়ার পরে অনুশীলনকারীর শরীরটা আর সাধারণ লোকের শরীরের মতো থাকবে না। এই দুগ্ধ-শুভ্র শরীর প্রাপ্ত হওয়ার পরে সে আর অসুস্থ হবে না। এর পরে অসুস্থতার মত এখানে ব্যথা, ওখানে ব্যথা, শরীরের কোন বিশেষ অংশে অস্বস্তি উদয় হতে পারে, কিন্তু এগুলো অসুস্থতা নয়, এগুলো কর্মের দ্বারা সংগঠিত হয়। দ্বিতীয় পর্বের গোংগ-এর বিকাশের পরে, খুব বড়ো বড়ো বুদ্ধিমান সত্তা বিকশিত হতে পারে, তারা চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়, এবং কথা বলে। কখনো কখনো এগুলো ইতস্তত ছড়ানো অবস্থায় উৎপন্ন হয়, আবার কখনো কখনো খুব ঘন সন্নিবিষ্ট অবস্থায় উৎপন্ন হয়, তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তাও বলে। এই বুদ্ধিমান সত্তাদের মধ্যে বিরাট পরিমাণ শক্তি সঞ্চিত থাকে, যা প্রয়োগ করে মূল শরীরের পরিবর্তন ঘটানো হয়।

ফালুন গোংগ সাধনার খুব উচ্চস্তরে কখনো কখনো সারা শরীরে সাধনাজনিত শিশুদের আবির্ভাব ঘটে, এরা খুব দুষ্টু হয়, খেলতে খুব ভালোবাসে এবং খুবই নিঃস্বার্থ স্বভাবের হয়। সাধনার দ্বারা আরও একধরনের শরীর উৎপন্ন হতে পারে, সেটা হচ্ছে অমর শিশু। সে একটা পদ্মফুলের বেদীর উপর বসে থাকে, দেখতে অতীব সুন্দর। সাধনার ফলে আবির্ভূত হওয়া এই অমরশিশু মানব শরীরে য়িন এবং য়িয়াংগ-এর মিলনের ফলে সৃষ্টি হয়। পুরুষ এবং মহিলা সাধক, সবার মধ্যেই এই অমরশিশু উৎপন্ন হতে পারে। অমরশিশু প্রথমে খুব ছোট থাকে, ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়ে বড়ো হতে থাকে, বাড়তে বাড়তে শেষে সাধকের মত

বড়ো হয়ে যায়, একে দেখতে একেবারে সাধকেরই মতন, এবং সাধকের শরীরের মধ্যে থাকে। অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন লোকেরা একে দেখতে পারে এবং বলবে ব্যক্তির দুটো শরীর আছে। বস্তুত ব্যক্তি তার প্রকৃত শরীরের সাধনা করতে সফল হয়েছে। এর উপরে, সাধনার দ্বারা অনেক ফা-শরীরও বিকশিত হয়। সংক্ষেপে, এই বিশ্বে যত রকমের অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ হওয়া সম্ভব, সবই এই ফালুন গোংগ-এর মধ্যে আছে এবং অন্য সাধনা পদ্ধতিগুলোতে যে সব অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত হওয়া সম্ভব, সেগুলোও ফালুন গোংগ-এর মধ্যে আছে।

(3) বহিঃ ত্রিলোক ফা সাধনা

অনুশীলনকারীরা ক্রিয়া করে শক্তিনাড়ীগুলোকে চওড়া করে ফেলে, এইভাবে অবিরাম চওড়া হতে হতে শক্তিনাড়ীগুলো জুড়ে গিয়ে এক হয়ে যায়। অর্থাৎ সাধনা করতে করতে এমন জায়গায় পৌঁছে যায় যখন কোন শক্তিনাড়ী এবং আকুপাংচার বিন্দু থাকে না; বিপরীতপক্ষে বলা যায় যে শক্তিনাড়ী এবং আকুপাংচার বিন্দু শরীরের সর্বত্র বিরাজ করতে থাকে। তৎসত্ত্বেও এটা বলা যাবে না যে তুমি ইতিমধ্যে তাও প্রাপ্ত হয়েছ, এটা শুধু ফালুন গোংগ সাধনা পর্বের এক ধরনের অভিব্যক্তি এবং একটা স্তরের অভিব্যক্তি মাত্র। এই ধাপে পৌঁছে যাওয়ার অর্থ ইতিমধ্যেই ত্রিলোক ফা সাধনার শেষে পৌঁছে যাওয়া। যে গোংগ এই সময়ে বিকশিত হয় সেটাও ইতিমধ্যে প্রচন্ড শক্তিশালী হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে, গোংগ স্তম্ভটাও খুব উঁচু হয়ে যায়, এছাড়া মাথার উপরে তিনটে ফুল আবির্ভূত হয়। এই সময়ে ব্যক্তি ত্রিলোক ফা সাধনার একেবারে শেষের একমাত্র ধাপটাও সম্পূর্ণ করে ফেলে।

এরপরে আর এক ধাপ এগোলে আর কোন কিছুই থাকবে না। ব্যক্তির সমস্ত গোংগ শরীরের সবথেকে গভীর মাত্রার মধ্যে ঢুকে যায়, সে পরিবর্তিত হয়ে শুদ্ধ-শুভ্র শারীরিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তার শরীরটা স্বচ্ছ হয়ে যায়। আর এক ধাপ এগোলেই সে বহিঃ ত্রিলোক ফা সাধনায় প্রবেশ করবে, একে ‘‘বুদ্ধশরীরের সাধনা’’ও বলা যায়। এই অবস্থায় যে গোংগ বিকশিত হয় সেটা ঐশ্বরিক ক্ষমতার শ্রেণীভুক্ত। এই সময়ে তার ক্ষমতা অসীম হয়ে যায়, যা খুবই বিশাল, আরও উচ্চ অবস্থায় পৌঁছে সে সাধনা করে একজন মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তা হয়ে যায়। তুমি চরিত্রের

সাধনা কতটা করতে পারবে, তার উপরেই এটা নির্ভর করে, তুমি সাধনা করে যে স্তরে পৌঁছাবে, সেটাই হবে তোমার সিদ্ধিলাভ জনিত অবস্থানের স্তর। অত্যন্ত নিষ্ঠাবান সাধক সৎ সাধনা পথ অনুসরণ করে, সঠিক ফল প্রাপ্তি করবে, এটাই সাধনায় পূর্ণ সফলতা।

অধ্যায়-তিন

চরিত্রের (*শিনশিংগ*)সাধনা

ফালুন গোংগ-এর সাধনায় সমস্ত সাধক অবশ্যই চরিত্রের সাধনাকে সর্বাগ্রে রাখবে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করবে যে চরিত্রটাই গোংগ বৃদ্ধির আসল চাবিকাঠি এবং উচ্চস্তরের সাধনায় এটাই মূল তত্ত্ব। ঠিক মতো বললে, যে গোংগ সামর্থ্য দ্বারা ব্যক্তির স্তর নির্ধারণ করা হয়, সেটা ক্রিয়া করার ফলে বিকশিত হয় না, বরঞ্চ চরিত্রের সাধনার উপরে নির্ভর করেই বিকশিত হয়। চরিত্রের উন্নতির কথা বলা সহজ কিন্তু করা খুব কঠিন। সাধককে এর জন্য বিরাট প্রচেষ্টা ব্যয় করতে হবে, আলোকপ্রাপ্তির গুণের উন্নতি ঘটাতে হবে, কষ্টের উপর আরও কষ্ট সহ্য করতে হবে, প্রায় অসহনীয় সব জিনিস সহ্য করতে হবে, ইত্যাদি। কেন কিছু লোকের গোংগ অনেক বছর অনুশীলন করার পরেও বৃদ্ধি হয় নি? তার মূল কারণগুলি হচ্ছে: প্রথমত তারা চরিত্রের প্রতি মনোযোগ দেয় নি; দ্বিতীয়ত: তারা উঁচু স্তরের সৎ সাধনার পথ প্রাপ্ত হয় নি। এই বিষয়টা অবশ্যই প্রকাশ্যে আনতে হবে। যেসব মাস্টার অনুশীলন প্রণালী শেখানোর সময়ে চরিত্রের কথা বলে, তারাই সত্যিকারের জিনিস শেখায়। আর যারা শুধু শরীর সঞ্চালন এবং কলাকৌশল শেখায় অথচ চরিত্রের কথা বলে না, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে অশুভ সাধনা। সেইজন্য অনুশীলনকারীকে, তার চরিত্রের উন্নতিসাধনের জন্য প্রচন্ড চেষ্টা প্রয়োগ করতে হবে, একমাত্র তাহলেই সে আরও উঁচুস্তরের সাধনায় প্রবেশ করতে পারবে।

1. চরিত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ

ফালুন গোংগ-এ উল্লেখিত ‘‘চরিত্র’’ কে, শুধুমাত্র ‘‘সদ্‌গুণ’’ দিয়ে পরিবেষ্টিত করা যায় না। সদ্‌গুণের থেকেও বেশী আরও অনেক কিছু এর পরিধির অন্তর্ভুক্ত আছে, যার মধ্যে সদ্‌গুণের বিভিন্ন দিকগুলোও অন্তর্ভুক্ত আছে। একজন ব্যক্তির চরিত্রের ক্ষেত্রে সদ্‌গুণ শুধু একটা অভিব্যক্তি মাত্র। শুধুমাত্র সদ্‌গুণ দিয়ে চরিত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ ব্যাখ্যাটা যথেষ্ট নয়। কীভাবে আমরা ‘‘প্রাপ্তি’’ ও ‘‘ত্যাগ’’ এই দুটো বিষয়ের মোকাবিলা করব

সেটা চরিত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ''প্রাপ্তি''-র অর্থ এই বিশ্বের প্রকৃতির সঙ্গে একীকরণ প্রাপ্ত হওয়া, এই বিশ্বের প্রকৃতি যে সব বৈশিষ্ট্য দিয়ে গঠিত সেগুলি হল সত্য, করুণা ও সহনশীলতা। একজন সাধকের বিশ্বের প্রকৃতির সঙ্গে কতটুকু একীকরণ হয়েছে সেটা প্রতিফলিত হয় ব্যক্তির সদ্‌গুণের মধ্যে। ''ত্যাগ''-এর অর্থ খারাপ চিন্তা এবং খারাপ আচরণ যেমন - লোভ, ব্যক্তিগত লাভের পেছনে ছোটা, কাম, ইচ্ছা, হত্যা করা, লড়াই করা, চুরি করা, ডাকাতি করা, লোক ঠকানো, ঈর্ষা ইত্যাদি ত্যাগ করা। যদি উঁচুস্তরে সাধনা করতে হয় তাহলে ব্যক্তিকে তার সমস্ত ইচ্ছাগুলোর পেছনে ছোটা ত্যাগ করতে হবে, যেগুলো মানুষের মজ্জাগত জিনিস। অর্থাৎ ব্যক্তিকে তার সমস্ত আসক্তিগুলোকে ত্যাগ করতে হবে, সমস্ত খ্যাতি ও লাভকে বেশ হাল্কাভাবে এবং অত্যন্ত নিস্পৃহভাবে দেখতে হবে।

মানুষের ভৌতিক শরীর এবং তার নিজস্ব প্রকৃতি মিলে তৈরি হয় একজন সম্পূর্ণ ব্যক্তি। এই বিশ্বের ক্ষেত্রেও একই রকম ব্যাপার, এর মধ্যে পদার্থের অস্তিত্ব ছাড়াও সত্য-করুণা-সহানুভূতি এই প্রকৃতিও একই সাথে বিদ্যমান। এমন কি বাতাসের প্রতিটি কণার মধ্যেও এই প্রকৃতি বিরাজ করছে। এই প্রকৃতি মানব সমাজে এইভাবে প্রতীয়মান যেমন, ভালো কাজ করলে প্রশংসা পাবে এবং খারাপ কাজ করলে শাস্তি পাবে। উঁচু স্তরে এই প্রকৃতি অলৌকিক ক্ষমতার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয়ে থাকে। যারা এই প্রকৃতির সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে তারা ভালো মানুষ, যারা এর থেকে দূরে সরে যাবে তারা খারাপ মানুষ, যারা এই প্রকৃতি অনুযায়ী চলবে এবং এর সাথে মিলে যাবে তারা তাও প্রাপ্ত হবে। এই বিশ্বের প্রকৃতির অনুরূপ হওয়ার জন্য অনুশীলনকারীর চরিত্র অত্যন্ত উঁচু হওয়া আবশ্যক, একমাত্র তাহলেই উঁচু স্তরে সাধনা করা সম্ভব।

একজন ভালো মানুষ হওয়া সহজ, কিন্তু চরিত্রের সাধনা করা অত সহজ নয়। সাধককে মানসিকভাবে এর জন্য প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক, নিজের মনকে সংশোধন করতে চাইলে, প্রথমে নিজেকে আন্তরিক হতে হবে। লোকেরা এই পৃথিবীতে জীবনযাপন করছে, যেখানে সমাজ খুব জটিল হয়ে গেছে, তুমি ভালো কাজ করতে চাইছ, কিন্তু কিছু লোক হয়তো তোমাকে ভালো কাজ করতে দিচ্ছে না; তুমি অন্যদের ক্ষতি করতে চাও না, কিন্তু অন্য লোকেরা হয়তো নানান কারণে তোমার ক্ষতি করতে চাইছে। এর মধ্যে কিছু জিনিস কোন স্বাভাবিক কারণ ছাড়াই ঘটে।

তুমি কি কারণগুলোর প্রতি আলোকপাত করতে পারবে? তাহলে তোমার কি করা উচিৎ? এই পৃথিবীতে সব কিছুতেই, প্রতিটি মুহূর্তে তোমার চরিত্রের পরীক্ষা হচ্ছে। যখন তোমাকে অবর্ণনীয় অপমানের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, যখন তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, যখন ধন ও লালসার সামনে পড়ছ, যখন তুমি ক্ষমতার লড়াই-এ জড়িয়ে পড়ছ, যখন পারস্পরিক মতভেদের মধ্যে ঈর্ষা ও ঘৃণা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, যখন সমাজের মধ্যে নানান ধরনের বাদানুবাদে ও পারিবারিক বিরোধে জড়িয়ে পড়ছ, এবং বোধগম্য ও অনধিগম্য বিভিন্ন ধরনের দুর্ভোগ সহ্য করছ, তখন তুমি কি চরিত্রের কঠোর আবশ্যকতা অনুযায়ী সর্বক্ষেত্রে নিজেকে যথাযথভাবে সংযত রাখতে পারছ? অবশ্য তুমি যদি সবই সামলাতে পার তাহলে তুমি ইতিমধ্যেই একজন আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয়ে গেছ। হাজার হোক বেশির ভাগ অনুশীলনকারী সাধারণ মানুষ হিসাবেই শুরু করে এবং চরিত্রের সাধনায় অল্প অল্প করেই উন্নতি করতে থাকে। একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাধকের প্রচন্ড কষ্ট করা আবশ্যক এবং তাকে স্থির সংকল্প নিয়ে কঠিন পরিস্থিতিগুলোর মোকাবিলা করতে হবে, শেষে সে সঠিক ফল প্রাপ্ত হবে। আমি আশা করব যে তোমরা সব সাধকরা চরিত্র বজায় রাখার জন্য কঠোরতা অবলম্বন করবে, তাহলেই গোংগ সামর্থ্যের দ্রুত উন্নতি ঘটবে!

2.ত্যাগ এবং প্রাপ্তি

চিগোংগ সমাজে এবং ধর্মের জগতে, ত্যাগ এবং প্রাপ্তির কথা বলা হয়ে থাকে। কিছু লোক মনে করে ত্যাগ-এর অর্থ দান করা, কিছু ভালো কাজ করা, কেউ খুব কষ্টে থাকলে তাকে সাহায্যের হাত বাড়ানো; তারা প্রাপ্তি-র অর্থ মনে করে গোংগ প্রাপ্ত হওয়া। এমন কি মন্দিরের সন্ন্যাসীও বলে যে দান করা উচিৎ। ত্যাগ সম্বন্ধে এই ধারণাটা খুবই সংকীর্ণ এবং সীমিত। ত্যাগ সম্বন্ধে আমরা যা বলি তার অর্থ অনেক বিস্তৃত এবং এটা একটা বিরাট জিনিস। আমরা চাই সাধারণ মানুষের আসক্তিগুলোকে যেন ত্যাগ করা হয় এবং যে মানসিকতা এই আসক্তিগুলোকে ছাড়তে চায় না, তাকেও যেন ত্যাগ করা হয়। তুমি যে জিনিসগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে কর, সেগুলোকে যদি ছাড়তে পার এবং যে জিনিসগুলোকে ছাড়তে পারবে না মনে কর, সেগুলোকে যদি ছাড়তে পার তাহলে সেটাই হবে সত্যিকারের

ত্যাগ। লোককে সাহায্য করা একটা ভালো কাজ, সেটা হচ্ছে কিছুটা করুণাপূর্ণ হৃদয়ের প্রকাশ, যা শুধু ত্যাগের একটা অংশমাত্র।

একজন সাধারণ মানুষ চায় কিছুটা খ্যাতি, ব্যক্তিগত লাভ, একটু ভালো জীবনযাপন, কিছুটা আরাম এবং বেশ কিছু টাকা, এগুলোই সাধারণ মানুষের লক্ষ্য। কিন্তু অনুশীলনকারী হিসাবে আমরা এই রকম নয়, আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে গোংগ, এই সব জিনিস নয়। ব্যক্তিগত লাভ ও ক্ষতির প্রতি আমাদের কিছুটা নিস্পৃহ ভাব রাখা আবশ্যক। কিন্তু আমাদের সত্যি সত্যি কোন জিনিস ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে না। আমরা সাধারণ মানব সমাজের মধ্যে সাধনা করছি এবং সাধারণ মানুষের মতনই আমাদের জীবনধারা বজায় রাখা আবশ্যক। প্রধান ব্যাপার হচ্ছে তোমাকে এই আসক্তিগুলোকে ত্যাগ করতে হবে, সত্যি সত্যি কোন জিনিস তোমাকে ত্যাগ করতে হবে না। তোমার নিজের জিনিস হারিয়ে যাবে না, যে জিনিস তোমার নিজের নয় সেটা তুমি পাবেও না, যদি পেয়েও থাক, তবে সেটা অবশ্যই অন্যদের ফেরৎ দিতে হবে। প্রাপ্তির জন্য অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। অবশ্য এক্ষুনি সব কিছু খুব ভালোভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয় এবং রাতারাতি একজন আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি হয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু একটু একটু সাধনা করতে করতে এবং ধাপে ধাপে উন্নতি করতে করতে তুমি এটা সম্পন্ন করতে পারবে, যতটা তুমি ত্যাগ করতে পারবে, ততটাই তুমি প্রাপ্ত হবে। ব্যক্তিগত লাভের ব্যাপারকে তুমি সর্বদা নিস্পৃহ ভাবে দেখবে, বরঞ্চ কম লাভ হলে শান্তিতে থাকতে পারবে। বস্তুগত ব্যাপারে তোমাকে হয়তো ক্ষতি সহ্য করতে হতে পারে, কিন্তু তোমার সদ্‌গুণ এবং গোংগ-এর ক্ষেত্রে অনেক প্রাপ্তি ঘটবে, এটাই সত্য। কিন্তু তুমি ইচ্ছাকৃতভাবে খ্যাতি, ধন ও ব্যক্তিগত লাভ বিনিময় করে সদ্‌গুণ এবং গোংগ প্রাপ্ত করতে পার না। তোমার আলোকপ্রাপ্তির গুণের উন্নতি হতে থাকলে তুমি আরও বুঝতে পারবে।

মহান তাও সাধনার একজন সাধক একবার বলেছিলেন: ‘‘অন্যরা যে জিনিস চায় আমি তা চাই না অন্যদের যে জিনিস আছে আমার তা নেই কিন্তু আমার যে জিনিস অছে অন্যদের তা নেই এবং অন্যরা যে জিনিস চায় না আমি তা চাই।’’ সাধারণ মানুষ হিসাবে সেইরকম মুহূর্ত পাওয়া খুব কঠিন, যখন সে সন্তুষ্ট বোধ করতে পারে। সে সবকিছুই পেতে চায়, কেবলমাত্র মাটিতে পড়ে থাকা পাথর ছাড়া, যেটা সে নিতে চায় না। অথচ এই তাও সাধক বলেছিলেন: ‘‘তাহলে আমি ওই পাথরই নেব।’’

প্রবাদ আছে: ‘‘জিনিস অল্প হলে সেটা মূল্যবান হয়ে যায় এবং দুস্প্রাপ্য জিনিস অনন্যসাধারণ হয়ে ওঠে।’’ পাথর এখানে মূল্যহীন, কিন্তু অন্য মাত্রাতে সবথেকে মূল্যবান। সাধারণ লোকের পক্ষে এই দার্শনিক তত্ত্বটা বোঝা সম্ভব নয়। অনেক আলোকপ্রাপ্ত মহান সদ্‌গুণ যুক্ত উচ্চস্তরের মাস্টার আছেন যাদের কাছে কোন বস্তুগত জিনিস নেই। তাদের ক্ষেত্রে, এমন কোন জিনিস নেই যা ত্যাগ করা যায় না।

সাধনার পথই সবথেকে সঠিক পথ, অনুশীলনকারীই হচ্ছে সবথেকে বুদ্ধিমান। সাধারণ লোকেরা যে জিনিসের জন্য সংগ্রাম করে এবং যে সামান্য সুবিধা পেতে চায় তা শুধু অল্প সময়ের জন্য। এমন কি তুমি যদি লড়াই করে কোন কিছু এমনিতেই প্রাপ্ত হও অথবা কোন ব্যাপারে সামান্য সুবিধা প্রাপ্ত হও, তাতে কি হবে? সাধারণ লোকেদের মধ্যে এই কথাটা প্রচলিত আছে: ‘‘তুমি জন্মের সময়ে কোনও কিছু সঙ্গে নিয়ে আস নি এবং মৃত্যুর সময়েও কোনও কিছু সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না।’’ তুমি কোন কিছু না নিয়েই পৃথিবীতে এসেছ এবং কোন কিছু না নিয়েই এখান থেকে চলে যাবে, এমন কি তোমার হাড়গুলোও সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তুমি খুব ধনী অথবা কোন উঁচু পদমর্যাদার বিখ্যাত লোক, যাই হও না কেন, তুমি সঙ্গে করে কোনও কিছুই নিয়ে যেতে পারবে না, কিন্তু তুমি গোংগ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে, কারণ এটার বৃদ্ধি তোমার মুখ্য চেতনার শরীরের উপরেই ঘটে থাকে। আমি তোমাকে বলছি গোংগ সহজে অর্জন করা যায় না। এটা এতই মূল্যবান এবং এটা প্রাপ্ত হওয়া এতই কঠিন যে প্রচুর টাকার বিনিময়েও একে পাওয়া যায় না। যখন তোমার গোংগ খুব উঁচুতে উঠে যাবে, তখন যদি তুমি বল যে তোমার অনুশীলন করতে ইচ্ছা করছে না, সেক্ষেত্রে তুমি যতক্ষণ কোন খারাপ কাজ না করছ, তোমার গোংগ তোমার প্রার্থিত সব রকমের পার্থিব বস্তুতে রূপান্তরিত হতে থাকবে, তুমি সবই পেতে পারবে। কিন্তু সাধকের কাছে যে জিনিস থাকে সেটা তোমার কাছে থাকবে না, তোমার কাছে শুধু সেই জিনিসই থাকবে যা এই পৃথিবীতে প্রাপ্ত করা যায়।

কিছু লোক ব্যক্তিগত কোন বিশেষ লাভের উদ্দেশ্যে নিজের নয় এরকম জিনিস অসৎ উপায়ে অধিকার করে, এইরকম একজন ব্যক্তি মনে করে তার বেশ সুবিধা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সে তার সদ্‌গুণের বিনিময়ে অন্যদের থেকে সুবিধা লাভ করেছে, সে শুধু এই ব্যাপারটা জানে না। একজন অনুশীলনকারীর ক্ষেত্রে এটা তার গোংগের থেকে বাদ হয়ে যাবে;

একজন অনুশীলন না করা ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা তার জীবনকাল থেকে বা অন্য কিছু থেকে বাদ হয়ে যাবে। সংক্ষেপে, হিসাবের বইটা সর্বদা বরাবর থাকবে। এটাই স্বর্গীয় নিয়ম। এইরকমও লোক আছে যারা সর্বদা অন্যদের উপর জবরদস্তি করে, খারাপ শব্দ প্রয়োগ করে অন্যদের ক্ষতি করে, ইত্যাদি। এই সব কার্যকলাপ ঘটার সময়ে তারা তাদের সদ্‌গুণের অনুরূপ ভাগ, অন্য পক্ষের দিকে ছুঁড়ে দেয়, অর্থাৎ অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার এবং অপমান করার জন্য তাদের নিজেদের সদ্‌গুণ বিনিময় হয়ে যাচ্ছে।

কিছু লোক মনে করে ভালো মানুষ হওয়া অসুবিধাজনক। সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে ভালো মানুষকে ক্ষতি সহ্য করতে হয়। কিন্তু সে যা পায়, সেটা সাধারণ মানুষ পেতে পারে না, সেটা হচ্ছে সদ্‌গুণ, একপ্রকারের সাদা পদার্থ যা অত্যন্ত মূল্যবান। যার সদ্‌গুণ নেই, তার গোংগও নেই, এটাই চরম সত্য। অনেক লোক আছে, অনুশীলন করা সত্ত্বেও যাদের গোংগ-এর বৃদ্ধি হয় নি, কেন এইরকম হয়? এর কারণ, তারা সদ্‌গুণের সাধনা করে নি। বেশ কিছু লোক আছে যারা সদ্‌গুণের কথা বলে এবং সদ্‌গুণের প্রয়োজনীয়তার কথাও বলে কিন্তু তারা, সদ্‌গুণ কীভাবে গোংগ-এ রূপান্তরিত হচ্ছে, সেই প্রকৃত তত্ত্বটা উদ্‌ঘাটন করতে পারে না। এটা প্রত্যেকের বোধশক্তির ওপর নির্ভর করে। ত্রিপিটকের প্রায় দশহাজারেরও বেশী খন্ডে এবং প্রায় চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে শাক্যমুনির শেখানো তত্ত্বগুলিতে এই এক সদ্‌গুণের কথাই বলা আছে। প্রাচীন চীনদেশের তাও সাধনার বইগুলিতেও এই সদ্‌গুণের কথাই আলোচনা করা হয়েছে। লাও জি[46] লিখিত পাঁচহাজার শব্দের দাও-দ্য-জিংগ বইতেও এই সদ্‌গুণের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু কিছু লোক তবুও একে উপলব্ধি করতে পারে না।

আমরা ত্যাগ-এর কথা বলে থাকি, পেতে হলে ত্যাগ করতে হবে। তুমি সত্যি সত্যি সাধনা করতে চাইলে কিছু দুর্ভোগ-এর সম্মুখীন হতে হবে। যখন বাস্তব জীবনে এর প্রকাশ ঘটবে, তখন শরীরে কিছুটা কষ্ট সহ্য করতে হবে, এখানে অস্বস্তি হবে, ওখানে অস্বস্তি হবে, কিন্তু সেগুলো কোনও রোগ নয়। এই দুর্ভোগ সমাজের মধ্যে, পরিবারের মধ্যে, কার্যক্ষেত্রে

---

[46]লাও জি - দাও দে জিংগের লেখক, এবং তাঁকে দাও বা তাও মতের স্রষ্টাও বলা হয়ে থাকে। চতুর্থ শতাব্দীতে (B.C.) তিনি জীবনযাপন করেছিলেন। দাও দে জিংগকে, তাও তে চিংগও বলা হয়ে থাকে।

যে কোনও ভাবে আসতে পারে। ব্যক্তিগত লাভের ক্ষেত্রে বিরোধ এবং আবেগজনিত সংঘাত হঠাৎ করে উপস্থিত হতে পারে, উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমার চরিত্রের উন্নতি ঘটানো। এই জিনিসগুলি সাধারণত খুবই অকস্মাৎ এবং অত্যন্ত তীব্র আকারে ঘটে। যদি তুমি কোন ব্যাপারে মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হও এবং ভীষণ অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যাও, যা তোমাকে চরম লাঞ্ছনার মধ্যে অথবা একটা গোলমেলে পরিস্থিতির মধ্যে ফেলে দেয়, সেই সময়ে তুমি কীভাবে সবকিছু সামলাবে? তুমি খুব শান্ত এবং অবিচলিত থাকবে, এটুকু করতে পারলেই, এই দুর্ভোগের মধ্যে দিয়ে তোমার চরিত্রের উন্নতি ঘটবে, তোমার গোংগও সেই অনুসারে উপরের দিকে বাড়তে থাকবে। যদি তুমি এতটুকু করতে পার, তাহলে ততটুকুই তুমি লাভ করতে পারবে। তুমি যতটুকু প্রচেষ্টা ব্যয় করবে, ততটুকুই অর্জন করবে। সাধারণত এই দুর্ভোগ চলার মধ্যে লোকেরা হয়তো এটা উপলব্ধি করতে পারে না, কিন্তু আমাদের উপলব্ধি করা আবশ্যক। আমাদের সাধারণ লোকের মতো বিভ্রান্ত হলে চলবে না, যখন মতবিরোধ সৃষ্টি হবে, সেই সময়ে আমাদের মনোভাব উঁচু রাখা উচিৎ। যেহেতু আমরা সাধারণ লোকেদের মধ্যে সাধনা করছি, আমাদের চরিত্র তাদের মধ্যে থেকে আরও দৃঢ় হবে। আমাদের অবশ্যই কয়েকটা ক্ষেত্রে ভুল হবে, তার থেকে শিক্ষা অর্জন করতে হবে। যদি এটা চাও যে কোনও সমস্যার মুখোমুখি না হয়েই, আরামের মধ্যে থেকে তোমার গোংগ বৃদ্ধি হবে, সেটা অসম্ভব।

3. সত্য, করুণা এবং সহনশীলতার একসঙ্গে সাধনা

আমাদের এই সাধনা পদ্ধতিতে সত্য, করুণা এবং সহনশীলতার একসঙ্গে সাধনা করা হয়। সত্য বলতে বোঝায় সত্যি কথা বলা, সত্যি কাজ করা, নিজস্ব সত্যে ফিরে যাওয়া, এবং শেষে সত্যিকারের মানুষ হওয়া। করুণা বলতে বোঝায়, সহানুভূতিশীল হৃদয়ের উদ্রেক হওয়া, ভালো কাজ করা এবং লোককে উদ্ধার করা। আমরা বিশেষত সহনশীলতার উপরে বেশী গুরুত্ব দিই। শুধুমাত্র সহনশীলতার সাধনা করেই আমরা মহান সদ্‌গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি হয়ে যেতে পারি, সহনশীলতা খুবই ক্ষমতাযুক্ত জিনিস যা সত্য এবং করুণাকে অতিক্রম করে যায়। সাধনার সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াতে তোমাকে ধৈর্যশীল হতে বলা হবে, চরিত্রের প্রতি নজর রাখতে হবে এবং অবিবেচকের মত কাজ করবে না।

সমস্যার মুখোমুখি হলে সেটা সহ্য করা সহজ নয়। কিছু লোক বলে: ‘‘যদি তুমি মার খেয়েও প্রত্যাঘাত না কর, গালমন্দ শুনেও প্রত্যুত্তর না দাও, অথবা এমন কি যদি তুমি তোমার পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের সামনে ভীষণ অপমানজনক পরিস্থিতিও সহ্য করতে পার, তাহলে তুমি আহঃ কিউ[47] হয়ে গেলে না কি? !’’ আমি বলব তুমি যদি সমস্ত ক্ষেত্রে খুব স্বাভাবিক আচরণ কর, তাহলে তোমার বুদ্ধি অন্যদের তুলনায় এতটুকুও কম নয়, শুধু ব্যক্তিগত লাভের দিকটাকে খুব নিস্পৃহভাবে দেখলে, কেউই তোমাকে মূর্খ বলবে না। সহ্য করার ক্ষমতাটা দুর্বলতা নয় এবং আহঃ কিউ হওয়াও নয়। এটা প্রচন্ড ইচ্ছাশক্তি এবং আত্মসংযমের পরিচয়। চীনের ইতিহাসে হান শিন[48] নামে এক ব্যক্তি একবার অন্য এক ব্যক্তির দুই পায়ের মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়ার মতো অপমান সহ্য করেছিলেন যা একটা বিরাট সহনশীলতা। একটা প্রাচীন প্রবাদ আছে: ‘‘একজন সাধারণ মানুষ অপমানের সম্মুখীন হলে, তরবারি বের করে লড়াই শুরু করে দেয়।’’ অর্থাৎ যখন একজন সাধারণ মানুষ অপমান বোধ করে, তখন সে তরবারি বের করে প্রত্যাঘাত করে, লোকেদের গালমন্দ করে, এবং তাদের ঘুষি মারে। মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে এসে জীবনযাপন করাটা সহজ ব্যাপার নয়। কিছু লোক আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য জীবনযাপন করে, যার একেবারেই মূল্য নেই এবং যা খুবই ক্লান্তিকর। চীন দেশে একটা প্রবাদ আছে: ‘‘এক পা পিছিয়ে গেলেই দেখবে, সমুদ্র এবং আকাশটা কিরকম সীমাহীন।’’ সেইরকম তুমি কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে যদি এক পা পিছনে যাও, তখন দেখবে যে দৃশ্যপটটা সম্পূর্ণ আলাদা।

যে সব লোকেরা তোমার বিরোধিতা করছে এবং যারা তোমাকে ব্যক্তিগতভাবে অপমান করছে, তাদের প্রতি একজন অনুশীলনকারী হিসাবে তুমি যে কেবলমাত্র সহনশীল হবে তা নয়, তুমি অবশ্যই তাদের প্রতি উদার মনোভাব বজায় রাখবে এবং এরও উপরে তুমি অবশ্যই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। যদি তাদের সাথে তোমার বিরোধ না ঘটে, তাহলে কীভাবে তোমার চরিত্রের উন্নতি হবে? কীভাবেই বা তোমার কালো পদার্থগুলো যন্ত্রণা সহ্য করার মাধ্যমে সাদা পদার্থে রূপান্তরিত হবে?

---

[47]আহঃ কিউ - চীনের উপন্যাসের এক মূর্খ চরিত্র।

[48]হান শিন - হান রাজবংশের (206 B.C.– 23 A.D.) প্রথম সম্রাট লিউ বাংগের প্রধান সেনাপতি ছিলেন।

কিভাবেই বা তোমার গোংগ বাড়বে? ভীষণ দুর্ভোগের মধ্যে থাকার সময়ে লোকেদের পক্ষে এটা করা খুবই কঠিন, তবুও এই সময়টাতে নিজেকে অবশ্যই সংযত রাখবে, যেহেতু তোমার গোংগ সামর্থ্য বৃদ্ধির সময়ে তোমার দুর্ভোগও নিরন্তর বাড়তে থাকবে, অর্থাৎ দেখা হবে যে তুমি চরিত্রের উন্নতি করতে পারছ কি পারছ না। শুরুতে হয়তো এর প্ররোচনায় তুমি বিচলিত বোধ করবে, ভীষণ ক্রুদ্ধ হবে এবং নিজেকে সামলাতে বেশ কষ্ট হবে। এতই ক্রুদ্ধ হবে যে তোমার যকৃৎ এবং পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হতে থাকবে, কিন্তু তুমি যদি ক্রোধে ফেটে না পড় এবং নিজের ক্রোধকে বশে আনতে পার, তাহলে সেটা ভালো ব্যাপার, তুমি সহ্যশক্তি প্রয়োগ করতে শুরু করেছ, এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে সহ্যশক্তি প্রয়োগ করতে পারছ। তখন তুমি ধীরে ধীরে এবং নিরন্তর নিজের চরিত্রের উন্নতি ঘটাতে পারবে, তুমি সত্যি সত্যি ওই ব্যাপারগুলোকে নিস্পৃহভাবে দেখতে পারবে, সেই সময়ে আরও বেশী করে উন্নতি ঘটবে। সাধারণ লোকেরা সামান্য মতবিরোধকে এবং ছোটখাট সমস্যাকে খুব বিরাট মনে করে। তারা আত্মমর্যাদা রক্ষার জন্য জীবন যাপন করে, কিছুই সহ্য করতে পারে না, ক্রোধ অসহনীয় হয়ে উঠলে এরা যা কিছু করতে সাহস করে। কিন্তু একজন অনুশীলনকারী হিসাবে, লোকেরা যে জিনিসগুলোকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে, তোমার কাছে সেগুলো খুব সামান্য, অতি সামান্য মনে হবে, এমন কি খুবই তুচ্ছ মনে হবে। যেহেতু তোমার লক্ষ্য খুবই দীর্ঘকাল-ব্যাপী বিস্তৃত এবং অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। এই বিশ্ব যতদিন থাকবে, তুমিও ততদিন বাঁচবে। তুমি পুনরায় ওই জিনিসগুলো নিয়ে চিন্তা করলে দেখবে, ওই সব জিনিস তোমার কাছে আছে কি নেই, এটা কোন ব্যাপারই নয়। তুমি বৃহদাকারে চিন্তা করলে এই সব জিনিস কাটিয়ে উঠতে পারবে।

4. ঈর্ষা দূর করা

ঈর্ষা সাধনার পক্ষে খুবই বড় বাধা, এবং অনুশীলনকারীর উপরে এর প্রভাবও অত্যন্ত বেশী। এটা অনুশীলনকারীর গোংগ সামর্থ্যকে সরাসরি প্রভাবিত করে, সাথী সাধকদের ক্ষতি সাধন করে, এবং আমাদের সাধনায় উঁচুস্তরে উন্নতির ক্ষেত্রে সাংঘাতিক বাধার সৃষ্টি করে। একজন সাধক হিসাবে এর একশভাগই দূর করা আবশ্যক। কিছু লোক যদিও সাধনায় একটা বিশেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে, কিন্তু তারা এখনও ঈর্ষাকে পরিত্যাগ করতে পারে নি। যত একে দূর না করবে, তত এটা সহজেই প্রবলতর

হতে থাকবে। এই আসক্তির নেতিবাচক প্রভাবে ব্যক্তির চরিত্রের উন্নত অংশটাও দুর্বল হয়ে পড়ে। শুধু এই ঈর্ষা নিয়ে আলাদা করে আলোচনা করা হচ্ছে কেন? কারণ এই ঈর্ষা চীনের লোকেদের মধ্যে সবথেকে প্রবলভাবে এবং সবথেকে লক্ষণীয়ভাবে প্রকটিত হয়ে থাকে, লোকেদের মানসিকতায় এর গুরুত্ব সবথেকে বেশী, যদিও বেশ কিছু লোক এটা সম্বন্ধে সচেতন নয়। এই ঈর্ষার আসক্তিটা প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য, একে প্রাচ্যের ঈর্ষা অথবা এশিয়ার ঈর্ষাও বলা হয়। চীনের লোকেরা খুব অন্তর্মুখী হয়, খুব চাপা স্বভাবের হয়, এবং সহজে নিজেদের প্রকাশ করে না, ফলে সহজেই ঈর্ষা উৎপন্ন হতে পারে। সব কিছুরই দুটো দিক আছে, অন্তর্মুখী স্বভাবের ভালো দিক আছে এবং খারাপ দিকও আছে। পশ্চিমের লোকেরা অপেক্ষাকৃত বহির্মুখী হয়, তোমাকে একটা উদাহরণ দিচ্ছি, যদি একটা বাচ্চা বিদ্যালয়ে একশ নম্বর পেয়ে থাকে আর আনন্দের সঙ্গে বাড়িতে আসার সময়ে চিৎকার করে বলতে থাকে: ‘‘আমি একশ পেয়েছি, ...’’। তখন অভিনন্দন জানানোর জন্য প্রতিবেশীরা তাদের দরজা-জানলা খুলে বলবে: ‘‘শাবাশ টম, তোমাকে অভিনন্দন!’’ সবাই তার জন্য খুশী হবে। তোমরা চিন্তা কর, যদি চীন দেশে এটা ঘটে, একবার শুনলেই লোকেরা বিরক্তি প্রকাশ করবে: ‘‘ও একশ পেয়েছে, তো কি হয়েছে? এতে দেখানোর কি আছে?’’ এক্ষেত্রে মনের ভিতরে ঈর্ষা থাকার দরুন প্রতিক্রিয়াটা সম্পূর্ণ আলাদা হবে।

একজন ঈর্ষাপরায়ণ লোক অন্য লোকেদের হীনদৃষ্টিতে দেখে এবং সে অন্যকে তার আগে যেতে দিতে চায় না। সে যখন দেখে অন্য কেউ তার থেকে আরও যোগ্য, তখন সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, অসহ্য বোধ করে, এবং ব্যাপারটাকে অস্বীকার করে। অন্যদের বেতন বৃদ্ধি হলে সেও বেতন বৃদ্ধি করতে চায়, বোনাস একই রকম পেতে চায়, কোন ভুল হলে সে একই ভাবে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে চায়। অন্যদের অনেক টাকা উপার্জন করতে দেখলে তার চোখ ঈর্ষায় জ্বলতে থাকে। যাই হোক, তাকে অন্য কেউ অতিক্রম করে যাবে, এটা সে একেবারেই মেনে নিতে পারে না। কিছু লোক গবেষণায় সাফল্য লাভ করার পরে কোন বোনাস গ্রহণ করতে সাহস করে না, কারণ তাদের ভয় হয় যে অন্যদের ঈর্ষা হতে পারে। কোন ব্যক্তিকে বিশেষ সম্মান দ্বারা ভূষিত করা হলে, সে সেটা প্রকাশ করতে সাহস করে না, কারণ সে অন্যদের ঈর্ষা এবং বিদ্রূপকে ভয় পায়। কিছু চিগোংগ মাস্টার অন্য চিগোংগ মাস্টারদের শিক্ষা প্রদানকে স্বীকার করে না এবং তাদের বাধা দেয়, এটা চরিত্রের সমস্যা।

ধরা যাক, একটা দলে সবাই একসাথে অনুশীলন করছে, এবার কিছু লোক পরে অনুশীলন আরম্ভ করল, কিন্তু তাদের মধ্যে কারোর অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত হয়ে গেল। তখন কেউ কেউ বলবে: ‘‘ওর কাছে কি এমন আশ্চর্যজনক জিনিস আছে?’’ আমি কত বছর ধরে অনুশীলন করে আসছি, এবং আমার কাছে এক গাদা প্রশংসাপত্র জমা করা আছে। সে কীভাবে আমার আগে অলৌকিক ক্ষমতা অর্জন করবে? তখন তার ঈর্ষাটা জেগে ওঠে। সাধনা হচ্ছে নিজের অন্তরে খোঁজ করা, সাধক বেশী করে নিজেরই সাধনা করবে এবং নিজের মধ্যেই কারণগুলোর খোঁজ করবে। তোমার যে দিকগুলোর প্রতি যথেষ্ট নজর দাও নি, সেই দিকগুলোর উন্নতির জন্য নিজের উপরেই কঠোর পরিশ্রম করা উচিৎ, অন্তরের দিকেই নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করবে। তুমি যদি বাইরের দিকে নিজের ক্ষমতা প্রয়োগ করে অন্যদের মধ্যে কারণগুলোর খোঁজ কর, সেক্ষেত্রে তুমি এখানেই পড়ে থাকবে, আর অন্যরা সবাই সাধনা সম্পূর্ণ করে উর্ধ্বে আরোহণ করবে। তোমার সবকিছু ব্যর্থ হল না কি? সাধনা হচ্ছে ব্যক্তির নিজেরই সাধনা!

ঈর্ষা, অন্য সাথী সাধকদেরও ক্ষতি করে, যেমন কেউ গালমন্দ করলে অন্যদের পক্ষে শান্ত অবস্থায় প্রবেশ করা কঠিন হয়ে যায়। যখন সে বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হবে, সে তখন ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে অন্য সাথী সাধকদেরও ক্ষতি করতে চাইবে। উদাহরণস্বরূপ একজন খুব ভালোভাবে সাধনা করা লোক, বসে ধ্যান করছে, যেহেতু তার শরীরে গোংগ আছে সে একটা পাহাড়ের মতো ওখানে বসে আছে। এই সময়ে ওখানে দুটো সত্তা ভেসে এল, যাদের মধ্যে একজন অতীতে ভিক্ষু ছিল, কিন্তু ঈর্ষা থাকার জন্য আলোকপ্রাপ্ত হতে পারে নি, যদিও তার কিছুটা গোংগ সামর্থ্য ছিল, কিন্তু তার সাধনায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নি। যখন তারা সেই জায়গায় পৌঁছাল যেখানে ব্যক্তি বসে ধ্যান করছে, একজন বলল: ‘‘অমুক ব্যক্তি এখানে বসে ধ্যান করছে, চলো আমরা ঘুরপথে যাই!’’ কিন্তু অন্যজন বলতে থাকল: ‘‘অতীতে আমি একবার তাই পর্বতের একটা কোনা কেটে ফেলে দিয়েছিলাম।’’ সে তখন অনুশীলনকারীকে হাত দিয়ে আঘাত করার চেষ্টা করল। কিন্তু সে উপরে হাতটা তোলার পরে আর নীচে নামাতে পারল না। যেহেতু ব্যক্তি সৎ পদ্ধতিতে সাধনা করছিল এবং একটা সুরক্ষা কবচ তাকে ঢেকে রেখেছিল, সেইজন্য সেই সত্তা তাকে আঘাত করতে পারেনি। সেই সত্তা একজন সৎ পদ্ধতির সাধককে আঘাত

করতে চেয়েছিল, সেইজন্য বিষয়টা গুরুতর এবং সে শাস্তি পাবে। ঈর্ষাপরায়ণ লোকেরা নিজেদের এবং একই সাথে অন্যদেরও ক্ষতি করে।

5. আসক্তি দূর করা

আসক্তির অর্থ একজন অনুশীলনকারী ভীষণ একগুঁয়েভাবে অথবা কারোর উপদেশ না শুনে, কোন বিশেষ বস্তু বা লক্ষ্যের প্রতি নাছোড়বান্দা হয়ে আঁকড়ে থাকে এবং ওগুলোর থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারে না। কিছু লোক এই পৃথিবীতে অলৌকিক ক্ষমতার পেছনে ছুটে বেড়ায় এবং এটা অবশ্যই তাদের উচ্চতর সাধনাকে প্রভাবিত করে। এই মানসিকতা যত প্রবল হবে তত একে ত্যাগ করা কঠিন, তাদের মনটাও আরও বেশী করে ভারসাম্যহীন এবং অস্থির হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে এই সব লোকেদের মনে হবে যে তারা নিজেরা কোনও কিছুই পেল না, এমন কি তারা যা শিখেছে, সেগুলির প্রতিও তাদের সন্দেহের মনোভাব দৃঢ় হতে থাকে। আসক্তির সৃষ্টি হয় মানুষের ইচ্ছার থেকে। এই আসক্তিগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এদের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলি স্পষ্টতই সীমিত, অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য ও সুনির্দিষ্ট, এবং প্রায়শ ব্যক্তি নিজেই হয়তো এগুলোর সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে না। একজন সাধারণ মানুষের অনেক আসক্তি থাকে, যখন সে কোন জিনিস পাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে তার পেছনে ছোটে, তখন সে হয়তো প্রয়োজন অনুযায়ী ভালো বা খারাপ যে কোন উপায় ব্যবহার করতে পারে। একজন সাধকের আসক্তিগুলো অন্যভাবে প্রকটিত হয়, যেমন কোন বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতার পেছনে ছোটা, বিশেষ দৃশ্যাবলীতে বিভ্রান্ত হয়ে তার মধ্যে পড়ে থাকা, কোন বিশেষ অভিব্যক্তির জন্য প্রচন্ড আকুল হওয়া ইত্যাদি। একজন সাধক হিসাবে, সেটা যাই হোক না কেন, তার পেছনে তোমার ছোটাটা সঠিক নয়, এসব জিনিসকে দূর করা আবশ্যক। তাও মতে বলে অনস্তিত্বের কথা, বুদ্ধমতে বলে শূন্যতার কথা এবং শূন্যতার দরজা দিয়ে প্রবেশ করার কথা, সবশেষে আমাদের শূন্যতা এবং অনস্তিত্বতা প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক, সমস্ত রকমের আসক্তি দূর করা আবশ্যক, যা কিছু তুমি দূর করতে পারছ না, সবই দূর করা আবশ্যক। যেমন অলৌকিক ক্ষমতার পেছনে ছোটা, তোমার এটার জন্য প্রয়াস করার অর্থ তুমি একে প্রয়োগ করতে চাও, প্রকৃতপক্ষে সেটা এই বিশ্বের প্রকৃতির বিরুদ্ধে যাওয়া, প্রকৃতপক্ষে এটাও সেই চরিত্রেরই বিষয়। তোমার এসব পেতে চাওয়ার অর্থ তুমি লোকেদের সামনে নিজেকে জাহির করতে চাও

এবং প্রদর্শন করতে চাও। কিন্তু এই ক্ষমতাগুলি প্রদর্শনের দ্বারা লোকেদের দেখানোর জিনিস নয়। যদিও তোমার এগুলোকে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যটা খুবই পবিত্র অর্থাৎ তুমি ভালো কাজ করতে চাও, কিন্তু তুমি যে ভালো কাজটা করবে সেটা হয়তো ভালো কাজ নাও হতে পারে। অতিপ্রাকৃত পদ্ধতির প্রয়োগ করে সাধারণ মানুষের কার্যপ্রণালী সম্পাদন করা সম্ভবত ভালো কাজ নয়। আমাদের ক্লাসে শিক্ষার দ্বারা সত্তর ভাগ লোকের দিব্যচক্ষু খুলে গেছে, আমার এই মন্তব্যটা শুনে কিছু লোক মনে মনে চিন্তা করছে: ''আমি কেন কিছু অনুভব করতে পারছি না?'' যখন তারা ঘরে ফিরে যায় এবং ক্রিয়া করে, তখন তারা মনোযোগটা দিব্যচক্ষুর জায়গায় কেন্দ্রীভূত করতে থাকে, এরকম করতে করতে মাথাব্যথা পর্যন্ত হতে পারে, শেষে তবুও তারা আর কিছুই দেখতে পায় না, এটাই হচ্ছে আসক্তি। প্রত্যেকটা মানুষের শারীরিক প্রকৃতি এবং জন্মগত সংস্কার আলাদা। সেইজন্য সবাই সম্ভবত দিব্যচক্ষু দিয়ে একই সময়ে দেখতে পারবে না এবং প্রত্যেকের দিব্যচক্ষুও একই স্তরে নয়, কিছু লোক হয়তো দেখতে পারবে, আবার কিছু লোক হয়তো দেখতে পারবে না, এ সবই স্বাভাবিক।

আসক্তিগুলোর জন্য সাধকের গোংগ সামর্থ্যের বিকাশ থেমে যেতে পারে অথবা অনিশ্চিত পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে পারে। এগুলো অনুশীলনকারীকে অসৎ পথেও পরিচালিত করতে পারে যা আরও গুরুতর। বিশেষত নীচু চরিত্রের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী কিছু লোক এগুলোকে মন্দ কার্যে ব্যবহার করে থাকে। যে সব লোকেদের চরিত্র নির্ভরযোগ্য নয় তাদের দ্বারা অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োগে মন্দকার্য সম্পন্ন হওয়ার উদাহরণও আছে। কোন এক জায়গায় কলেজে পড়া একজন ছাত্রের মন নিয়ন্ত্রণ করার অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত হয়েছিল, এই ক্ষমতার প্রয়োগ করে সে নিজের চিন্তার দ্বারা অন্যদের চিন্তা এবং আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করত, সে খারাপ কাজ করার জন্য এটা প্রয়োগ করত। কিছু লোকের ক্রিয়া করার সময়ে তাদের সামনে কিছু দৃশ্যের আবির্ভাব ঘটে, তারা সর্বদা স্পষ্ট দেখতে চেষ্টা করে এবং পুরোটা বোঝার চেষ্টা করে, এটাও একধরনের আসক্তি। কারো কারো ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ অভ্যাস নেশায় পরিণত হয় এবং তারা এটা ছাড়তে পারে না, এটাও একটা আসক্তি। জন্মগত সংস্কার আলাদা হওয়ার জন্য লক্ষ্যটা আলাদা আলাদা হয়, কিছু লোক সবথেকে উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য সাধনা করে, আবার কিছু লোক কেবল কিছু জিনিস পেতে চায় মাত্র। এই শেষোক্ত

মানসিকতার ক্ষেত্রে ব্যক্তির সাধনার লক্ষ্যটা অবশ্যই সীমিত হয়ে যায়। এই ধরনের আসক্তি দূর না করলে, অনুশীলন করলেও গোংগ বৃদ্ধি হবে না। সেইজন্য অনুশীলনকারী সমস্ত পার্থিব লাভকে খুব নিস্পৃহভাবে দেখবে, কোন কিছুর পেছনে ছুটবে না, সে সব কিছুকে স্বাভাবিক ভাবে ঘটতে দেবে, এইভাবে নতুন আসক্তির উদয় হওয়াটাও এড়াতে পারবে। এটা নির্ভর করে অনুশীলনকারীর চরিত্র কেমন তার উপরে। চরিত্রের উন্নতিটা একেবারে গোড়া থেকে না হলে অথবা কোন রকম আসক্তি লালন করলে সাধনায় সাফল্য আসবে না।

6.কর্ম

(1) কর্মের উৎপত্তি

কর্ম হচ্ছে সদ্‌গুণের বিপরীত এক ধরনের কালো বস্তু। বৌদ্ধধর্মে একে বলে ''পাপকর্ম, আর আমরা বলি ''কর্ম।'' সেইজন্য খারাপ কাজ করলে বলা হয় ''কর্ম সৃষ্টি।'' এই জীবনে বা অতীত জীবনগুলিতে ভুল কাজ করার ফলে কর্ম উৎপন্ন হয়, যেমন হত্যা করা, কারোর থেকে জোর করে সুবিধা নেওয়া, ব্যক্তিগত লাভের জন্য কারোর সঙ্গে সংঘর্ষ করা, কারোর সম্বন্ধে তার পেছনে চর্চ্চা করা, কারোর সাথে অমিত্রোচিত আচরণ করা ইত্যাদি, সব কিছুই কর্ম উৎপন্ন করে। এর উপরে কিছু কর্ম পূর্বপুরুষ, পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের থেকে রূপান্তরিত হয়ে আসে। যখন একজন ব্যক্তি আর একজনকে ঘুষি মারে তখন একই সাথে, ব্যক্তি তার সাদা পদার্থ অন্যজনকে ছুঁড়ে দেয়, এবং তার শরীরের খালি হয়ে যাওয়া জায়গাটা কালো পদার্থ দিয়ে প্রতিস্থাপিত হয়ে যায়। হত্যা করা হচ্ছে সবথেকে অশুভ কাজ এবং খারাপ কাজ, যা প্রচুর পরিমাণ কর্ম যোগ করে। লোকেদের রোগ হওয়ার ক্ষেত্রে কর্ম হচ্ছে প্রধান কারণ। অবশ্য এটা সর্বদা এক ধরনের রোগ হিসাবেই প্রকটিত হবে তা নয়, কোন সমস্যাজনিত ব্যাপারের সম্মুখীন হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে, ইত্যাদি। সবই কর্ম দ্বারাই সম্পাদিত হয়। সেইজন্য অনুশীলনকারীরা অবশ্যই কোনও খারাপ কাজ করবে না। প্রত্যেকটা খারাপ আচরণ খারাপ বার্তা সৃষ্টি করে যা তোমার সাধনাকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করে।

কিছু লোক গাছপালার চি সংগ্রহের ব্যাপারটা সমর্থন করে থাকে। ক্রিয়া শেখানোর সময়ে, তারা কীভাবে গাছপালার চি সংগ্রহ করতে হয় সেটাও শিখিয়ে থাকে। কোন্ গাছের চি ভাল, কোন্ গাছের চি-এর রঙ কি রকম, এ সবই তারা খুব উৎসাহের সঙ্গে শিখিয়ে থাকে। আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটা পার্কে কিছু লোক তথাকথিত কোন একটা চিগোংগ পদ্ধতিতে, অনুশীলনের সময়ে মাটিতে গড়াগড়ি দিত, তার পরে উঠে দাঁড়িয়ে পাইন গাছগুলোকে ঘিরে রাখত এবং পাইন গাছের চি সংগ্রহ করত। অর্ধেক বছরের পূর্বেই পাইন গাছের বনটা শুকিয়ে হলুদ হয়ে গেল, এই ধরনের কাজ করলে কর্ম সৃষ্টি হয়, এটাও একরকম প্রাণকে হত্যা করা! দেশের সবুজায়ন রক্ষার দিক দিয়ে অথবা উঁচুস্তরের দিক দিয়ে, যে ভাবেই ব্যাপারটা দেখা হোক না কেন গাছপালার চি সংগ্রহ করাটা ঠিক নয়। এই বিশাল বিশ্ব সীমাহীন, তোমার সংগ্রহ করার জন্য এই চি সর্বত্র লভ্য, তুমি যথেচ্ছভাবে চি সংগ্রহ করতে পার, এই গাছগুলোর ক্ষতি করছ কেন? একজন অনুশীলনকারী হিসাবে কোথায় তোমার করুণাপূর্ণ হৃদয়?

সমস্ত কিছুরই বুদ্ধিমত্তা আছে, আধুনিক বিজ্ঞান ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছে যে, উদ্ভিদের শুধু যে জীবন আছে তা নয়, এর বুদ্ধিমত্তা, চিন্তা, সংবেদনশীলতা এবং এমন কি অতিপ্রাকৃত অনুভবশক্তিও আছে। যখন তোমার দিব্যচক্ষু ফা দৃষ্টিশক্তির স্তরে পৌঁছাবে, তখন আবিষ্কার করবে যে এই পৃথিবীর দৃশ্যাবলি অন্যরকম। তুমি বাইরে বেরোলেই, পাথর, দেওয়াল, এমন কি গাছগুলোও তোমার সাথে কথা বলবে। সমস্ত বস্তুর মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব আছে, যখনই কোন বস্তু সৃষ্টি হয়, তখনই তার মধ্যে একটা জীবন ঢুকে পড়ে। জৈব এবং অজৈব পদার্থের শ্রেণী বিভাজনটা এই পৃথিবীর লোকেরাই করেছে। মন্দিরের লোকেদের ভিক্ষার পাত্র ভেঙ্গে গেলে খুব দুঃখ পায়, কারণ যে মুহূর্তে এটা ভেঙ্গে যায়, তৎক্ষণাৎ এর জীবন সত্তাটা মুক্ত হয়ে যায়, এর জীবন প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হয় না এবং এর কোনও যাবার জায়গা থাকে না। সেইজন্য ওই ব্যক্তি যে তার জীবনটা শেষ করেছে তার প্রতি এক নিদারুণ ঘৃণার উদ্রেক হয়, যত বেশী তার ঘৃণা হবে, তত বেশী ঐ ব্যক্তির কর্ম জমা হতে থাকে। কিছু চিগোংগ শিক্ষক আবার জীবজন্তুও শিকার করে থাকে, এদের করুণাপূর্ণ হৃদয় কোথায় গেল? বুদ্ধ বা তাও মতে এমন আচরণের উল্লেখ নেই, যাতে স্বর্গীয় নিয়ম ভঙ্গ হয়। তাদের এই রকম কাজ করাটা প্রাণী হত্যার মতই ।

কিছু লোক বলে যে তারা অতীতে প্রচুর কর্ম সৃষ্টি করেছে, যেমন মুরগি মারা, মাছ মারা, মাছ ধরা ইত্যাদি। এর অর্থটা কি? সে কি আর সাধনা করতে পারবে না? না, সে রকম নয়। পূর্বে তুমি সেটা পরিণাম না জেনে করেছিলে, সেটা খুব বেশী কর্ম সৃষ্টি করে নি। এখন থেকে আর এইরকম কাজ করবে না, তাহলেই ঠিক আছে। যদি তুমি আবার এই কাজ কর, তাহলে সেটা জেনে বুঝে নিয়ম ভঙ্গ করা, সেটা ঠিক হবে না। আমাদের কিছু অনুশীলনকারীর এই ধরনের কর্ম আছে। আমাদের এই সভায় তোমাদের উপস্থিতির একটা অর্থ এই যে তোমাদের একটা পূর্ব নির্ধারিত সম্পর্ক আছে এবং তোমরা সাধনায় উন্নতি করতে পারবে। মাছি, মশা ঘরের মধ্যে এলে আমরা কি মারব না? এই কাজটা করার ব্যাপারে তোমাদের এখনকার স্তর অনুযায়ী যদি থাপ্পড় দিয়ে মেরেও ফেল তাহলেও ভুল বলে গণ্য হবে না। যদি তাড়িয়ে দিতে না পার তাহলে মারার দরকার হলে থাপ্পড় দিয়ে মারতে পার। কোন কিছুর মরে যাওয়ার সময় হলে, স্বাভাবিকভাবেই সেটা মরে যাবে। যখন শাক্যমুনি জীবিত ছিলেন, উনি একবার স্নান করতে চেয়েছিলেন এবং এক শিষ্যকে স্নান করার বড় গামলাটা পরিষ্কার করতে বললেন। শিষ্য দেখল স্নানের গামলার মধ্যে প্রচুর পোকা আছে। সেইজন্য শিষ্য ফিরে এসে বলল যে সে কি করবে? শাক্যমুনি আবারও বললেন: ‘‘আমি চাই তুমি স্নানের গামলাটা পরিষ্কার কর।’’ শিষ্য বুঝতে পারল, সে স্নানের গামলাটা ধুয়ে পরিষ্কার করল। কিছু বিষয়কে খুব বেশী গুরুত্ব দিয়ে দেখার দরকার নেই, আমরা চাই না তুমি একজন অতি সাবধানী লোক হও। এই জটিল পরিবেশে তুমি যদি প্রতি মুহূর্তে স্নায়ুচাপে পীড়িত থাক এবং ভয়ে ভয়ে থাক এই বুঝি কিছু ভুল করে ফেললাম, তাহলে আমি বলব এটা ঠিক নয়, এটাও এক ধরনের আসক্তি, ভয় পাওয়াটা নিজেই একটা আসক্তি।

আমাদের হৃদয় দয়াময় এবং করুণাপূর্ণ হওয়া উচিৎ, যে কোনও জিনিস করার সময়ে দয়াময় এবং করুণাপূর্ণ হৃদয় বজায় রাখতে পারলে, সহজে কোন সমস্যার উদয় হবে না। যদি নিজের স্বার্থের প্রতি কিছুটা নিস্পৃহভাব রাখ এবং সহানুভূতিশীল হৃদয় কিছুটা বজায় রাখ, তাহলে তুমি যা কিছুই কর না কেন এগুলো তোমাকে সংযত রাখবে, সেজন্য তুমি খারাপ কাজ করতে পারবে না। বিশ্বাস না হয় দেখতে পার, যদি তুমি বিদ্বেষপরায়ণ দৃষ্টিভঙ্গি বজায় রাখ, এবং সবসময়ে লড়াই ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাও, তাহলে তুমি ভালো জিনিসকেও খারাপ জিনিস বানিয়ে ছাড়বে। আমি প্রায়ই দেখি কিছু লোক যখন সঠিক হয় তখন অন্যদের

এগোতে দেয় না, এবং যখন সে সঠিক থাকে তখন সে সেই সুযোগে অন্যদের সাথে দূর্ব্যবহার করে। একই সাথে কোন জিনিসের ক্ষেত্রে মতপার্থক্য থাকলে উস্কানি দিয়ে সংঘাত সৃষ্টি করবে না। কোন কোন সময়ে তুমি কোন জিনিস অপছন্দ করলে সেটা অবধারিতভাবে ভুল নাও হতে পারে। একজন সাধক হিসাবে নিরন্তর তোমার স্তরের উন্নতি হওয়ার সময়ে, তোমার বলা প্রতিটি বাক্যের মধ্যে শক্তি নিহিত থাকবে, তুমি সাধারণ লোকেদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে, তুমি বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলবে না। বিশেষত যখন তুমি কোন সমস্যার সত্যটা এবং সেটার পূর্বনির্ধারিত সম্পর্কটা দেখতে পারছ না, তখন তুমি সহজেই ভুল কাজ করে ফেলতে পার এবং কর্ম সৃষ্টি করতে পার।

(2)কর্ম দূর করা

পৃথিবী ও স্বর্গের মূল নীতিগুলি একই, তুমি অন্যের কাছ থেকে যা ঋণ নিয়েছ তা অবশ্যই শোধ করতে হবে, এমন কি সাধারণ লোক যদি ঋণ নেয়, তাকেও অবশ্যই সেই ঋণ শোধ করতে হয়। পুরো জীবনটাতে তুমি যে সমস্ত দুর্ভোগ এবং সমস্যার সম্মুখীন হও সবই কর্ম থেকে উৎপন্ন হওয়া পরিণাম, তোমাকে সে সবই শোধ করতে হবে। একজন প্রকৃত সাধক হিসাবে তোমার জীবনের পথটা ভবিষ্যতে পাল্টে যাবে, তোমার সাধনার উপযোগী একটা নতুন পথের ব্যবস্থা করা হবে, তোমার মাস্টার তোমার কর্মের কিছুটা অংশ কমিয়ে দেবেন এবং বাকি অংশটা তোমার চরিত্রের উন্নতির জন্য ব্যবহার করবেন। শারীরিক ক্রিয়া এবং চরিত্রের সাধনা করার বিনিময়ে তোমার কর্ম দূর হবে এবং কর্মের হিসাবটা মেটানো হবে। এখন থেকে তোমরা যে সব সমস্যার সম্মুখীন হবে, সেগুলো কখনোই হঠাৎ করে ঘটবে না। সেইজন্য দয়া করে মানসিক ভাবে প্রস্তুত থাকবে। কিছুটা দুঃখদুর্দশা ভোগ করার মাধ্যমে তুমি সব জিনিসই ত্যাগ করতে পারবে, যা সাধারণ মানুষ ত্যাগ করতে পারে না। তুমি অনেক ধরনের সমস্যাজনিত ব্যাপারের সম্মুখীন হবে। সমস্যাগুলি পারিবারিক হতে পারে, সামাজিক বা অন্যান্য নানান দিক থেকে আসতে পারে, অথবা তুমি আকস্মিক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে পার, এমন কি মূলত অন্যের করা ভুলের জন্য অন্যায়ভাবে তোমার উপর দোষারোপ করা হতে পারে ইত্যাদি। অনুশীলনকারীদের অসুখ হওয়া উচিৎ নয়, কিন্তু সে হয়তো হঠাৎ করে একটা মারাত্মক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে, ব্যাধিটা

অত্যন্ত জোরালো ভাবে আসতে পারে এবং সেই শারীরিক অথবা মানসিক কষ্টটা সহ্য করাও খুব কঠিন। পরে হাসপাতালে গেলে পরীক্ষা করেও ব্যাধিটা নির্ণয় করা যায় না, কিন্তু কোন চিকিৎসা ছাড়াই ব্যাধিটা অজান্তে ঠিক হয়ে যায়, বস্তুত এই প্রকারেই তোমার সব ঋণ শোধ হয়ে যায়। হয়তো একদিন কোনও কারণ ছাড়াই তোমার স্ত্রী বা স্বামী তার মেজাজ হারিয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে তোমার সাথে ঝগড়া শুরু করে দেয়, হয়তো খুবই তুচ্ছ একটা ব্যাপার নিয়ে বিরাট মতবিরোধের সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীকালে ক্রোধের কারণ খুঁজতে গিয়ে তোমার স্ত্রী বা স্বামী হতবুদ্ধি বোধ করে। একজন অনুশীলনকারী হিসাবে, তোমার পরিষ্কার থাকা উচিৎ যে কেন এই ধরনের ঘটনার উদ্ভব হচ্ছে, অর্থাৎ তোমার কর্মের হিসাব মেটানোর জন্য ঐ সব জিনিস আসছে। এই সময়ে তুমি নিজেকে অবশ্যই সংযত রাখবে, ঘটনাগুলির সমাধানের সময়ে নিজের চরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখবে, তোমার কর্ম দূর করার ক্ষেত্রে তোমার জীবনসাথীর সাহায্যের জন্য তাকে সমাদর করবে এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

অনেকক্ষণ ধরে বসে ধ্যান করার পরে পায়ে ব্যথা শুরু হয়ে যায়, কখনো কখনো ব্যথাটা অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক হয়ে ওঠে। উঁচুস্তরের দিব্যচক্ষু যুক্ত লোকেরা দেখতে পায় যে অসহ্য যন্ত্রণার সময়ে অনুশীলনকারীর শরীরের ভিতরে এবং বাইরে অবস্থিত কালো বস্তুর একটা বড়ো খন্ড নীচে নেমে এসে দূর হয়ে যাচ্ছে। বসে ধ্যান করার সময়ে যন্ত্রণাটা কিছুক্ষণ পরে পরে হতে থাকে যা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। কিছু লোক বোধশক্তির অধিকারী, তারা পা দুটো খুলে নামিয়ে রাখবেই না, সেক্ষেত্রে কালো পদার্থ দূর হয়ে সাদা পদার্থে রূপান্তরিত হতে থাকে, যা আবার গোংগ-এ রূপান্তরিত হয়। একজন অনুশীলনকারী বসে ধ্যানের মাধ্যমে এবং ক্রিয়া করার মাধ্যমে তার কর্মকে সম্পূর্ণরূপে দূর করতে পারে না, তাকে তার চরিত্রের এবং আলোকপ্রাপ্তির গুণের উন্নতিও ঘটাতে হবে, আর কিছুটা দুঃখদুর্দশা ভোগ করতে হবে। এটা গুরুত্বপূর্ণ যে লোকেদের প্রতি আমাদের সহানুভূতিশীল হতে হবে, আমাদের ফালুন গোংগ-এ করুণাময় হৃদয়ের আবির্ভাব অনেক আগেই হয়ে থাকে, বসে ধ্যান করার সময়ে অনেকের কোন কারণ ছাড়াই চোখের জল পড়তে থাকে, তারা যা কিছু চিন্তা করে, তাতেই মনে দুঃখ অনুভব করে, যার দিকে তাকায় দেখে সেই কষ্ট পাচ্ছে, বস্তুত করুণাপূর্ণ হৃদয়ের উদয় হচ্ছে, তোমার প্রকৃতি এবং তোমার সত্যিকারের আমি এই বিশ্বের প্রকৃতি সত্য-করুণা-সহনশীলতার সঙ্গে যুক্ত হতে শুরু করেছে। যখন তোমার করুণাপূর্ণ হৃদয়ের আবির্ভাব

ঘটবে, সেই সময়ে তুমি সব কিছুই খুব সহানুভূতির সঙ্গে করবে। তোমার হৃদয়ের ভিতর থেকে বাইরের চেহারা পর্যন্ত তোমাকে দেখে প্রত্যেকরই খুব সহানুভূতিশীল মনে হবে, তখন কেউই তোমার সাথে দুর্ব্যবহার করবে না। সেই সময়ে যদি কেউ সত্যিই তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করে, তখন তোমার মহান করুণাময় হৃদয় সক্রিয় হবে, এবং সে যা করছে তুমি তার প্রত্যুত্তর করবে না। এটা একধরনের ক্ষমতা যা তোমাকে অন্য সাধারণ মানুষের থেকে আলাদা করে।

তুমি যখন বিরাট বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে তখন করুণাপূর্ণ হৃদয় এই বাধাটা অতিক্রম করতে সাহায্য করবে, একই সাথে আমার ফা-শরীর তোমার দিকে লক্ষ্য রাখবে এবং তোমার জীবনকে রক্ষা করবে, কিন্তু তোমাকে অবশ্যই চরম দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমি তাইয়ুয়ান শহরে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম, তখন এক বয়স্ক দম্পতি রাস্তা পার হচ্ছিল, যখন তারা রাস্তার মাঝামাঝি এসেছে, সেই সময়ে একটা ছোট গাড়ি খুব দ্রুত আসছিল, গাড়িটা মহিলাকে ধাক্কা মেরে তাকে দশ মিটারেরও বেশী টেনে নিয়ে গেল, তারপরে রাস্তার মাঝে ফেলে দিল, এরও পরে গাড়িটা আরও কুড়ি মিটারের বেশী গিয়ে তবে থামতে পারল। গাড়ির চালক গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে কিছু রূঢ় কথা বলল, গাড়ির ভিতরে বসা অন্য সব আরোহীগণও অভদ্র কথা বলল। বয়স্ক মহিলা কিছুই বলল না, আমি কি বলেছিলাম সেটা সে স্মরণ করল, সে উঠে দাড়িয়ে বলল: ‘‘সব কিছু ঠিক আছে, আমার চোট লাগে নি।’’ তারপর সে স্বামীকে নিয়ে একসাথে সভাকক্ষে চলে গেল। সে যদি সেই মুহূর্তে বলত: ‘‘ওঃ! আমার এখানে লেগেছে, ওখানে লেগেছে, তোমরা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চল।’’ তাহলে ব্যাপারটা সত্যিই খারাপ ঘটত, কিন্তু সে এইরকম করে নি। বয়স্ক মহিলা আমাকে বলেছিল: ‘‘মাস্টার, আমি জানি ব্যাপারটা কেন হল, এসব আমার কর্ম দূর করতে সাহায্য করল! একটা ভয়ঙ্কর বিপদ কেটে গেল এবং কর্মের একটা বড়ো খন্ড দূর হল।’’ তোমরা কল্পনা করতে পার যে তার চরিত্র এবং আলোকপ্রাপ্তির গুণ খুবই উন্নত ছিল। তার এত বেশী বয়স, গাড়িটা অত জোরে আসছিল এবং গাড়িটা তাকে অতটা দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে জোরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল, তবুও সে অত্যন্ত সৎ মানসিকতা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল।

কোন কোন সময়ে বিপদ যখন আসে সেটা দেখতে ভীষণ ভয়ঙ্কর লাগে, যে ভাবেই চিন্তা কর না কেন একেবারেই পথ পাওয়া যায় না।

হয়তো ব্যাপারটা তোমাকে কয়েকদিন ঘিরে থাকে, হঠাৎ-ই একটা রাস্তা বের হয় এবং হঠাৎ করে জিনিসগুলো বিরাটভাবে অন্যদিকে মোড় নিয়ে ঘটতে থাকে, প্রকৃতপক্ষে আমরা যখনই চরিত্রের উন্নতি ঘটাতে পারব, তখনই সমস্যাগুলো স্বাভাবিকভাবেই দূর হয়ে যাবে।

তোমার মানসিক গঠনের উন্নতি করতে হলে তোমাকে অবশ্যই এই পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের দুর্ভোগজনিত পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তোমার চরিত্র সত্যি সত্যি উন্নত হবে, দৃঢ় হবে, কর্মও দূর হবে, তোমার দুর্ভোগও কেটে যাবে এবং গোংগও বৃদ্ধি পাবে। যদি চরিত্রের পরীক্ষায় তুমি চরিত্রকে রক্ষা করতে না পার এবং ভুল কাজ কর তাহলে হতাশ হবে না, তুমি এই শিক্ষা থেকে যা শিখেছ সেটা উদ্যমের সাথে একত্রিত কর, খুঁজে বার কর কোথায় তোমার ঘাটতি আছে, এবং সত্য-করুণা-সহনশীলতার সাধনায় প্রয়াসী হও। তোমার চরিত্র পরীক্ষা করার জন্য একটা কঠিন সমস্যা হয়তো একটু পরেই আসতে পারে। তোমার গোংগ সামর্থ্য বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তোমার চরিত্র পরীক্ষা করার জন্য পরবর্তী যে দুর্ভোগ আসবে সেটা সম্ভবত আরও প্রবলতর হবে এবং আরও অকস্মাৎ হবে। প্রত্যেকটা বাধা অতিক্রম করার পরে তোমার গোংগ সামর্থ্যও বৃদ্ধি পেয়ে একটু একটু করে উঁচু হতে থাকবে; বাধা না পেরোতে পারলে গোংগ থেমে থাকবে। ছোট পরীক্ষায় অল্প বৃদ্ধি হবে এবং বড়ো পরীক্ষায় বেশী বৃদ্ধি হবে। আমি আশা করি প্রত্যেক অনুশীলনকারী বিরাট দুর্ভোগ সহ্য করার জন্য প্রস্তুত আছ এবং এই প্রচন্ড কষ্ট বরণ করার মতো সংকল্প ও ইচ্ছাশক্তি তোমাদের আছে। কোন প্রচেষ্টা ব্যয় না করলে সত্যিকারের গোংগ পাবে না। কোন প্রচেষ্টা ব্যয় না করে এবং কষ্ট সহ্য না করে, আরামে গোংগ প্রাপ্ত হবে এই রকম কোনও তত্ত্ব হয় না। তোমার চরিত্র যদি মূলগতভাবে পরিবর্তিত হয়ে ভালো না হয় এবং তুমি এখনও যদি ব্যক্তিগত আসক্তিগুলোকে লালন করতে থাক, তাহলে তুমি কখনোই সাধনার মাধ্যমে মহান আলোকপ্রাপ্ত সত্তা হতে পারবে না।

7. আসুরিক বাধা

আসুরিক বাধা বলতে সেই সব অভিব্যক্তি বা দৃশ্যাবলিকে বোঝায় যেগুলো সাধনার প্রক্রিয়ার সময়ে আবির্ভূত হয় এবং ব্যক্তির অনুশীলনে ব্যাঘাত

সৃষ্টি করে, এদের লক্ষ্য অনুশীলনকারীর উঁচুস্তরের সাধনায় বিঘ্ন সৃষ্টি করা, অন্যভাবে বলা যায় অসুররা ঋণগুলো আদায় করতে এসেছে।

সাধনা উঁচুস্তরে পৌঁছে গেলে আসুরিক বাধার প্রসঙ্গটা অবশ্যই সামনে আসবে। এটা অসম্ভব যে একজন ব্যক্তি তার সারা জীবনে এবং তার পূর্বপুরুষেরা তাদের জীবনগুলোতে কোন খারাপ কাজ করে নি, ওই খারাপ কাজগুলোকেই বলে কর্ম। একজন ব্যক্তি কতটা কর্ম বয়ে বেড়াচ্ছে সেটা দিয়েই তার জন্মগত সংস্কার ভালো কি মন্দ নির্ধারিত হয়ে থাকে। এমন কি একজন ব্যক্তি খুব ভালো হলেও এটা অসম্ভব যে সে কর্ম থেকে মুক্ত। যেহেতু তুমি সাধনা কর নি, সেইজন্য তুমি এটা অনুভব করতে পারবে না। যদি তুমি কেবল রোগ নিরাময় করা এবং শরীর সুস্থ রাখার জন্য অনুশীলন কর তাহলে অসুরেরা তোমাকে নিয়ে চিন্তা করবে না। কিন্তু একবার তুমি উঁচুস্তরে সাধনা শুরু করলেই তারা তোমার সাথে ঝামেলা শুরু করে দেবে। নানান ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করে তারা তোমাকে বাধা দেবে, উদ্দেশ্য হচ্ছে তুমি যেন উঁচুস্তরে সাধনা করতে না পার এবং তুমি যেন সাধনায় সফল হতে না পার। আসুরিক বাধাগুলো বিভিন্ন ধরনের রূপ নিয়ে উদয় হতে পারে। অনেকগুলো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে প্রকটিত হতে পারে; অনেকক্ষেত্রে এরা অন্য মাত্রা থেকে বার্তার আকারে এসে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, যখনই তুমি ধ্যানে বসবে তখনই তারা কিছু জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করে তোমাকে বাধা দেবে, যাতে তুমি শান্ত অবস্থায় প্রবেশ করতে না পার, তোমার পক্ষে উচ্চস্তরের সাধনা করা অসম্ভব করে দেয়। কোন কোন সময়ে যখনই তুমি ধ্যানে বসবে তোমার মধ্যে ঘুমের ভাব আসবে অথবা বিভিন্ন ধরনের চিন্তা তোমার মনের ভিতর দিয়ে বইতে থাকবে এবং তুমি সাধনার স্থিতিতে প্রবেশ করতে পারবে না। আবার কিছু ক্ষেত্রে তুমি অনুশীলন শুরু করলেই, তৎক্ষণাৎ পায়ে চলার শব্দ, দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ, গাড়ির হর্ন, টেলিফোনের ঘন্টা এবং বিভিন্ন ধরনের বিঘ্নের দ্বারা শান্ত পরিবেশটা কোলাহলে পূর্ণ হয়ে ওঠে, তোমাকে আর শান্ত হতে দেবে না।

আর এক ধরনের আসুরিক বাধা আছে যাকে বলে কাম প্রবৃত্তি, যখন অনুশীলনকারী বসে ধ্যান করছে সেই সময়ে অথবা স্বপ্নের মধ্যে, তার সামনে একজন সুন্দরী মহিলা অথবা সুদর্শন পুরুষের আবির্ভাব হয়। সে তোমাকে উত্তেজনাপূর্ণ ভাব ভঙ্গির দ্বারা আকর্ষণ করবে এবং প্রলুব্ধ করবে, যা তোমার কামপ্রবৃত্তির প্রতি আসক্তিটা জাগিয়ে তুলবে। তুমি যদি প্রথম

বারে এটা অতিক্রম করতে না পার তাহলে এটা ধীরে ধীরে তীব্র হতে থাকবে এবং তোমাকে প্রলুব্ধ করতেই থাকবে, যতক্ষণ না তুমি এই উঁচু স্তরে সাধনা করার মানসিকতা পরিত্যাগ না কর। এই বাধাটা অতিক্রম করা খুবই কঠিন, বেশ কিছু অনুশীলনকারী এই কারণেই সাধনায় ব্যর্থ হয়েছে। আমি আশা করব তোমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবে। যদি কেউ যথাযথভাবে চরিত্রকে রক্ষা না কর এবং প্রথমবারে ব্যর্থ হও, তাহলে তাকে অবশ্যই গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে এর থেকে সত্যিকারের শিক্ষাটা গ্রহণ করতে হবে। যতক্ষণ তুমি তোমার চরিত্রটাকে সঠিকভাবে রক্ষা করতে না পারছ এবং এই আসক্তিটাকে সম্পূর্ণরূপে উপড়ে ফেলতে না পারছ, এটা তোমাকে বার বার এসে বিব্রত করবে। এটা একটা বিরাট বাধা, এটাকে অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে, তা না হলে তুমি তাও প্রাপ্ত হতে পারবে না এবং সাধনায় সফল হতে পারবে না।

আর এক প্রকারের আসুরিক বাধা অনুশীলনের সময়ে এবং ঘুমানোর সময়ে স্বপ্নের মধ্যে আসতে পারে, হঠাৎ করে কিছু ভয়ানক চেহারা দেখা যেতে পারে যেগুলো খুবই কদাকার এবং জীবন্ত, এদের মধ্যে কেউ হয়তো ছুরি হাতে নিয়ে মেরে ফেলতে চায়, কিন্তু এরা শুধু লোককে ভয় দেখাতেই পারে, সত্যি সত্যি ছুরিবিদ্ধ করতে পারে না, কারণ মাস্টার ইতিমধ্যে অনুশীলনকারীর শরীরের বাইরে একটা সুরক্ষার আবরণ স্থাপন করে দিয়েছেন যাতে কোন আঘাত করতে না পারে। এদের লোককে ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যটা হচ্ছে সে যাতে সাধনা না করতে পারে। এসব জিনিস সাধনার একটা স্তরে এবং একটা পর্বে প্রকটিত হয় এবং খুব তাড়াতাড়িই কেটে যায়-----কয়েকদিন, এক সপ্তাহ, হয়তো কয়েক সপ্তাহের মধ্যে। এসবই নির্ভর করে, তোমার চরিত্র কতটা উঁচুতে, এবং কীভাবে তুমি ব্যাপারটার মোকাবিলা করো, এগুলোর উপরে।

৪. জন্মগত সংস্কার এবং আলোকপ্রাপ্তির গুণ

‘‘জন্মগত সংস্কার’’ ইঙ্গিত করে সাদা পদার্থকে, যা ব্যক্তি জন্মের সময়ে নিজের সাথে নিয়ে আসে অর্থাৎ এটা হচ্ছে সদ্‌গুণ, এক ধরনের সাকার পদার্থ। যত বেশী এই পদার্থ সঙ্গে নিয়ে আসতে পারবে, জন্মগত সংস্কারও তত বেশী ভালো হবে। ভালো জন্মগত সংস্কারযুক্ত ব্যক্তি সহজেই নিজের সত্যে ফিরতে পারবে এবং আলোকপ্রাপ্ত হতে পারবে, কারণ তার চিন্তাটা

বাধাহীন। একবার চিগোংগ অথবা সাধনাজনিত কোন কিছু শেখার কথা শুনলেই তাদের মধ্যে উৎসাহের সৃষ্টি হয়, তাদের এটা শিখতে ইচ্ছা হয় এবং তারা এই বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। ঠিক এইরকম লাও জি বলেছিলেন: ''যখন উচ্চতম শ্রেণীর লোকেরা তাও-এর কথা শোনে তারা সেটা অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুশীলন করে, যখন মধ্যম শ্রেণীর লোকেরা তাও এর কথা শোনে, কখনো অনুশীলন করে, আবার কখনো অনুশীলন করে না, যখন নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা তাও-এর কথা শোনে, তারা জোরে হাসবে, যদি জোরে না হাসে তাহলে এটা তাও নয়।'' যে সমস্ত লোকেরা সহজেই সত্যে ফিরতে পারে এবং আলোকপ্রাপ্ত হতে পারে তারা উচ্চতম শ্রেণীর অন্তর্গত। এর বিপরীতে যাদের কালো পদার্থ বেশী থাকে এবং জন্মগত সংস্কার নীচু, তাদের শরীরের বাইরে একটা পর্দার মতো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, যার ফলে তাদের পক্ষে ভালো জিনিস গ্রহণ করা অসম্ভব হয়ে যায়। যদি সে ভালো জিনিসের সংস্পর্শে আসেও, তবুও এই কালো পদার্থের প্ররোচনায় সে এগুলিকে অবিশ্বাস করে, প্রকৃতপক্ষে এটা কর্মেরই প্রভাব।

জন্মগত সংস্কার-এর বিষয়ে আলোচনার সময়ে আলোকপ্রাপ্তির গুণের বিষয়কেও অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ, আমরা যখন ''আলোকপ্রাপ্তি'' সম্বন্ধে বলি, কিছু লোক ভাবে আলোকপ্রাপ্তির অর্থ চতুর হওয়া। সাধারণ লোকেদের উল্লেখিত চতুর অথবা ধুরন্ধর লোকেরা আমাদের উল্লেখিত সাধনার থেকে বাস্তবে অনেক দূরে। এই ধরনের লোকেদের আলোকপ্রাপ্তি হওয়া সাধারণত সহজ নয়, তারা কেবল ব্যবহারিক এবং বস্তুগত পৃথিবীর সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাদের থেকে কেউ সুযোগ নিতে পারবে না এবং তারা কাউকে কোন সুবিধাও ছাড়বে না। বিশেষত কিছু লোক আছে যারা নিজেদের খুব বুদ্ধিমান, শিক্ষিত এবং বিচক্ষণ ভাবে এবং সাধনাকে রূপকথার গল্পের মতো মনে করে। শারীরিক ক্রিয়া করা এবং চরিত্রের সাধনা করা তাদের কাছে অবিশ্বাস্য বোধ হয়, তারা মনে করে অনুশীলনকারীরা সব মূর্খ এবং অন্ধবিশ্বাসী। আমরা যে আলোকপ্রাপ্তির কথা বলে থাকি সেটা মানুষের চতুর হওয়াকে ইঙ্গিত করে না, বরঞ্চ মানুষের প্রকৃতিকে তার আসল প্রকৃতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া, একজন ভালো মানুষ হওয়া, এবং এই বিশ্বের প্রকৃতির অনুরূপ হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে। জন্মগত সংস্কার একজন মানুষের আলোকপ্রাপ্তির গুণ নির্ধারণ করে। যদি কারোর জন্মগত সংস্কার ভালো থাকে তবে তার আলোকপ্রাপ্তির গুণও ভালো হয়। যদিও জন্মগত সংস্কার আলোকপ্রাপ্তির গুণ নির্ধারণ করে, কিন্তু আলোকপ্রাপ্তির গুণ সম্পূর্ণরূপে জন্মগত সংস্কারের

দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। জন্মগত সংস্কার যত ভালই হোক না কেন, উপলব্ধি কম হলে অথবা বোধশক্তি না থাকলে, ব্যাপারটা ঠিক হবে না। একজন ব্যক্তির জন্মগত সংস্কার খুব ভালো নয়, কিন্তু আলোকপ্রাপ্তির গুণ ভাল, তাহলে সে উঁচুস্তরে সাধনা করতে পারবে। যেহেতু আমরা সমস্ত প্রাণসত্তার মুক্তি প্রদান করি, আমরা আলোকপ্রাপ্তির গুণই দেখি, জন্মগত সংস্কার দেখি না। যদিও তুমি অনেক খারাপ জিনিস সঙ্গে নিয়ে এসেছ, স্থির সংকল্প থাকলে উঁচু স্তরে সাধনা করতে পারবে, তোমার এই চিন্তাটাই হচ্ছে সত্যিকারের সৎচিন্তা। এই চিন্তার সাথে সাথে তোমাকে শুধু অন্যদের তুলনায় একটু বেশী ত্যাগ করতে হবে এবং শেষে তুমি সাধনায় সফল হতে পারবে।

অনুশীলনকারীর শরীরটা ইতিমধ্যেই শোধন করা হয়েছে, এই শরীরে গোংগ বিকশিত হওয়ার পরে রোগ আর দানা বাঁধতে পারবে না। কারণ শরীরের ভিতরে অবস্থিত উচ্চশক্তিসম্পন্ন পদার্থ আর কালো বস্তুকে থাকতে দেবে না। কিন্তু কিছু লোক এটা বিশ্বাস করতেই চায় না, সবসময়ে নিজেকে অসুস্থ ভাবে, তারা অভিযোগ করে: ‘‘আমার এত অস্বস্তি হচ্ছে কেন?’’ আমরা বলব যে তুমি যা প্রাপ্ত হয়েছ, সেটা গোংগ, এত ভালো জিনিস পেয়েছ তোমার কি অস্বস্তি হবে না? সাধনার সময়ে কিছু পাওয়ার জন্য তার বিনিময়ে কিছু ত্যাগ করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সমস্ত অস্বস্তিগুলো শরীরের উপরের স্তরেই থাকে, তোমার শরীরের উপরে এগুলোর সামান্যতম প্রভাবও নেই, তাদের দেখে অসুস্থ মনে হবে কিন্তু নিশ্চিতভাবে এটা অসুস্থতা নয়, এ সবই নির্ভর করে তোমার নিজস্ব উপলব্ধির উপরে। একজন অনুশীলনকারীকে কেবল দুর্ভোগের পর দুর্ভোগ সহ্য করে গেলেই হবে না, তার মধ্যে ভালো আলোকপ্রাপ্তির গুণও থাকা প্রয়োজন। কিছু লোক এমনও আছে যারা সমস্যার সম্মুখীন হলে সেটাকে বোঝারও চেষ্টা করে না। আমি এখানে উঁচুস্তরে শিক্ষা প্রদান করছি এবং কীভাবে উঁচুস্তরের আদর্শ অনুযায়ী নিজেকে বিচার করবে, সে সব শেখাচ্ছি, অথচ তারা নিজেদের সাধারণ মানুষের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছে। এমন কি তারা নিজেদের সত্যিকারের অনুশীলনকারীর অবস্থায় নিয়ে এসেও সাধনা করতে পারছে না, তারা বিশ্বাসই করতে পারে না যে তারা উঁচু স্তরে পৌঁছাতে পারবে।

উঁচুস্তরে উপলব্ধির কথা বললে সেটা ইঙ্গিত করে আলোকপ্রাপ্তি লাভ হওয়াকে। একে দুটো শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, আকস্মিক এবং

পর্যায়ক্রমিক আলোকপ্রাপ্তি। আকস্মিক আলোকপ্রাপ্তিতে সমগ্র সাধনা প্রক্রিয়াটা তালাবন্ধ পন্থায় নিস্পন্ন হওয়াকে ইঙ্গিত করে। সম্পূর্ণ সাধনা প্রক্রিয়াটা শেষ করার পরে এবং চরিত্রের উন্নতিসাধনের পরে, তোমার সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতাগুলো অন্তিম লগ্নে একবারে উন্মোচিত হয়ে যাবে, দিব্যচক্ষু তৎক্ষণাৎ উচ্চতম স্তরে খুলে যাবে, তোমার মন অন্য মাত্রার উচ্চস্তরের সত্তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে তুমি এই সমগ্র বিশ্বের প্রতিটি মাত্রা এবং প্রতিটি একক স্বর্গের সত্যটা দেখতে পারবে এবং তুমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারবে। তুমি তখন তোমার বিরাট অলৌকিক ক্ষমতাগুলিকে ব্যবহার করতে পারবে। আকস্মিক আলোকপ্রাপ্তির পথে এগোনোটাই সবথেকে কঠিন। সমগ্র ইতিহাসে যাদের জন্মগত সংস্কার খুব উন্নত, কেবল সেই সব লোকেদেরই এতে শিষ্য করা হতো এবং এই পদ্ধতিটা একান্তে একজনের মাধ্যমেই হস্তান্তর করা হতো, একজন সাধারণ মানুষ এটা সহ্য করতেই পারবে না! আমি এই আকস্মিক আলোকপ্রাপ্তির পথটাই গ্রহণ করেছিলাম।

এখন আমি তোমাদের যে শিক্ষা প্রদান করব, সেটা পর্যায়ক্রমিক আলোকপ্রাপ্তির পথের অন্তর্গত। এই সাধনা প্রক্রিয়ার সময়ে অলৌকিক ক্ষমতাগুলির যে যে সময়ে বিকশিত হওয়া উচিৎ, সেই সেই সময়েই বিকশিত হবে। কিন্তু এটা অবধারিত নয় যে তুমি এই বিকশিত হওয়া অলৌকিক ক্ষমতাগুলিকে ব্যবহার করতে পারবেই। যখন তোমার চরিত্র একটা বিশেষ স্তরে পৌঁছাতে পারছে না, তখন তুমি নিজেকে সংযত রাখতে পারবে না এবং সহজেই ভুল কাজ করে ফেলবে। আপাতত এই অলৌকিক ক্ষমতাগুলিকে ব্যবহার করতে পারবে না, তবে সবশেষে তুমি এগুলোকে ব্যবহার করতে পারবে। সাধনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তোমার স্তর উন্নত হলে, আস্তে আস্তে এই বিশ্বের সত্যটা জানতে পারবে, ঠিক আকস্মিক আলোকপ্রাপ্তির মতো, শেষ পর্যন্ত সাধনায় সম্পূর্ণতা অর্জন করবে। এই পর্যায়ক্রমিক আলোকপ্রাপ্তির পথটা অপেক্ষাকৃত সহজতর এবং বিপদও নেই। এখানে কঠিন ব্যাপারটা হচ্ছে, তুমি সমগ্র সাধনার পর্বটা দেখতে পারবে, সেইজন্য আবশ্যিক শর্তগুলি পালনের জন্য তুমি নিজের প্রতি আরও কঠোর হবে।

9. পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ মন

কিছু লোক চিগোংগ-এর ক্রিয়া করার সময়ে মনকে শান্ত করতে পারে না এবং তারা কোন উপায়-এর খোঁজ করে। কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল: ‘‘মাস্টার, চিগোংগ-এর ক্রিয়া করার সময় কেন আমার মন শান্ত করতে পারি না? আপনি আমাকে কোন উপায় বলুন অথবা কোনও কৌশল শিখিয়ে দিন যার দ্বারা আমি বসে ধ্যান করার সময়ে মনকে শান্ত করতে পারি।’’ আমার বক্তব্য হচ্ছে, তুমি কীভাবে মনকে শান্ত করবে? এমন কি একজন দেবতা এসে তোমাকে কোন উপায় শেখালেও, তুমি মনকে শান্ত করতে পারবে না। কেন? কারণ তোমার নিজের মন পরিষ্কার নয় ও বিশুদ্ধ নয়। এই সমাজে জীবন যাপন করার জন্য অনেক রকম আবেগ ও বাসনা, বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত স্বার্থ, তোমার নিজের, এমন কি তোমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের ব্যাপার, এসবই তোমার মনের খুব বিরাট অংশ জুড়ে আছে এবং অত্যধিক গুরুত্ব দাবি করে। অতএব বসে ধ্যান করার সময়ে তোমার মনে শান্ত অবস্থা কি করে আসবে? যদি তুমি কোন কিছু ইচ্ছাকৃতভাবে চেপে রাখ, সেটা পরে নিজে থেকেই বাইরে বেরিয়ে আসবে।

বৌদ্ধধর্মের সাধনায় অনুশাসন, সমাধি এবং প্রজ্ঞা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। অনুশাসন হচ্ছে তোমার যে সব জিনিসে আসক্তি আছে সেগুলোকে ত্যাগ করা। কেউ কেউ বুদ্ধের নাম জপ করাকে অবলম্বন করে যেখানে একাগ্রভাবে নাম জপ করে সেই মানসিক অবস্থা অর্জন করা হয় যখন ‘‘একটা চিন্তা হাজার চিন্তাকে প্রতিস্থাপিত করে।’’ কিন্তু এটা এক ধরনের দক্ষতা, এবং এটা শুধু একটা পদ্ধতি মাত্র নয়। তোমার বিশ্বাস না হলে জপ করে দেখতে পার। আমি নিশ্চিত করে বলছি, যখনই তুমি মুখে বুদ্ধের নাম জপ করতে থাকবে, তখনই মনের মধ্যে অন্য সব জিনিস উঠতে থাকবে। সর্বপ্রথম তিব্বতের লামারা শিখিয়েছিলেন যে বুদ্ধের নাম দিনে কয়েক লক্ষ বার জপ করে এইভাবে এক সপ্তাহ জপ করবে। এই রকম জপ করতে থাকবে যতক্ষণ না মাথাটা ঝিম ঝিম করতে থাকে, এবং শেষে মনের মধ্যে কোন কিছুই আর থাকবে না। একটা চিন্তা অন্য সব কিছুর স্থান নিয়ে নেবে। এটা এক ধরনের পারদর্শীতা, তুমি হয়তো এটা সম্পাদন নাও করতে পার। আরও কিছু অনুশীলন পদ্ধতি আছে যারা শেখায় কীভাবে দ্যান ক্ষেত্রে মনকে নিবিষ্ট করা যায়, কীভাবে গণনা করতে হয়, কীভাবে কোন বস্তুতে চোখের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয় ইত্যাদি।

বস্তুত ওই সব পদ্ধতিগুলোর কোনওটাই তোমার মনকে নিশ্চিতভাবে শান্ত করতে পারবে না। অনুশীলনকারীকে একটা পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ মন প্রাপ্ত করতে হবে, তাকে ব্যক্তিগত স্বার্থগুলোকে বিদায় করতে হবে, লোভের আসক্তি দূর করতে হবে।

কোনও ব্যক্তি মনের শান্ত অবস্থায় এবং স্থির অবস্থায় প্রবেশ করতে পারবে কি পারবে না, সেটা প্রকৃতপক্ষে তার দক্ষতা এবং স্তরের উচ্চতার প্রতিফলন। একবার বসা মাত্রই মনকে শান্ত করতে পারাটা একটা উঁচুস্তরের লক্ষণ। আপাতত মনকে শান্ত করতে না পারলেও সেটা কোন ব্যাপার নয়, তুমি সাধনা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ধীরে ধীরে এটা সম্পাদন করতে পারবে। তোমার চরিত্র ধীরে ধীরে উন্নত হতে থাকবে এবং তোমার গোংগও আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে। ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং ইচ্ছাগুলোর প্রতি নিস্পৃহ ভাব না রাখতে পারলে, তোমার গোংগের বিকাশ হবেই না।

এটা আবশ্যক যে অনুশীলনকারী নিজেকে সব সময়ে উচ্চতর আদর্শের মধ্যে ধরে রাখবে। বিভিন্ন ধরনের জটিল সামাজিক ঘটনা, অনেক কুরুচিপূর্ণ এবং অস্বাস্থ্যকর জিনিস, বিভিন্ন ধরনের আবেগ এবং আকাঙ্খা সব সময়ে অনুশীলনকারীকে বাধা দান করছে; টেলিভিশন, সিনেমা এবং সাহিত্যে যে সব জিনিসে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে সেগুলো তোমাকে সাধারণ মানুষদের মধ্যে ক্ষমতাশালী এবং আরও বাস্তববোধসম্পন্ন ব্যক্তি হওয়ার জন্য পরিচালিত করে। তুমি যদি ওই সব জিনিসের বাইরে না বের হতে পার তাহলে তুমি একজন সাধকের চরিত্র এবং মানসিক অবস্থার থেকে আরও দূরে সরে যাবে, সেইজন্য তোমার গোংগপ্রাপ্তিও আরও কম হবে। একজন অনুশীলনকারীর এসব কুরুচিপূর্ণ এবং অস্বাস্থ্যকর জিনিসের সংস্পর্শ, কম রাখা উচিৎ অথবা একেবারেই রাখা উচিৎ নয়। এই সব ব্যাপারে তাদের চোখ কান বন্ধ রাখা উচিৎ, অন্য লোক বা জিনিসের দ্বারা তুমি প্রভাবিত হবে না। আমি প্রায়ই বলি যে সাধারণ মানুষের মন আমাকে বিচলিত করতে পারে না। কেউ আমার প্রশংসা করলে, আমি খুশী হই না; আবার কেউ গালমন্দ করলেও আমি ক্রুদ্ধ হই না। সাধারণ লোকেদের মধ্যে চরিত্র-জনিত বিশৃঙ্খলা যত গুরুতরই হোক না কেন, আমি প্রভাবিত হই না। একজন অনুশীলনকারীর উচিৎ সমস্ত ব্যক্তিগত লাভগুলিকে নিস্পৃহভাবে দেখা এবং কোনরকম গুরুত্ব না দেওয়া। একমাত্র তখনই তোমার আলোকপ্রাপ্তির উদ্দেশ্যকে পরিণত বলে গণ্য করা হবে। তুমি যদি খ্যাতি এবং ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রতি প্রবল আসক্তি না রাখ, এমন

কি এগুলোকে অকিঞ্চিৎকর জিনিস বলে মনে করতে পার, তাহলে তুমি দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না অথবা ক্রুদ্ধও হবে না, মনের সাম্যাবস্থা সর্বদাই বজায় রাখতে পারবে। একবার সবকিছু ছাড়তে পারলে তোমার মন স্বাভাবিক ভাবেই পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

আমি তোমাদের দাফা সম্বন্ধে বলেছি এবং শারীরিক ক্রিয়ার পাঁচটা সেটের সবই শিখিয়েছি, তোমাদের শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করে দিয়েছি, তোমাদের শরীরে ''ফালুন'' এবং ''শক্তির যন্ত্রকৌশল'' স্থাপন করেছি, এছাড়া আমার ফা-শরীরগুলো তোমাদের সুরক্ষা প্রদান করবে। যা কিছু দেওয়া উচিৎ, সবই তোমাদের দিয়েছি। ক্লাসের সময়ে সব কিছু আমার উপরেই নির্ভর করছিল, এখন থেকে তোমাদের উপরে নির্ভর করবে। মাস্টার সাধনার দ্বার দিয়ে সবাইকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু সাধনাটা নির্ভর করছে তোমাদের নিজেদের উপরে। যতই তোমরা প্রত্যেকে পুঙ্খানুপঙ্খরূপে দাফা অধ্যয়ন করবে, মনোযোগী হয়ে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সেটাকে উপলব্ধি করবে, চরিত্রকে প্রতিমুহূর্তে লক্ষ্য রেখে চলবে, নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা করবে, দুর্ভোগের উপর দুর্ভোগ সহ্য করবে এবং অসহনীয় ব্যাপারকেও সহ্য করবে, সেক্ষেত্রে, আমি বিশ্বাস করি, তোমরা সাধনায় নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে।

গোংগ সাধনার পথ আছে মনেরই ভিতরে
সীমাহীন দাফা পেরোতে হবে দুর্ভোগেরই নৌকা বেয়ে।

অধ্যায়-চার

ফালুন গোংগ অনুশীলন পদ্ধতি

ফালুন গোংগ হচ্ছে বুদ্ধমতের এক বিশেষ সাধনা পদ্ধতি, এর অতুলনীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য একে বুদ্ধমতের অন্য বিধিসম্মত সাধনা পদ্ধতিগুলোর থেকে আলাদা করা যায়। ফালুন গোংগ হচ্ছে একটি উন্নত সাধনা পদ্ধতি। অতীতে এটি একটি কঠোর সাধনা পদ্ধতি হিসাবে প্রচলিত ছিল, যেখানে অনুশীলনকারীদের অত্যন্ত উঁচু চরিত্র যুক্ত ব্যক্তি অথবা উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি হওয়া আবশ্যিক ছিল। এই কারণে এই সাধনা পদ্ধতিকে জনপ্রিয় করা কঠিন ছিল। কিন্তু আরও অধিক অনুশীলনকারী যাতে তাদের নিজেদের স্তর উঁচু করতে পারে, তারা যাতে এই সাধনা পদ্ধতি জানতে পারে এবং একই সাথে প্রচুর নিষ্ঠাবান সাধকের প্রয়োজন মেটানোর জন্য জনসাধারণের সাধনার উপযোগী শারীরিক ক্রিয়ার একটা সংগ্রহ সংকলন করেছি। পরিবর্তন করা সত্ত্বেও এই ক্রিয়াগুলি, অন্যান্য সাধারণ সাধনা পদ্ধতিতে শেখানো জিনিস এবং অনুশীলনের স্তরের তুলনায় অনেক বেশী উন্নত।

একজন ফালুন গোংগ অনুশীলনকারী শুধু যে গোংগ সামর্থ্য এবং অলৌকিক ক্ষমতাগুলির বিকাশ দ্রুত ঘটাতে পারে তা নয়, এছাড়া খুব কম সময়ে একটা অতুলনীয় শক্তিশালী ফালুন প্রাপ্ত হয়। একবার তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে, ফালুন সাধারণত অনুশীলনকারীর তলপেটে অবিরাম ঘুরতে থাকে। এটা সারাক্ষণ বিশ্ব থেকে শক্তি সংগ্রহ করে এবং অনুশীলনকারীর মূল শরীরে, গোংগ-এ রূপান্তরিত করে। এইভাবে ‘‘ফা অনুশীলনকারীকে শোধন করছে’’ এই লক্ষ্যটা প্রাপ্ত হয়।

ফালুন গোংগ-এ পাঁচ সেট শারীরিক ক্রিয়া আছে। সেগুলো হচ্ছে: বুদ্ধ সহস্রহস্ত প্রসারণ, ফালুন দন্ডায়মান অবস্থান, বিশ্বের দুই প্রান্তভেদ, ফালুন ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ, এবং ঐশ্বরিক ক্ষমতার শক্তিবৃদ্ধি।

1.বুদ্ধ সহস্রহস্ত প্রসারণ ক্রিয়া (*ফো ঝান চিয়েন শোউ ফা*)

তত্ত্ব:

বুদ্ধ সহস্রহস্ত প্রসারণ ক্রিয়ার সারকথা হচ্ছে, প্রসারণের দ্বারা সমস্ত শক্তিনাড়ীগুলোকে খুলে দেওয়া, এই ক্রিয়া অনুশীলনের মাধ্যমে নতুন শিক্ষার্থীরা তাড়াতাড়ি শক্তি অর্জন করতে পারে, এবং অভিজ্ঞ অনুশীলনকারীরা তাড়াতাড়ি উন্নতি করতে পারে। এই ক্রিয়াতে এটা আবশ্যক যে প্রথমেই সমস্ত শক্তিনাড়ীগুলো খুলে যাবে, যার ফলে, অনুশীলনকারীরা সঙ্গে সঙ্গে খুব উঁচু স্তরে অনুশীলন করতে পারবে। এই ক্রিয়াতে সঞ্চালনগুলো অপেক্ষাকৃত সরল, কারণ মহান তাও সাধনার পথ যেমন সরল তেমন সহজ। সঞ্চালনগুলো যদিও সরল, বৃহদাকারে এগুলো সমগ্র সাধনায় বিকশিত হওয়া জিনিসগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। এই ক্রিয়া অনুশীলনের সময়ে শরীরে গরম অনুভূত হয় এবং অত্যন্ত প্রবল শক্তিক্ষেত্রের এক অনুপম অনুভূতি হতে থাকে। সারা শরীরের সমস্ত শক্তিনাড়ীগুলি প্রসারিত হওয়ার জন্য এবং খুলে যাওয়ার জন্য এইরকম বোধ হয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে যে জায়গায় শক্তিটা অবরুদ্ধ হয়ে আছে সেই সেই জায়গাগুলি খুলে দেওয়া যাতে শক্তিটা নির্বিঘ্নে এবং মসৃণভাবে প্রবাহিত হতে পারে, শক্তিটা শরীরের ভিতরে এবং ত্বকের নীচে গতিশীল হয়ে প্রবলভাবে প্রবাহিত হতে থাকে যাতে বিরাট পরিমাণ শক্তি বিশ্ব থেকে শুষে নেওয়া যায়। একই সাথে এর দ্বারা অনুশীলনকারী খুব দ্রুত একটা অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে, যখন সে চিগোংগ শক্তি ক্ষেত্রের অধিকারী হয়। এই ক্রিয়া ফালুন গোংগ-এর প্রাথমিক ক্রিয়া হিসাবে অনুশীলন করা হয়, এটা সাধারণত প্রথমে করা হয় এবং সাধনাকে মজবুত করার পদ্ধতিগুলোর মধ্যে এটাও একটা পদ্ধতি।

শ্লোক:[49]

শেন শেন হে য়ি[50] **ডংগ জিংগ সুই জি**[51]
ডিংগ তিয়েন দু জুন[52] **চিয়েন শোউ ফো লি**[53]

প্রস্তুতি:

পুরো শরীরটাকে শিথিল কর, কিন্তু খুব বেশী ঢিলা ছেড়ে দিও না। পা দুটো কাঁধের চওড়ার সমান ফাঁক করে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াও। হাঁটু দুটোতে সামান্য ভাঁজ রেখে হাঁটু এবং উরুসন্ধি শিথিল অবস্থায় রাখ। চিবুকটা ভিতরের দিকে সামান্য টেনে রাখ, জিভের ডগা উপরের তালু ছুঁয়ে থাকবে। দাঁতের মধ্যে অল্প ফাঁক রাখ। ঠোঁট বন্ধ রাখ এবং চোখ দুটো হাল্কা করে বন্ধ কর। চেহারায় একটা পবিত্রভাব বজায় রাখ। ক্রিয়া করার সময়ে নিজেকে খুব বিরাট এবং লম্বা বোধ হবে।

দুই হাত একত্রে রাখ (লিয়াংগ শোউ জিয়েয়িন)

তালু উপরের দিকে রেখে দুই হাত ওঠাও, দুটো বুড়ো আঙ্গুলের ডগা একে অপরকে হাল্কা করে ছুঁয়ে থাকবে। এক হাতের বাকি চারটে আঙ্গুল অন্য হাতের বাকি চারটে আঙ্গুলের উপরে এনে একসাথে রাখ, পুরুষদের ক্ষেত্রে বাঁ হাতটা উপরে থাকবে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ডান হাতটা উপরে থাকবে। হাত দুটোকে ডিম্বাকৃতি করে তলপেটের জায়গায় রাখ। দুটো বাহুর উপরের অংশ কিছুটা সামনে রাখ, যেন কনুই দুটো ঝুলতে থাকে এবং বাহুমূল খোলা থাকে(চিত্র 1-1)।

---

[49]শ্লোক - প্রত্যেকটা ক্রিয়ার নির্দিষ্ট শ্লোক আছে যেটা তুমি ক্রিয়ার ঠিক আগে একবার করে চীনাভাষায় জোরে আবৃত্তি করবে অথবা টেপের থেকে শুনবে।

[50]শেন শেন হে য়ি -মন ও শরীর একসঙ্গে যুক্ত কর

[51]ডংগ জিংগ সুই জি-শক্তির যন্ত্রকৌশল অনুযায়ী গতিশীল হও অথবা স্থির হও

[52]ডিংগ তিয়েন দু জুন-স্বর্গের মতো উঁচু এবং অতুলনীয়ভাবে মহান

[53]চিয়েন শোউ ফো লি-সহস্রহস্ত বুদ্ধ সোজা হয়ে দাঁড়ায়

চিত্র 1-1

চিত্র 1-2

মৈত্রেয়[54] তাঁর কোমর প্রসারিত করছে (মি লে শেন ইয়াও)

দুই হাত একত্রে রাখা অবস্থা (জিয়েয়িন) থেকে আরম্ভ কর। একত্রিত হাত দুটো উপরে তোলার সময়ে পা দুটো ধীরে ধীরে সোজা কর। হাত দুটো মুখমন্ডলের সামনে পৌঁছে গেলে, তখন আলাদা কর এবং ধীরে ধীরে দুই হাতের তালুকে উপরের দিকে ওল্টাতে থাক। হাত দুটো মাথার উপরে পৌঁছে গেলে, তালু উপরের দিকে মুখ করে থাকবে এবং দুটো হাতের আঙ্গুলগুলোর ডগাগুলো একে অপরের দিকে মুখ করে থাকবে এবং এদের মধ্যে 20-25cm (8-10 inches) (চিত্র 1-2) দূরত্ব থাকবে। একই

[54]মৈত্রেয় - বৌদ্ধধর্ম অনুযায়ী বুদ্ধ শাক্যমুনির পরে ভবিষ্যতে যে বুদ্ধ পৃথিবীতে মুক্তি প্রদান করার জন্য আসবেন, এটা তাঁরই নাম।

চিত্র 1-3

চিত্র 1-4

সাথে, মাথা উপরের দিকে ঠেলতে থাক এবং পা দুটো দিয়ে নীচে মাটিতে চাপ দিতে থাক, শরীর যথাসাধ্য সোজা রেখে, দুটো তালুর গোড়া দিয়ে উপরের দিকে জোরে ঠেলতে থাক এবং পুরো শরীরটাকে 2-3 সেকেন্ড টান-টান করে রাখ, এবার হঠাৎ করে পুরো শরীরকে শিথিল কর, বিশেষত হাঁটু এবং উরূসন্ধি অবশ্যই শিথিল অবস্থায় ফিরে যাবে।

তথাগত উপর থেকে মাথার ভিতরে শক্তি প্রবাহিত করছে (রু লাই গুয়ান ডিংগ)

উপরের মুদ্রাটা অনুসরণ করে দুটো তালুকে 140^0 বাইরের দিকে একই সাথে ঘোরাও যার ফলে দুটো হাতের কব্জির ভেতরের দিকটা একে অপরের সামনাসামনি থাকে, এবং চিমনির মতো আকৃতি তৈরি হবে। কব্জি দুটোকে সোজা করে নীচে নিয়ে এস (চিত্র 1-3)।

চিত্র 1-5

যখন হাত দুটো বুকের সামনে আসবে, তখন তালু দুটো বুকের দিকে মুখ করে প্রায় 10 cm(4 inches) দূরে থাকবে। এইভাবে হাত দুটো নীচে নামতে নামতে তলপেটে পৌঁছাবে (চিত্র 1-4)।

বুকের সামনে দুই হাত একত্রিত করে চাপ দাও (শুয়াংগ শোউ হেশি)

তলপেটে পৌঁছানোর পরে সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটোকে তুলে নিয়ে বুকের সামনে এনে তালু দুটো একত্রে সামনাসামনি রেখে (নমস্কারের মতো জুড়ে) একে অপরকে চাপ দাও (হেশি)(চিত্র 1-5)। এই হেশি মুদ্রায় দুই হাতের আঙ্গুলগুলো এবং তালুর গোড়াটা একে অপরকে চাপ দেবে এবং তালুর মধ্যের জায়গাটা ফাঁকা রাখবে। কনুই দুটো উপরে তুলে ধরবে যাতে দুটো অগ্রবাহু একটা সরল রেখা তৈরি করে। (হেশি এবং জিয়েয়িন,

চিত্র 1-6

চিত্র 1-7

এই দুটো মুদ্রা ছাড়া বাকি সময়ে হাত দুটো পদ্ম হস্ত মুদ্রায়[55] রাখবে। পরবর্তী ক্রিয়াগুলিতেও একই ব্যাপার হবে।)

দুই হাত স্বর্গ ও মর্ত্য কে নির্দেশিত করছে (জাংগ ঝি চিয়েন কুন)

হেশি মুদ্রা থেকে আরম্ভ কর। একই সাথে দুটো হাত প্রায় 2-3 cm (1 inches) আলাদা কর, তারপরে ঘোরাতে শুরু কর। পুরুষরা বাঁ হাত (মহিলারা -ডান হাত) বুকের দিকে ঘোরাবে এবং অন্য হাত বাইরের দিকে ঘোরাবে যার ফলে বাঁ হাত উপরে এবং ডান হাত নীচে থাকবে। প্রত্যেকটা হাত অগ্রবাহুর সঙ্গে এক রেখায় থাকবে(চিত্র 1-6)।

---

[55] পদ্ম হস্ত মুদ্রা - এই হস্তমুদ্রা সমস্ত ক্রিয়াগুলিতে বজায় রাখবে। এই মুদ্রায় হাতের তালু খোলা থাকবে, ও আঙ্গুলগুলি শিথিল অথচ সোজা অবস্থায় থাকবে। মাঝের আঙ্গুলটা তালুর দিকে সামান্য ভাঁজ হয়ে বেরিয়ে থাকবে।

চিত্র 1-8

চিত্র 1-9

এরপরে তালু নীচের দিকে রেখে বাঁ হাতের অগ্রবাহুকে কোনাকুনিভাবে উপরে এবং বাঁ দিকে ছড়িয়ে দাও যতক্ষণ না বাঁ হাতটা মাথার সমান উচ্চতায় পৌঁছাচ্ছে। ডান হাতটাকে, তালু উপরের দিকে রাখা অবস্থায় তখন পর্যন্ত বুকের সামনেই রাখ, বাঁ হাত ধীরে ধীরে প্রসারিত করার সময়ে পুরো শরীরটাকে ধীরে ধীরে সোজা রেখে টান-টান কর, মাথাটাকে উপরে ঠেল, দুটো পা দিয়ে নীচে চাপ দাও। বাঁ হাতটাকে উপরে বাঁ দিকে কোনাকুনিভাবে রেখে টান-টান কর এবং ডান হাত বুকের সামনে রেখে পশ্চাৎ বাহুকে বাইরের দিকে টান-টান কর (চিত্র 1-7)। প্রায় 2-3 সেকেন্ড এইভাবে টান-টান রাখ, তারপরে পুরো শরীরকে হঠাৎ করে শিথিল কর, বাঁ হাতটাকে আবার বুকের সামনে নিয়ে এস এবং ডান হাতের সঙ্গে একত্রিত করে ''হেশি মুদ্রা'' কর (চিত্র 1-5)।

চিত্র 1-10

এরপর আবার তালু দুটো ঘোরাও, ডান হাত (মহিলাদের ক্ষেত্রে বাঁ হাত) উপরে এবং বাঁ হাত নীচে রাখ (চিত্র 1-8)।

ডান হাত দিয়ে, পূর্বে করা বাঁ হাতের সঞ্চালনগুলির পুনরাবৃত্তি কর; অর্থাৎ ডান হাতের তালুকে নীচের দিকে রেখে, ডান অগ্রবাহুকে কোনাকুনিভাবে উপরের দিকে প্রসারিত কর যতক্ষণ না ডান হাত মাথার সমান উচ্চতায় পৌঁছাচ্ছে। তখন পর্যন্ত বাঁ হাতটাকে, তালু উপরের দিকে মুখ করা অবস্থায় বুকের সামনে রাখ। এই অবস্থায় পুরো শরীরকে টান-টান করার পরে (চিত্র 1-9) হঠাৎ করে শিথিল কর এবং হাত দুটোকে বুকের সামনে নিয়ে এসে একত্রিত করে হেশি মুদ্রা কর (চিত্র 1-5)।

সোনালী বানর তার শরীর দ্বিখণ্ডিত করছে (জিন হাও ফেন শেন)

হেশি মুদ্রা থেকে আরম্ভ কর। বুকের সামনে দুটো হাত আলাদা করে নিয়ে শরীরের দুই দিকে প্রসারিত কর যাতে কাঁধ দুটোর সঙ্গে একটা রেখা তৈরি হয়। ধীরে ধীরে পুরো শরীরটাকে টান-টান কর, মাথাকে উপরের ঠেল, পা

চিত্র 1-11

চিত্র 1-12

দুটো দিয়ে নীচে চাপ দাও, দুটো হাতকে দুই দিকে জোরের সাথে টান-টান কর। শরীরটাকে চার দিকে (চিত্র 1-10) 2-3 সেকেন্ড ধরে জোরে টান-টান করার পরে পুরো শরীরকে হঠাৎ করে শিথিল কর এবং হাত দুটোকে পুনরায় বুকের সামনে একত্রিত করে হেশি মুদ্রা কর (চিত্র 1-5)।

দুটো ড্রাগন সমুদ্রে ঝাঁপ দিচ্ছে (শুয়াংগ লংগ শিয়া হাই)

হেশি মুদ্রা থেকে আরম্ভ কর। দুটো হাত আলাদা কর এবং সামনে নীচের দিকে প্রসারিত কর। দুটো বাহুকে সমান্তরাল এবং সোজা অবস্থায় টান টান করার সময়ে দুটো উরুর সঙ্গে প্রায় 30^0 কোণ তৈরি হবে (চিত্র 1-11)। ধীরে ধীরে পুরো শরীরটাকে টান-টান কর, মাথা উপরের দিকে ঠেল, পা দুটো দিয়ে নীচে চাপ দাও, প্রায় 2-3 সেকেন্ড টান টান করার পরে পুরো শরীরকে হঠাৎ করে শিথিল কর এবং হাত দুটোকে পুনরায় বুকের সামনে একত্রিত করে হেশি মুদ্রা কর।

চিত্র 1-13

বোধিসত্ত্ব পদ্মফুলে হাত রাখছে (পু সা ফু লিয়েন)

হেশি মুদ্রা থেকে দুটো হাত আলাদা কর এবং একই সাথে শরীরের দুই পাশে কোনাকুনিভাবে নীচের দিকে প্রসারিত কর। দুটো বাহুকে শরীরের দুই পাশে সোজা অবস্থায় টান-টান করার সময়ে দুই দিকের উরুর সঙ্গে প্রায় 30^0 কোণ তৈরি হবে (চিত্র 1-12)। ধীরে ধীরে পুরো শরীরটাকে টান-টান কর, হাতের আঙ্গুলগুলোকেও নীচের দিকে জোরের সঙ্গে টান-টান কর। এরপরে পুরো শরীরকে হঠাৎ করে শিথিল কর। হাত দুটোকে পুনরায় বুকের সামনে একত্রিত করে হেশি মুদ্রা কর।

অর্হৎ পিঠে পর্বত বহন করছে (লুয়ো হান বেই শান)

হেশি থেকে আরম্ভ কর, দুটো হাত আলাদা কর এবং শরীরের পেছনের দিকে প্রসারিত কর। একই সাথে তালু দুটো ঘুরিয়ে পেছনের দিকে মুখ করে রাখ। হাত দুটো শরীরের পাশ দিয়ে নিয়ে যাবার সময়ে কব্জিটাকে ধীরে ধীরে মুড়ে দাও এবং হাত দুটো শরীরের পিছনে পৌঁছে গেলে কব্জি এবং শরীরের মধ্যে 45^0কোণ (চিত্র 1-13) তৈরি হবে। পুরো শরীরটাকে

চিত্র 1-14

ধীরে ধীরে প্রসারিত কর। হাত দুটোকে সঠিক জায়গায় রাখার পরে, মাথা উপরে ঠেল, পা দুটো দিয়ে নীচে চাপ দাও, শরীরকে সোজা রাখ। প্রায় 2-3 সেকেন্ড টান-টান রাখার পরে পুরো শরীরকে হঠাৎ করে শিথিল কর, আবার হাত দুটোকে বুকের সামনে নিয়ে এসে হেশি মুদ্রায় ফিরিয়ে আন।

বজ্র পর্বতকে ধাক্কা দিচ্ছে (জিন গাংগ পাই শান)

হেশি থেকে আরম্ভ কর। হাত দুটোকে আলাদা করার পরে, দুটো তালু দিয়ে সামনের দিকে ঠেল এবং সব আঙ্গুলের ডগাগুলোকে উপরের দিকে করে রাখ। বাহু দুটোকে কাঁধের সমান উচ্চতায় রাখ। বাহু দুটোকে প্রসারিত করে সোজা করার পরে, জোরে টান-টান কর, মাথা উপরের দিকে ঠেল এবং পা দুটো দিয়ে নীচে চাপ দাও, শরীরকে যথাসাধ্য সোজা রাখ (চিত্র 1-14)। প্রায় 2-3 সেকেন্ড ধরে টান-টান রাখার পরে পুরো শরীরকে হঠাৎ করে শিথিল কর এবং হাত দুটোকে বুকের সামনে হেশি মুদ্রায় ফিরিয়ে আন।

চিত্র 1-15

চিত্র 1-16

তলপেটের সামনে একটার উপরে আর একটা হাত রাখ (দিয়ে খো শিয়াও ফু)

হেশি থেকে আরম্ভ কর। দুটো হাতকে ধীরে ধীরে নীচে নামাতে থাক, তালু দুটোকে পেটের দিকে মুখ করে রাখার জন্য ঘোরাতে থাক, তলপেটের জায়গায় পৌঁছে গেলে একটা হাতের উপরে আর একটা হাত রাখ। পুরুষদের ক্ষেত্রে বাঁ হাতটা ভেতরের দিকে আর মহিলাদের ক্ষেত্রে ডান হাতটা ভেতরের দিকে রাখবে। একটা হাতের তালু অন্য হাতের পিঠের দিকে মুখ করে থাকবে। দুটো হাতের মধ্যে 3cm(1inches) ফাঁক রাখবে, ভিতরের হাত ও তলপেটের মধ্যে 3cm(1inches) ফাঁক রাখবে। একটা হাতের উপরে আর একটা হাত, সাধারণত 40 থেকে 100 সেকেন্ড রাখবে (চিত্র 1-15)। দুটো হাত একত্রিত করে জিয়েয়িন মুদ্রা (চিত্র 1-16) করে ক্রিয়াটা সমাপ্ত কর।

2.ফালুন দন্ডায়মান অবস্থান ক্রিয়া (*ফালুন ঝুয়াংগ ফা*)

তত্ত্ব:

এটা ফালুন গোংগ-এর ক্রিয়ার দ্বিতীয় সেট, এটা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ক্রিয়া, যার মধ্যে চক্র ধরা অবস্থায় চার রকমের মুদ্রা আছে। এই ক্রিয়াটা অপেক্ষাকৃত ধীরগতিসম্পন্ন এবং প্রত্যেকটা মুদ্রা বেশ লম্বা সময় নিয়ে করার আবশ্যকতা আছে। নতুন অনুশীলনকারীদের বাহু দুটো খুব ভারী বোধ হতে পারে, বেশ ব্যথাও বোধ হতে পারে। যদিও ক্রিয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরো শরীরটা হাল্কা বোধ হতে থাকে এবং কোনওরকম ক্লান্তি বোধ হবে না, যা কায়িক পরিশ্রমের পরে হয়ে থাকে। এই ক্রিয়ার স্থিতিকাল এবং বারংবার অনুশীলনের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারলে, অনুশীলনকারী দুটো বাহুর মধ্যে ঘূর্ণায়মান ফালুন অনুভব করতে পারবে। বারংবার ফালুন দন্ডায়মান অবস্থান ক্রিয়াটা করতে পারলে পুরো শরীরটা সম্পূর্ণভাবে খুলে যাবে এবং গোংগ সামর্থ্যও বৃদ্ধি পাবে। ফালুন দন্ডায়মান অবস্থান এক সর্বাঙ্গীণ সাধনার পদ্ধতি যার দ্বারা প্রজ্ঞা বৃদ্ধি হয়, ব্যক্তির স্তরের উন্নতি হয় এবং ঐশ্বরিক ক্ষমতাগুলি শক্তিশালী হয়। এই ক্রিয়াতে সঞ্চালনগুলি যদিও সরল, কিন্তু এর থেকে অনেক কিছুই প্রাপ্ত করা সম্ভব এবং সব কিছুই এর অন্তর্গত। এই ক্রিয়াতে অনুশীলনের সময়ে সঞ্চালনগুলি স্বাভাবিকভাবে করা অবশ্যক এবং অবশ্যই এই বোধটা রাখবে যে তুমি নিজে এই ক্রিয়াটা করছ। একদম দুলবে না, যদিও অল্প নড়াচড়া স্বাভাবিক। ফালুন গোংগের অন্য ক্রিয়ার মতই এই ক্রিয়াটা শেষ হওয়ার অর্থ এই নয় যে অনুশীলন শেষ হয়ে গেল, কারণ ফালুনের নিরন্তর ঘোরাটা কখনোই থামে না। ক্রিয়ার প্রতিটি সঞ্চালনের স্থিতিকাল এক একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এক একরকম হতে পারে, ক্রিয়া যত বেশী সময় করবে, ততই ভালো হবে।

চিত্র 2-1

শ্লোক:

শেংগ হুই জেংগ লি[56] রংগ শিন চিংগ থি[57]
সি মিয়াও সি য়ু[58] ফা লুন ছু চি[59]

প্রস্তুতি:

পুরো শরীরটাকে শিথিল কর, কিন্তু খুব বেশী ঢিলা ছেড়ে দিও না। পা দুটোকে কাঁধের চওড়ার সমান ফাঁক করে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াও, হাঁটু দুটোয় সামান্য ভাঁজ করে রাখ, হাঁটু এবং উরুসন্ধি শিথিল অবস্থায় রাখ।

---

[56]শেংগ হুই জেংগ লি - প্রজ্ঞার উন্মেষ হচ্ছে এবং ক্ষমতার বৃদ্ধি ঘটছে
[57]রংগ শিন চিংগ থি - হৃদয় সামঞ্জস্যপূর্ণ হচ্ছে এবং শরীর হাল্কা হচ্ছে
[58]সি মিয়াও সি য়ু - ঠিক যেন একটা বিস্ময়কর এবং আলোকপ্রাপ্ত অবস্থা
[59]ফা লুন ছু চি - ফালুনের উদয় আরম্ভ হয়েছে

চিত্র 2-2

চিত্র 2-3

চিবুকটাকে ভিতরের দিকে সামান্য টেনে রাখ, জিভের ডগা উপরের তালু ছুঁয়ে থাকবে, দাঁতের মধ্যে অল্প ফাঁক রাখ। ঠোঁট বন্ধ রাখ এবং চোখ দুটো হাল্কা করে বন্ধ কর, চেহারায় একটা পবিত্র ভাব ফুটিয়ে তোল। হাত দুটোকে একত্রিত করে জিয়েয়িন কর (চিত্র 2-1)।

মাথার সামনে চক্র ধরে রাখ (থোউ চিয়েন বাও লুন)

জিয়েয়িন মুদ্রা থেকে আরম্ভ কর। দুটো হাত তলপেটের থেকে ধীরে ধীরে উপরে ওঠাতে থাক এবং একই সাথে আলাদা করতে থাক। যখন হাত দুটো মাথার সামনে পৌঁছাবে, তালু দুটোকে ভ্রুর সমান উচ্চতায় এনে চেহারার দিকে মুখ করে রাখ। দুটো হাতের আঙ্গুলগুলো প্রায় 15cm(6inches) দূরত্বে পরস্পরের দিকে মুখ করে থাকবে। দুটো বাহু দিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি কর এবং পুরো শরীর শিথিল রাখ (চিত্র 2-2)।

চিত্র 2-4

চিত্র 2-5

পেটের সামনে চক্র ধরে রাখ (ফু চিয়েন বাও লুন)

দুটো হাতকে পূর্বের অবস্থা থেকে নীচের দিকে নামাতে থাক, মুদ্রাটা অপরিবর্তিত রাখ যতক্ষণ না হাত দুটো তলপেটে পৌঁছাচ্ছে। হাত দুটোকে তলপেটের থেকে প্রায় 10 cm (4 inches) দূরত্বে রাখ। দুটো কনুইকে সামনে এনে বাহুমূল দুটো খোলা রাখ। তালু দুটোকে উপরের দিকে মুখ করে রাখ। দুই হাতের আঙ্গুলগুলো প্রায় 10cm(4 inches) দূরত্বে পরস্পরের দিকে মুখ করে থাকবে। দুটো বাহু দিয়ে একটা বৃত্ত তৈরি কর (চিত্র 2-3)।

মাথার উপরে চক্র ধরে রাখ (থোউ ডিংগ বাও লুন)

পূর্বের অবস্থা থেকে, বাহু দুটোর বৃত্তাকার অবস্থার পরিবর্তন না করে হাত দুটোকে ধীরে ধীরে উপরে ওঠাতে থাক। মাথার উপরে চক্রটাকে দুই হাত দিয়ে ধর, আঙ্গুলগুলো একে অপরের দিকে মুখ করে থাকবে। দুই হাতের

চিত্র 2-6

চিত্র 2-7

তালু নীচের দিকে থাকবে। দুটো হাতের আঙ্গুলগুলোর মধ্যে 20-30 cm (8-12 inches) দূরত্ব রাখ। দুটো বাহু দিয়ে বৃত্ত তৈরি কর। দুটো কাঁধ, বাহু, কনুই এবং কব্জি শিথিল রাখ (চিত্র 2-4)।

মাথার দুই দিকে চক্র ধরে রাখ (লিয়াংগ সে বাও লুন)

পূর্বের অবস্থা থেকে দুটো হাত ধীরে ধীরে নীচে নামিয়ে মাথার দুই পাশে রাখ। তালু দুটোকে কানের দিকে মুখ করে রাখ। দুটো কাঁধ শিথিল রাখ এবং অগ্রবাহু সোজা রাখ। হাত দুটোকে কানের খুব বেশী কাছে রেখো না। (চিত্র 2-5)

তলপেটের সামনে একটার উপরে আর একটা হাত রাখ (দিয়ে খো শিয়াও ফু)

ধীরে ধীরে হাত দুটোকে পূর্বের অবস্থা থেকে নীচে নামিয়ে তলপেটে নিয়ে এসে একটার উপরে আর একটা হাত রাখ (চিত্র 2-6)। হাত দুটোকে জিয়েয়িন মুদ্রায় রেখে ক্রিয়াটা সমাপ্ত কর (চিত্র 2-7)।

3.বিশ্বের দুই প্রান্তভেদ ক্রিয়া (*গুয়ান থংগ লিয়াংগ জি ফা*)

তত্ত্ব:

এই ক্রিয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিশ্বের শক্তির সঙ্গে ব্যক্তির শরীরের ভিতরের শক্তি যেন মিশে বিলীন হয়ে যায়, বিরাট পরিমাণ শক্তি নির্গত করা হয় এবং গ্রহণ করা হয়, খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনুশীলনকারী তার শরীর থেকে রোগ সম্বন্ধীয় চি এবং কালো চি দূর করতে পারে এবং বিরাট পরিমাণ শক্তি এই বিশ্ব থেকে সংগ্রহ করতে পারে, যার ফলে তার শরীর শোধন করা হয়ে যায় এবং ব্যক্তি শীঘ্রই "শুদ্ধ শুভ্র শরীর" -এর অবস্থায় প্রবেশ করে। একই সাথে ঊর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী সঞ্চালনের সময়ে এই ক্রিয়া "মাথার উপরিভাগ উন্মোচন" করতে সহায়তা করে এবং পায়ের নীচের শক্তিপথগুলোর বাধা দূর করে উন্মোচন করে দেয়।

ক্রিয়া করার আগে নিজেকে স্বর্গ থেকে মর্ত্য পর্যন্ত বিস্তৃত, খাড়া করে রাখা দুটো বড়ো খালি পিপের মতো কল্পনা কর, যেগুলো অতিকায় এবং অতুলনীয় ভাবে লম্বা। শরীরের ভিতরের চি হাতের ঊর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী সঞ্চালনকে অনুসরণ করে, ঊর্ধ্বমুখী হস্তসঞ্চালনের সময়ে শরীরের ভিতরের চি সরাসরি মাথার উপরিভাগ দিয়ে বেগে বেরিয়ে গিয়ে এই বিশ্বের সর্বোচ্চ প্রান্তে পৌঁছে যায়, এবং নিম্নমুখী হস্তসঞ্চালনের সময়ে পায়ের তলা দিয়ে বেগে বেরিয়ে গিয়ে বিশ্বের সর্বনিম্নপ্রান্তে পৌঁছে যায়। এরপরে শক্তিটা বিশ্বের দুই প্রান্ত থেকে হস্তসঞ্চালনকে অনুসরণ করে শরীরের ভিতরে ফিরে আসে এবং আবার বিপরীত দিক দিয়ে নির্গত হয়। ঊর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী এই দুটো হস্তসঞ্চালনের প্রত্যেকটা সবশুদ্ধ 'ন' বার করে করা হয়। নবম বারের সঞ্চালনের সময়ে বাঁ হাত (মহিলাদের ক্ষেত্রে ডান হাত) উপরে ধরে রাখা হয় এবং অন্য হাতটাকে উপরে নিয়ে যাওয়া হয়। এবার দুটো হাতকে একত্রে নীচের দিকে সঞ্চালন করা হয়, যাতে শক্তিটা বিশ্বের নিম্নপ্রান্তে ধাবিত হয় এবং আবার ফিরে এসে শরীরের মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বপ্রান্তে ধাবিত হয়। দুটো হাতকে উপরদিকে এবং নীচের দিকে, এইরকম সঞ্চালন সবশুদ্ধ 'ন'বার সম্পন্ন করার পরে শক্তিটাকে শরীরের মধ্যে ফিরিয়ে আনা হয়। ফালুনকে শরীরের তলপেটে চার বার ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী (সামনে থেকে দেখলে) ঘুরিয়ে, শরীরের বাইরের শক্তিটাকে

চিত্র 3-1

চিত্র 3-2

চক্রাকার গতির মাধ্যমে শরীরের ভিতরে ফিরিয়ে আনা হয়। হাত দুটোকে একত্রে এনে জিয়েয়িন করে ক্রিয়াটা শেষ করা হয়, কিন্তু অনুশীলন শেষ হয় না।

শ্লোক:

জিংগ হুয়া বেন থি[60] ফা খাই ডিংগ দি[61]
শিন সি য়ি মেংগ [62] তাংগ তিয়েন ছে দি[63]

---

[60]জিংগ হুয়া বেন থি - শরীরের শোধন হচ্ছে
[61]ফা খাই ডিংগ দি - ফা উপরের এবং নীচের শক্তিনাড়ী উন্মুক্ত করছে
[62]শিন সি য়ি মেংগ - হৃদয় করুণাপূর্ণ হচ্ছে এবং সংকল্প দৃঢ় হচ্ছে
[63]তাংগ তিয়েন ছে দি - ভেদ করছে স্বর্গের শিখর এবং মর্ত্যের তলদেশ

চিত্র 3-3

চিত্র 3-4

প্রস্তুতি :

পুরো শরীরটাকে শিথিল কর, কিন্তু খুব বেশী ঢিলা ছেড়ে দিও না। পা দুটোর মধ্যে কাঁধের চওড়ার সমান ফাঁক রেখে স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াও। হাঁটু দুটোয় সামান্য ভাঁজ রাখ। হাঁটু এবং উরুসন্ধি শিথিল রাখ। চিবুকটা ভিতর দিকে সামান্য টেনে রাখ। জিভ উপরের টাকরাকে ছুঁয়ে থাকবে। দাঁতের মধ্যে ফাঁক রাখ। ঠোঁট বন্ধ রাখ, এবং চোখ দুটো হাল্কা করে বন্ধ কর। মুখমন্ডলে একটা পবিত্রভাব ফুটিয়ে তোল। হাত দুটোকে একত্রিত করে জিয়েয়িন কর (চিত্র 3-1), তারপরে হাত দুটোকে বুকের সামনে নিয়ে এসে হেশি কর (চিত্র 3-2)।

চিত্র 3-5

চিত্র 3-6

এক হাতের সঞ্চালন (ড্যান শোউ ছোংগ গুয়ান)

হেশি মুদ্রা থেকে, এক হাতের উপর-নীচ সঞ্চালন আরম্ভ কর। হাত দুটোকে শরীরের বাইরের শক্তির যন্ত্রকৌশলকে অনুসরণ করে ধীরে ধীরে সঞ্চালন করতে থাক। এই হস্তসঞ্চালনকে অনুসরণ করে শরীরের ভিতরের শক্তি উপরে-নীচে প্রবাহিত হতে থাকে। পুরুষদের, প্রথমে বাঁ হাতটা উপরে আনবে (চিত্র 3-3), মহিলাদের, প্রথমে ডান হাতটা উপরে আনবে।

ধীরে ধীরে হাতটাকে মুখমন্ডলের সামনে দিয়ে উপরে নিয়ে এস এবং মাথা অতিক্রম করে উপরে নিয়ে যাও। একই সাথে ধীরে ধীরে ডান হাত (মহিলাদের ক্ষেত্রে বাঁ হাত) নীচে নিয়ে এস। এরপরে দুটো হাতকে পর্যায়ক্রমে উপর-নীচ সঞ্চালন করতে থাকবে (চিত্র 3-4)। দুটো হাতের তালুকে শরীরের দিকে মুখ করে,10cm (4 inches) দূরত্বে রাখবে।

চিত্র 3-7

চিত্র 3-8

ক্রিয়া করার সময়ে পুরো শরীরকে শিথিল রাখা আবশ্যক। প্রত্যেকটা হাতের একবার উপরে ওঠা এবং নীচে নামা মিলিয়ে একবারই হিসাব করতে হবে। সবশুদ্ধ 'ন' বার এই রকম উপর-নীচ সঞ্চালন করবে।

দুই হাতের সঞ্চালন (শুয়াংগ শোউ ছোংগ গুয়ান)

এক হাতের সঞ্চালনের ক্ষেত্রে নবম বারে বাঁ হাতটাকে (মহিলাদের ক্ষেত্রে ডান হাত) উপরে ধরে রাখা হয় এবং অন্য হাতটাকে উপরে নিয়ে আসা হয়। অর্থাৎ দুটো হাতই উপরের দিকে থাকে (চিত্র 3-5)।

এরপরে দুটো হাতকে একই সাথে নীচের দিকে সঞ্চালন করা হয় (চিত্র 3-6)। হাতের তালু দুটোকে শরীরের দিকে মুখ করে 10 cm (4 inches) দুরত্বে রাখা হয়। দুটো হাতের এক বার উপর-নীচ সঞ্চালনকে এক বার হিসাবেই গণ্য করা হয়। সবশুদ্ধ 'ন' বার এইরকম হস্তসঞ্চালন করা হয়।

চিত্র 3-9

চিত্র 3-10

ফালুনকে দুই হাত দিয়ে ঘোরাও (শুয়াংগ শোউ থুই ডংগ ফালুন)

দুটো হাতের সঞ্চালন শেষ হওয়ার পরে, দুটো হাতকে নীচের দিকে নিয়ে গিয়ে মুখমন্ডল পার করে তারপরে বুকের উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তলপেটের জায়গায় আনা হয়। এবার ফালুনকে তলপেটের জায়গায় ঘোরানো হয় (চিত্র 3-7, 3-8 এবং 3-9) পুরুষদের ক্ষেত্রে বাঁ হাতটা ভিতরের দিকে এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ডান হাতটা ভিতরের দিকে রাখা হয়। দুটো হাতের মধ্যে এবং ভিতরের হাত ও তলপেটের মধ্যে 3 cm (1 inch) ফাঁক রাখা হয়। ফালুনকে ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী (সামনে থেকে দেখলে) চার বার ঘোরানো হয় যাতে শরীরের বাইরের শক্তিটাকে চক্রাকার গতির মাধ্যমে শরীরের ভিতরে ফিরিয়ে আনা যায়। ফালুনকে ঘোরানোর সময়ে হাত দুটোকে তলপেটের চৌহদ্দির মধ্যেই রাখবে।

হাত দুটোকে একসাথে রাখ (চিত্র 3-10) **(লিয়াংগ শোউ জিয়েয়িন)** ।

4.ফালুন ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ ক্রিয়া (*ফালুন ঝোউ থিয়েন ফা*)

তত্ত্ব:

এই ক্রিয়াতে মানুষের শরীরের শক্তিটা শরীরের অনেক বেশী জায়গা জুড়ে প্রবাহিত হতে পারে। একটা অথবা কয়েকটা নাড়ী দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার বদলে এখানে শক্তিটা শরীরের সম্পূর্ণ য়িন ভাগ থেকে য়িয়াংগ ভাগে বারংবার প্রবাহিত হতে থাকে। যে সব সাধারণ পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে শক্তিনাড়ীগুলি, অথবা বৃহৎ এবং ছোট ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথগুলো উন্মোচিত করা হয়ে থাকে, তাদের তুলনায় এই ক্রিয়া অনেক বেশী উন্নত। এই ক্রিয়া ফালুন গোংগ-এর মধ্যম স্তরের ক্রিয়া। পূর্বের তিনটি ক্রিয়ার উপরে ভিত্তি করে এই ক্রিয়ার অনুশীলনের মাধ্যমে পুরো শরীরের সমস্ত শক্তিনাড়ীগুলো (বৃহৎ ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ সমেত) খুব তাড়াতাড়ি খুলে যায় এবং যার ফলে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সারা শরীরের শক্তিনাড়ীগুলো একে অপরের সাথে ধীরে ধীরে জুড়ে যেতে থাকে। এই ক্রিয়ার সবথেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঘূর্ণায়মান ফালুনের প্রয়োগে এই মানব শরীরের সমস্ত অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ঠিক হয়ে যায় এবং এই মানব শরীর যা একটা ছোট বিশ্ব, তার মূল অবস্থায় ফিরে যায়। এর ফলে শরীরের সমস্ত শক্তিনাড়ীগুলো দিয়ে শক্তি সাবলীলভাবে এবং নির্বিঘ্নে প্রবাহিত হতে পারে। এই অবস্থা প্রাপ্ত হলে বলা যায় যে অনুশীলনকারী ত্রিলোক ফা সাধনার অনেক উঁচু স্তর প্রাপ্ত হয়েছে, উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন একজন ব্যক্তি এই মহান পথ(দাফা)-এ সাধনা আরম্ভ করতে পারে। এই সময় তার গোংগ সামর্থ্য এবং ঐশ্বরিক ক্ষমতা প্রচন্ড বৃদ্ধি পেতে পারে। এই ক্রিয়াতে হস্তসঞ্চালনের সময়ে শক্তির যন্ত্রকৌশলকে অনুসরণ করবে এবং প্রতিটা সঞ্চালন তাড়াহুড়ো না করে, ধীরগতিতে এবং মসৃণভাবে করবে।

চিত্র 4-1

চিত্র 4-2

শ্লোক:

শ্যুয়ান ফা ঝী শ্যু[64] শিন চিংগ সি য়ু[65]
ফান বেন গুই ঝেন[66] ইয়ো ইয়ো সি চি[67]

প্রস্তুতি:

পুরো শরীরকে শিথিল কর, কিন্তু খুব বেশী ঢিলা ছেড়ে দিও না। পা দুটোর মধ্যে কাঁধের চওড়ার সমান ফাঁক রেখে, স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াও। হাঁটু দুটোয়

---

[64]শ্যুয়ান ফা ঝী শ্যু - ঘূর্ণায়মান ফা শূন্যে পৌঁছে যাচ্ছে
[65]শিন চিংগ সি য়ু - হৃদয় হয়েছে খাঁটি রত্নের মত স্বচ্ছ
[66]ফান বেন গুই ঝেন - তোমার মূলে এবং নিজস্ব সত্যে ফিরে চল
[67]ইয়ো ইয়ো সি চি - তুমি হাল্কা বোধ করছ ঠিক যেন ভেসে উঠছ

চিত্র 4-3

চিত্র 4-4

সামান্য ভাঁজ রাখ, হাঁটু এবং ঊরুসন্ধি শিথিল রাখ। চিবুকটাকে ভিতরের দিকে সামান্য টেনে রাখ। জিভ উপরের টাকরাকে ছুঁয়ে থাকবে। দাঁতের মধ্যে অল্প ফাঁক রাখ। ঠোঁট বন্ধ রাখ এবং চোখ দুটো হাল্কা করে বন্ধ কর। মুখমন্ডলে একটা পবিত্রভাব ফুটিয়ে তোল।

হাত দুটোকে একত্রিত করে জিয়েয়িন কর (চিত্র 4-1) তারপরে হাত দুটোকে বুকের সামনে নিয়ে এসে (নমস্কারের মতো জুড়ে) হেশি কর (চিত্র 4-2)।

হেশি অবস্থা থেকে হাত দুটোকে আলাদা করে নীচে তলপেটের দিকে নামিয়ে আন। একই সাথে দুটো হাতের তালুকে ঘুরিয়ে শরীরের দিকে মুখ করে রাখ। হাত এবং শরীরের মধ্যে প্রায় 10 cm (4 inches) দূরত্ব রাখবে। তলপেট পেরোনোর পরে হাত দুটোকে দুটো পায়ের ভিতরের দিক দিয়ে আরও নীচে প্রসারিত কর। একই সাথে কোমরটা ভাঁজ কর এবং উবু হয়ে নীচে বসতে থাক (চিত্র 4-3)।

চিত্র 4-5

চিত্র 4-6

আঙ্গুলগুলোর ডগা মাটির কাছাকাছি এসে গেলে দুটো হাতকে দুই দিকের প্রত্যেক পায়ের পাতার সামনে থেকে সেই পায়ের পাতার বাইরের দিক দিয়ে পায়ের গোড়ালির বাইরেটা পর্যন্ত একটা বৃত্তের মতো করে সঞ্চালন কর (চিত্র 4-4)।

এর পরে কব্জি দুটোকে সামান্য ভাঁজ করে হাত দুটোকে পায়ের পেছন দিয়ে আস্তে আস্তে উপরে ওঠাতে থাক (চিত্র 4-5)।

হাত দুটোকে উপরে ওঠানোর সময়ে কোমর সোজা করতে থাক (চিত্র 4-6)। এই ফালুন ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ ক্রিয়াটা করার সময় দুটো হাত যেন শরীরের কোনও অংশ স্পর্শ না করে, তা না হলে দুটো হাতে অবস্থিত শক্তি শরীরের মধ্যে চলে যাবে।

চিত্র 4-7

চিত্র 4-8

যখন হাত দুটোকে পিঠের দিক দিয়ে আর উপরে ওঠানো যাবে না তখন দুটো হাতকে খালি মুঠো কর (চিত্র 4-7), এবার বাহুমূলের তলা দিয়ে হাত দুটোকে টেনে সামনে নিয়ে এস।

দুটো বাহু একে অপরকে বুকের সামনে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করবে (কোন্ হাতটা উপরে থাকবে, কোন্ হাতটা নীচে থাকবে সে ব্যাপারে কোনও বিশেষ আবশ্যকতা নেই। এটা নির্ভর করে, সে কীভাবে অভ্যস্ত তার উপরে। এ ব্যাপারে পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই) (চিত্র 4-8)।

চিত্র 4-9

চিত্র 4-10

এবার হাতের মুঠো খুলে হাত দুটো কাঁধের উপরে রাখ (ফাঁক থাকবে)। দুটো হাতের তালুকে বাহুর বাইরের দিক (য়িয়াংগ) দিয়ে সঞ্চালন কর, কব্জির কাছে পৌঁছে গেলে হাত দুটোকে ঘোরাও যাতে তালু দুটো পরস্পরের দিকে 3-4 cm (1.25-1.5inches) দূরত্বে মুখোমুখি থাকে। তখন বাইরের হাতের বুড়ো আঙ্গুল উপরের দিকে আর ভিতরের হাতের বুড়ো আঙ্গুল নিচের দিকে থাকবে। এই সময়ে হাত এবং বাহু একটা সরল রেখা তৈরি করবে (চিত্র 4-9)।

দুটো হাতের তালুকে এমনভাবে ঘোরাও যেন দুটো হাতের মধ্যে বল ধরা আছে অর্থাৎ বাইরের হাত ভিতরের দিকে ঘুরে যাবে আর ভিতরের হাত বাইরের দিকে ঘুরে যাবে। তখন হাত দুটো অগ্রবাহু এবং পশ্চাৎবাহুর ভিতরের দিকে (য়িন দিক দিয়ে) এগোতে থাকবে, সেই সময়ে

চিত্র 4-11

চিত্র 4-12

হাত দুটোকে উপরে তোল এবং মাথার উপর দিয়ে পিছনে নিয়ে যাও। হাত দুটোকে মাথার পিছনে আড়াআড়িভাবে রাখ (চিত্র 4-10)।

এরপরে হাতদুটোকে আরও নীচে পিঠের শিরদাঁড়ার দিকে সঞ্চালন কর (চিত্র 4-11)।

দুটো হাতকে আলাদা কর যাতে আঙ্গুলগুলোর ডগা নীচের দিক করে থাকে এবং পিঠের শক্তিটা জুড়ে যায়। এবার হাত দুটোকে সমান্তরালভাবে মাথার উপর দিয়ে সঞ্চালন করে বুকের সামনে নিয়ে যাও (চিত্র 4-12)। এইভাবে ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথের পরিক্রমাটা সম্পূর্ণ হল। সবশুদ্ধ 'ন'বার এই পরিক্রমাটা কর, 'ন'বার সম্পূর্ণ হওয়ার পরে দুটো হাতকে বুকের সামনে দিয়ে তলপেটের জায়গায় নামিয়ে আন।

চিত্র 4-13

চিত্র 4-14

তলপেটের জায়গায় একটা হাতকে আর একটা হাতের উপরে রাখ (দিয়ে খো শিয়াও ফু) (চিত্র 4-13), এবং তারপরে দুটো হাতকে একত্রে জিয়েয়িন (চিত্র 4-14) করে রাখ।

5.ঐশ্বরিক ক্ষমতার শক্তিবৃদ্ধি ক্রিয়া (*শেন থংগ জিয়া চি ফা*)

তত্ত্ব:

ঐশ্বরিক ক্ষমতার শক্তিবৃদ্ধির ক্রিয়া হচ্ছে ফালুন গোংগের অন্তর্গত শান্তভাবে সাধনার একটি ক্রিয়া। এটি একটি বহু উদ্দেশ্যসাধক ক্রিয়া যা বুদ্ধ হস্তমুদ্রাগুলির দ্বারা ফালুনের ঘূর্ণনের মাধ্যমে অনুশীলনকারীর ঐশ্বরিক ক্ষমতার (অলৌকিক ক্ষমতা সমেত) শক্তিবৃদ্ধি করে এবং গোংগ সামর্থ্যের শক্তিবৃদ্ধি করে। এটি মধ্যম শ্রেণীর থেকেও উপরের স্তরের ক্রিয়া এবং আদিতে গোপন অনুশীলন হিসাবে পরিগণিত হতো। যে সমস্ত অনুশীলনকারীর ভিত্তিটা বিশেষভাবে দৃঢ়, তাদের আবশ্যকতা পূরণ করার জন্য আমি এই সাধনার ক্রিয়াকে বিশেষভাবে সার্বজনিক করে দিয়েছি, যার ফলে পূর্ব নির্ধারিত অনুশীলনকারীদের উদ্ধার করা যাবে। এই ক্রিয়াতে পূর্ণ পদ্মাসনে ধ্যান করা আবশ্যক, পূর্ণ পদ্মাসনই সব থেকে ভালো, তবে অর্ধপদ্মাসন করতে পারলেও চলবে। ক্রিয়াটা করার সময়ে চি-এর প্রবাহ বেশ প্রবল থাকে এবং শরীরের চারিদিকে শক্তির ক্ষেত্রটাও খুব বড়ো থাকে। হস্তসঞ্চালন মাস্টারের দ্বারা স্থাপিত শক্তির যন্ত্রকৌশলকে অনুসরণ করবে, এবং হস্তসঞ্চালন আরম্ভের সময়ে, মন চিন্তার গতিকে অনুসরণ করবে। ঐশ্বরিক ক্ষমতাগুলির শক্তিবৃদ্ধির সময়ে মনকে শূন্য রাখবে, আর দুটো হাতের তালুর প্রতি অল্প সজাগ থাকবে। তালুর মাঝখানে গরম ভাব, ভারী ভারী ভাব, ঝিন্‌ঝিন্‌, অসাড় ভাব, যেন কোন ওজন ধরে আছ ইত্যাদি অনুভূতি হতে থাকবে। এই সমস্ত অনুভূতিগুলির কোনওটার পিছনে উদ্দেশ্য নিয়ে ছুটবে না, এগুলোকে স্বাভাবিক ভাবে হতে দাও। পা দুটোকে আড়াআড়ি ভাবে যত বেশী সময় ধরে রাখতে পারবে ততই ভালো। আর এটা নির্ভর করে ব্যক্তির সহনশীলতার উপরে। যত বেশী সময় ধরে ধ্যান করতে পারবে, ক্রিয়াটা তত বেশী তীব্র হবে, এবং তত তাড়াতাড়ি শক্তির বৃদ্ধি ঘটবে। ক্রিয়া করার সময়ে, কোনও কিছু চিন্তা করবে না, কোন মানসিক ইচ্ছার ব্যাপারই নেই, ধীরে ধীরে শান্তভাবের মধ্যে প্রবেশ করবে। এই শান্ত অথচ ডিংগ[68] নয় এই রকম সক্রিয় অবস্থা

---

[68]ডিংগ - ধ্যানাবস্থা যখন মন পুরোপুরি শূন্য অথচ সচেতন।

চিত্র 5-1

থেকে ধীরে ধীরে ডিংগ অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করবে। কিন্তু তোমার মুখ্য চেতনা অবশ্যই সজাগ থাকবে যে তুমিই ক্রিয়াটা করছ।

শ্লোক:

ইয়ো য়ি য়ু য়ি[69] য়িন সুই জি চি[70]
সি খোংগ ফেই খোংগ[71] ডংগ জিংগ রু য়ি[72]

দুটো হাত একত্রিত কর (লিয়াংগ শোউ জিয়েয়িন)

পা দুটোকে আড়াআড়ি রেখে পদ্মাসনে বস। পুরো শরীর শিথিল কর, কিন্তু খুব বেশী ঢিলা ছেড়ে দিও না। কোমর এবং ঘাড় সোজা রাখ। চিবুকটা ভিতরের দিকে সামান্য টেনে রাখ। জিভের ডগা টাকরাটা ছুঁয়ে থাকবে

---

[69]ইয়ো য়ি য়ু য়ি - ঠিক যেন উদ্দেশ্য নিয়ে, অথচ উদ্দেশ্য ছাড়াই
[70]য়িন সুই জি চি - হস্তসঞ্চালন শক্তির যন্ত্রকৌশলকে অনুসরণ করছে
[71]সি খোংগ ফেই খোংগ - ঠিক যেন শূণ্য অথচ শূণ্য নয়
[72]ডংগ জিংগ রু য়ি - সহজভাবে গতিশীল হও অথবা স্থির হও

চিত্র 5-2

চিত্র 5-3

দাঁতের মধ্যে অল্প ফাঁক রাখ, ঠোঁট বন্ধ রাখ, এবং চোখ দুটো হাল্কা করে বন্ধ কর। হৃদয়টা করুণায় পূর্ণ কর। মুখমন্ডলে একটা শান্ত এবং পবিত্রভাব ফুটিয়ে তোল। দুটো হাতকে তলপেটে একত্রিত করে জিয়েয়িন কর। ধীরে ধীরে শান্তভাবের মধ্যে প্রবেশ কর (চিত্র 5-1)

প্রথম হস্তমুদ্রা

হস্তসঞ্চালন আরম্ভ করার সময়ে হৃদয় চিন্তার গতিকে অনুসরণ করবে এবং হস্তসঞ্চালন মাস্টার দ্বারা স্থাপিত শক্তির যন্ত্রকৌশলকে অনুসরণ করবে। এই সঞ্চালন তাড়াহুড়ো না করে, ধীর গতিতে এবং মসৃণভাবে করবে। দুটো হাতকে জিয়েয়িন অবস্থায় রেখে ধীরে ধীরে উপরে তুলতে থাক, যতক্ষণ না মাথার সামনে পৌঁছায়, তখন দুটো হাতের তালু ধীরে ধীরে উপর দিকে মুখ করে ঘোরাও। হাতের তালু দুটো উপর দিকে মুখ করে থাকার সময়ে হাত দুটো উচ্চতম বিন্দুতে পৌঁছে যায় (চিত্র 5-2)।

চিত্র 5-4

চিত্র 5-5

এরপরে হাত দুটোকে আলাদা কর এবং মাথার উপরে একটা বৃত্ত রচনা করে দুই পাশ দিয়ে ঘুরিয়ে আনতে থাক যতক্ষণ না হাত দুটো মাথার সামনে এসে পৌঁছায় (চিত্র 5-3)।

পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটো নীচে নামাও, কনুই দুটো ভিতরে রাখার চেষ্টা করে, তালু দুটো উপর দিকে এবং আঙ্গুলগুলো সামনের দিকে মুখ করে রাখ (চিত্র 5-4)।

তারপরে দুটো কব্জিকে সোজা করে বুকের সামনে নিয়ে এস, যেখানে এরা একে অপরকে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করে। পুরুষদের ক্ষেত্রে বাঁ হাত বাইরের দিক দিয়ে যায় এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ডান হাত বাইরের দিক দিয়ে যায় (চিত্র 5-5)।

দুটো হাত এবং বাহু দিয়ে যখন একটা সরল রেখা তৈরি হয়, তখন বাইরের দিকের হাতের কব্জিকে বাইরের দিকে ঘোরাও, একই সাথে তালুটাও উপর দিকে ঘুরে যাবে। একটা অর্ধবৃত্ত রচনা করে তালুটাকে ঘোরাও যাতে তালু উপর দিকে এবং আঙ্গুলগুলো পেছন দিকে মুখ করে

চিত্র 5-6

চিত্র 5-7

থাকে। হাতে কিছুটা বল প্রয়োগ করতে হয়। ভিতরের দিক দিয়ে যে হাতটা বুকের সামনে দিয়ে আড়াআড়িভাবে অতিক্রম করছে সেটার তালুকে ধীরে ধীরে নীচের দিকে ঘোরাও, বাহুটাকে প্রসারিত করে সোজা কর, তারপরে হাত এবং বাহু ঘোরাও যাতে তালু বাইরের দিকে মুখ করে থাকে। হাত এবং বাহু শরীরের নীচের অংশের সামনে স্থিত হয়ে শরীরের সঙ্গে 30^0 কোণ তৈরি করে (চিত্র 5-6)।

দ্বিতীয় হস্তমুদ্রা

পূর্বের অবস্থানের(চিত্র 5-6) পরে বাঁ হাত (উপরের হাত) ভিতরের দিক দিয়ে সঞ্চালন কর। ডান হাতের তালু শরীরের দিকে ঘুরে যাবে এবং ডান হাত উপরে উঠতে থাকে। এরপর হস্তসঞ্চালন প্রথম মুদ্রার মতো একই, শুধু ডান হাত এবং বাঁ হাত পাল্টাপাল্টি হয়ে যাবে। দুটো হাতের অবস্থান পূর্বের ঠিক বিপরীত হবে (চিত্র 5-7)।

চিত্র 5-8

চিত্র 5-9

তৃতীয় হস্তমুদ্রা

পুরুষদের ক্ষেত্রে ডান কব্জি (মহিলাদের-বাঁ কব্জি) সোজা করে তালুটাকে শরীরের দিকে মুখ করে ঘোরাও। ডান হাত বুকের সামনে দিয়ে অতিক্রম করার পরে তালুটাকে নীচের দিকে মুখ করে জঙ্ঘাস্থি (shin-bone) পর্যন্ত সঞ্চালন কর এবং বাহুটাকে প্রসারিত করে সোজা কর। পুরুষদের বাঁ কব্জি (মহিলাদের-ডান কব্জি) ঘুরিয়ে উপর দিকে সঞ্চালন কর এবং তালুটাকে শরীরের দিকে মুখ করা অবস্থায় ডান হাতকে অতিক্রম কর। একই সাথে তালুটাকে বাঁ (মহিলাদের-ডান) কাঁধের দিকে নিয়ে যাও। ঠিক জায়গায় পৌঁছে তালুটাকে উপর দিকে এবং আঙ্গুলগুলোকে সামনের দিকে মুখ করে রাখ (চিত্র 5-8)।

চতুর্থ হস্তমুদ্রা

এটা আগের মুদ্রার মত একই, শুধু হাতগুলোর অবস্থান বিপরীত, পুরুষদের ক্ষেত্রে বাঁ হাত (মহিলাদের - ডান হাত) ভিতরের দিক দিয়ে সঞ্চালন কর

চিত্র 5-10

চিত্র 5-11

এবং ডান হাত (মহিলাদের - হাত) বাইরের দিক দিয়ে সঞ্চালন কর। হস্ত সঞ্চালনের ক্ষেত্রে শুধু বাঁ হাতের জায়গায় ডান হাত হবে। হাত দুটোর স্থিতি বিপরীত হবে (চিত্র 5-9)। এই চারটে মুদ্রার হস্তসঞ্চালনগুলি একটানা করে যেতে হবে, কখনোও থামবে না।

গোলোকাকার ঐশ্বরিক ক্ষমতার শক্তিবৃদ্ধি

চতুর্থ মুদ্রার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে উপরের হাত ভিতরের দিক দিয়ে সঞ্চালন কর এবং নীচের হাত বাইরের দিক দিয়ে সঞ্চালন কর। পুরুষদের ডান হাতের তালু (মহিলাদের বাম হাত) ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে বুকের দিকে সঞ্চালন করে নিয়ে আস। পুরুষদের বাম হাত (মহিলাদের ডান হাত) উপর দিকে সঞ্চালন করে নিয়ে আস। দুটো অগ্রবাহু বুকের সামনে এসে যখন একটি সরল রেখা তৈরি করে (চিত্র 5-10), তখন একই সময়ে দুটো হাতকে দুই দিকে টেনে নিয়ে আলাদা কর (চিত্র 5-11) এবং একই সাথে তালু দুটোকে নীচের দিকে মুখ করে ঘুরিয়ে দাও।

চিত্র 5-12

যখন দুটো হাত হাঁটু দুটোর উপরে এবং বাইরে পৌঁছে যায়, তখন হাত দুটোকে কোমরের সমান অনুভূমিক তলে রাখ। অগ্রবাহু ও হাতের কব্জিকে একই সমতলে রাখ। বাহু দুটো শিথিল কর (চিত্র 5-12)। এই দেহভঙ্গি শরীরের অভ্যন্তরীণ ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে আসে শক্তিবৃদ্ধি করার জন্য। এটাই গোলোকাকার ঐশ্বরিক ক্ষমতা। ঐশ্বরিক ক্ষমতার শক্তিবৃদ্ধি হওয়ার সময়ে, হাতের তালুতে গরম ভাব, ভারী ভাব, অসাড় ভাব, যেন ওজন ধরে আছে, ইত্যাদি, অনুভূতি হতে থাকবে। কিন্তু উদ্দেশ্য নিয়ে এই অনুভূতিগুলোর পিছনে ছুটবে না, এগুলোকে স্বাভাবিকভাবে ঘটতে দাও। যত বেশী সময় এই দেহভঙ্গি ধরে রাখতে পারবে ততই ভালো হবে, এইভাবে থাক যতক্ষণ না হাত দুটো ধরে রাখা অসম্ভব বোধ হয়।

চিত্র 5-13

স্তম্ভ আকৃতির ঐশ্বরিক ক্ষমতার শক্তিবৃদ্ধি

আগের মুদ্রা অনুসরণ করে ডান হাতের (মহিলাদের বাঁ হাত) তালুটাকে উপর দিকে মুখ করে ঘোরাও এবং সঞ্চালন করে তলপেটের জায়গায় নিয়ে যাও। হাতটা ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেলে, তালুটাকে উপরের দিকে মুখ করে তলপেটে রাখ। একই সময়ে, যখন ডান হাত সঞ্চালন করছ, বাম হাত (মহিলাদের ডান হাত) উপরে ওঠাও এবং সঞ্চালন করে চিবুকের কাছে নিয়ে যাও। হাতের তালুটাকে নীচের দিকে রেখে হাতটাকে চিবুকের সমান উচ্চতায় ধরে রাখ। অগ্রবাহু এবং হাত একই সমতলে রাখবে। এই সময়ে তালু দুটো পরস্পরের দিকে মুখ করে স্থির থাকবে (চিত্র 5-13)। এটাই স্তম্ভ আকৃতির ঐশ্বরিক ক্ষমতার শক্তিবৃদ্ধি, যেমন ‘‘হাতের তালুর বজ্র নিনাদ’’ ইত্যাদি। এই ভাবে হাত দুটো অনেকক্ষণ ধরে রাখার চেষ্টা কর যতক্ষণ না এইভাবে ধরে রাখাটা তোমার কাছে অসম্ভব বোধ হয়।

চিত্র 5-14

চিত্র 5-15

এর পরে, উপরের হাতটাকে তোমার সামনে অর্ধবৃত্ত রচনা করে নীচে তলপেটের জায়গায় নামিয়ে নিয়ে এস। একই সাথে নীচের হাতকে উপরে ওঠাতে থাক এবং তালুটাকে ঘুরিয়ে নীচের দিকে মুখ করে রাখ। এইভাবে চিবুক পর্যন্ত হাতটাকে ওঠাও (চিত্র 5-14)। এই বাহুটাকে কাঁধের সমান উচ্চতায় রাখ এবং দুটো হাতের তালু পরস্পরের দিকে মুখ করে থাকবে। এটাও স্তম্ভ আকৃতির ঐশ্বরিক ক্ষমতার শক্তিবৃদ্ধি করে, কেবল হাত দুটো বিপরীত অবস্থানে থাকে। এইভাবে হাত দুটো অনেকক্ষণ ধরে থাক, যতক্ষণ না ক্লান্তির ফলে বাহুদুটো ধরে রাখা অসম্ভব বোধ হয়।

শান্তভাবের সাধনা

আগের স্থিতির পরে, উপরের হাতটাকে তোমার সামনে অর্ধবৃত্ত রচনা করে নীচে তলপেটের জায়গায় নামিয়ে আন। দুটো হাত একত্রিত করে জিয়েয়িন কর এবং শান্তভাবের সাধনা আরম্ভ কর (চিত্র 5-15)। ডিংগ (ধ্যানাবস্থা

চিত্র 5-16

যখন মন পুরোপুরি শূন্য অথচ সচেতন) অবস্থায় প্রবেশ কর, যত বেশী সময় থাকতে পারবে তত ভালো হবে।

সমাপ্তির স্থিতি

দুটো হাত একত্রিত করে হেশি কর (চিত্র 5-16)। ডিংগ অবস্থা থেকে বেরিয়ে এস এবং পদ্মাসন সমাপ্তি কর।

ফালুন গোংগ অনুশীলনের জন্য কিছু মূল আবশ্যকতা এবং মনোযোগের বিষয়

1. ফালুন গোংগ-এর পাঁচটা ক্রিয়া পরপর অথবা ইচ্ছামত বাছাই করে অনুশীলন করা যেতে পারে। কিন্তু শুরুতে সাধারণত প্রথম ক্রিয়াটা করা আবশ্যক, এছাড়া প্রথম ক্রিয়াটা তিনবার করা সবথেকে ভাল। অবশ্য প্রথম ক্রিয়া না করেও অন্য ক্রিয়া অনুশীলন করা সম্ভব। প্রতিটি ক্রিয়া স্বতন্ত্রভাবেও অনুশীলন করা যেতে পারে।

2. প্রতিটি সঞ্চালন সঠিক এবং নির্দিষ্ট ছন্দে হওয়া উচিৎ। হাত এবং বাহুকে মসৃণভাবে উপর-নীচে, সামনে-পেছনে ও ডানদিকে-বাঁদিকে সঞ্চালন করবে, এবং তাড়াহুড়ো না করে, ধীর গতিতে ও মসৃণভাবে শক্তির যন্ত্রকৌশলকে অনুসরণ করে সঞ্চালন করবে। আবার সঞ্চালন খুব দ্রুত অথবা খুব মন্থরভাবেও করবে না।

3. ক্রিয়া করার সময়ে নিজেকে অবশ্যই মুখ্যচেতনার নিয়ন্ত্রণে রাখবে। কারণ ফালুন গোংগ হচ্ছে মুখ্য চেতনারই সাধনা। ইচ্ছাপূর্বক শরীরকে দোলাবার প্রয়াস করবে না, যদি শরীর দোলে তবে সেটাকে সংযত করবে, প্রয়োজন হলে চোখ খোলাও রাখতে পার।

4. পুরো শরীরকে শিথিল কর, বিশেষত হাঁটু এবং ঊরুসন্ধির জায়গায়; যদি তুমি শক্তভাবে দাঁড়াও তাহলে নাড়ীগুলো অবরুদ্ধ হয়ে থাকবে।

5. ক্রিয়ার সময়ে সঞ্চালন হবে স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক, প্রসারিত ও মুক্ত, কোমলের মধ্যে দৃঢ়, অবাধ এবং একে অপরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সঞ্চালনের সময়ে কিছুটা বলের প্রয়োগ থাকবে, কিন্তু কোন কঠোরভাব বা শক্তভাব থাকবে না। এইভাবে ক্রিয়া করলে পরিণামটা লক্ষণীয়ভাবে ফলপ্রসূ হবে।

6. প্রত্যেকবার ক্রিয়া যখন সমাপ্ত করা হয়, তখন শুধু সঞ্চালনই বন্ধ হয়, সাধনার যন্ত্রকৌশল বন্ধ হয় না। তোমাকে শুধু দুটো হাত একত্রিত (জিয়েয়িন) করতে হবে। হাত দুটো একত্রিত করে সমাপ্ত করার অর্থ

সঞ্চালনের সমাপ্তি। উদ্দেশ্য নিয়ে সাধনার যন্ত্রকৌশল বন্ধ করা যাবে না, কারণ ফালুন-এর আবর্তন থামানো যায় না।

7. যারা অনেকদিন ধরে অসুস্থ অথবা দুর্বল, তারা তাদের বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী ক্রিয়া কম করে করবে, অথবা পাঁচটার মধ্যে যে কোনও একটা ক্রিয়া বেছে নিয়ে অনুশীলন করবে। যারা সঞ্চালন করতে পার না, তারা পদ্মাসনে বসে থাকতে পার। যাই হোক তুমি বিরামহীন ভাবে অনুশীলন চালিয়ে যাবে।

8. ক্রিয়া করার জন্য স্থান, সময় অথবা দিকের ব্যাপারে কোনও বিশেষ আবশ্যকতা নেই, কিন্তু একটা পরিষ্কার জায়গা এবং শান্তিপূর্ণ বাতাবরণ বাঞ্ছনীয়।

9. এই ক্রিয়াগুলির সময়ে কোন মানসিক ইচ্ছা প্রয়োগ করবে না, তাহলে তুমি কখনো বিপথগামী হবে না। ফালুন গোংগ-এর সঙ্গে অন্য কোনও সাধনা প্রণালী মেলাবে না, তা না হলে ফালুন বিকৃত হয়ে যাবে।

10. ক্রিয়া করার সময়ে সত্যিই যদি শান্তভাবের মধ্যে প্রবেশ করতে না পার, তাহলে মাস্টারের নাম উচ্চারণ করতে পার, একটা সময়ের পরে স্বাভাবিকভাবেই শান্তভাবের মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে।

11. ক্রিয়া করার সময়ে তুমি কিছু দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে পার, এটা কর্মের ঋণ শোধ করার একটা পন্থা। প্রত্যেকেরই কর্ম রয়েছে। শরীরে কোন অস্বস্তি বোধ করলে সেটাকে কোন রোগ মনে করবে না। তোমার কর্ম দূর করার জন্য এবং সাধনার পথ প্রশস্ত করার জন্য কিছু দুর্ভোগ শীঘ্র এবং সময়ের আগেই আসতে পারে।

12. বসে ধ্যান করার সময়ে যদি একটা পা আর একটা পায়ের ওপরে আড়াআড়ি ভাবে রাখতে না পার, তাহলে প্রথমে একটা চেয়ারের ধারে বসেও করতে পার এবং সেক্ষেত্রেও একই ফল প্রাপ্ত হবে। কিন্তু একজন অনুশীলনকারী হিসাবে তোমাকে অবশ্যই পদ্মাসনেই বসতে হবে। একটা সময়ের পরে, ধীরে ধীরে তুমি নিশ্চয়ই এটা করতে পারবে।

13. শান্তভাবের ক্রিয়া করার সময়ে যদি তুমি কোনও ছবি অথবা দৃশ্য দেখতে পাও, সেগুলোর প্রতি মনোযোগ দেবে না, নিজের অনুশীলন করতে থাকবে। যদি ভয়ঙ্কর দৃশ্যাবলি তোমাকে বাধা দেয় অথবা তুমি কোন রকম আশঙ্কা বোধ করো, তৎক্ষণাৎ তুমি স্মরণ করবে: ‘‘আমি ফালুন গোংগ-এর মাস্টারের দ্বারা সুরক্ষিত, আমি কোনও কিছুকেই ভয় পাই না;’’ অথবা তুমি মাস্টার লি-র নাম ধরেও ডাকতে পার এবং অনুশীলন চালিয়ে যেতে পার।

অধ্যায়-পাঁচ
প্রশ্ন ও উত্তর

1. ফালুন এবং ফালুন গোংগ

প্রশ্ন: *ফালুন গোংগ কি দিয়ে তৈরি?*

উত্তর: ফালুন উচ্চশক্তির পদার্থ দিয়ে তৈরি এক বুদ্ধিমান সত্তা যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে গোংগ-এর রূপান্তর ঘটায়। আমাদের এই মাত্রাতে এর অস্তিত্ব নেই।

প্রশ্ন: *ফালুন দেখতে কেমন?*

উত্তর: ফালুনের রঙ সম্বন্ধে শুধু এটুকুই বলা যায় যে এর রঙটা সোনালী হলুদ। আমাদের এই মাত্রাতে এই রঙটার অস্তিত্ব নেই। এর ভিতরের বৃত্তের বুনিয়াদি রঙটা হচ্ছে অত্যন্ত উজ্জ্বল লাল এবং বাইরের বৃত্তের বুনিয়াদি রঙটা হচ্ছে কমলা। এর মধ্যে তাও মতের লাল ও কালো দুটো তাইজি প্রতীক চিহ্ন আছে এবং আদি তাও মতের লাল ও নীল দুটো তাইজি প্রতীক চিহ্ন আছে। এই দুটো আলাদা প্রনালীর জিনিস। শ্রীবৎস প্রতীক চিহ্ন "卍" হচ্ছে সোনালী হলুদ। নিম্নস্তরের দিব্যচক্ষু সম্পন্ন লোকেরা দেখতে পায় যে ফালুন একটা বৈদ্যুতিক পাখার মতো ঘুরছে। যদি স্পষ্টভাবে দেখা যায় তাহলে একে দেখতে খুব সুন্দর লাগে এবং অনুশীলনকারীকে আরও প্রবলভাবে এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাধনা করে সামনে এগোতে প্রেরণা দেয়।

প্রশ্ন: *শুরুতে ফালুন কোথায় স্থাপন করা হয়? পরে একে কোথায় স্থাপন করা হয়?*

উত্তর: আমি তোমাকে সঠিকভাবে একটাই ফালুন দিয়েছি, এটা তলপেটে স্থাপন করা হয়। এই একই স্থানে আমাদের উল্লেখিত দ্যানের সাধনা করা হয় এবং সুরক্ষিত রাখা হয়। এর অবস্থানের কোনও পরিবর্তন হয় না।

কিছু লোক অনেকগুলি ঘূর্ণায়মান ফালুন দেখতে পায়, এগুলো দিয়ে আমার ফা-শরীর বাইরে থেকে তোমার শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করে।

প্রশ্ন: *অনুশীলন এবং সাধনার দ্বারা ফালুন বিকশিত করা যায় কি? কতগুলো ফালুন বিকশিত করা সম্ভব? এই ফালুনগুলো এবং মাস্টারের দেওয়া ফালুনের মধ্যে কোনও তফাৎ আছে কি?*

উত্তর: অনুশীলন এবং সাধনার দ্বারা ফালুন বিকশিত করা সম্ভব। যখন গোংগ সামর্থ্য নিরন্তর বাড়তে থাকে সেইভাবে ফালুনও আরও বেশী করে বিকশিত হতে থাকে, সব ফালুনই একই রকম। শুধু তলপেটে স্থাপিত ফালুন এখানে ওখানে যেতে আসতে পারে না, কারণ এটাই মূল।

প্রশ্ন: *ফালুনের অস্তিত্ব এবং আবর্তন অনুভব করা বা দেখতে পাওয়া যায় কি?*

উত্তর: একে অনুভব করা বা দেখতে পাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিছু লোক খুব সংবেদনশীল হয়, তারা ফালুনের আবর্তন অনুভব করতে পারে। ফালুন স্থাপিত হওয়ার পরে প্রারম্ভিক পর্যায়ে শরীরের মধ্যে একে কিছুটা অনভ্যস্ত বোধ হতে পারে। পেটে ব্যথা হতে পারে, কোন কিছু নড়ছে বলে বোধ হতে পারে, গরমভাব বোধ হতে পারে, ইত্যাদি। এটা মানিয়ে নেওয়ার পরে তুমি আর এইসব অনুভব করবে না। তবে অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা একে দেখতে পারে, এটা ঠিক যেন তোমার পাকস্থলীর মতো, পাকস্থলীর নড়াচড়া তুমি অনুভব করতে পার না।

প্রশ্ন: *ফালুন প্রতীকচিহ্নে ফালুন যে দিকে ঘুরছে, সেটা শিক্ষার্থীদের প্রবেশ পত্র (বেজিং-এর প্রথম এবং দ্বিতীয় সেমিনার প্রসঙ্গে)-এর মতো একই রকম নয়। সেমিনারের শিক্ষার্থীদের প্রবেশপত্রে ছাপা ফালুন ঘড়ির বিপরীত দিকে ঘুরছে। কেন?*

উত্তর: উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাকে ভালো কিছু দেওয়া। এর বাইরের দিকে নির্গত হওয়া শক্তি তোমাদের সবার শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করছে এবং সেইজন্য এটা ঘড়ির দিক অনুযায়ী ঘোরে না। তোমরা দেখতে পার যে এটা ঘুরছে।

প্রশ্ন: *মাস্টার কোন্ সময়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফালুন স্থাপন করেন?*

উত্তর: আমরা তোমাদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করব। আমাদের কিছু শিক্ষার্থী আছে যারা অনেক ধরনের পদ্ধতিতে অনুশীলন করেছে, তাদের শরীরের সমস্ত গোলমেলে জিনিসগুলোকে দূর করতে হবে যা কঠিন ব্যাপার, ভালো জিনিসগুলোকে রেখে দেওয়া হবে এবং খারাপ জিনিসগুলোকে দূর করে দেওয়া হবে। এটা একটা অতিরিক্ত ব্যবস্থা। এর পরে ফালুন স্থাপন করা হবে। ব্যক্তির সাধনার স্তরের উপরে নির্ভর করে ফালুনের আকার ভিন্ন ভিন্ন হবে। কিছু লোক কোনদিনই চিগোংগ অনুশীলন করে নি, তাদের শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করার মাধ্যমে এবং জন্মগত সংস্কার ভালো হওয়ার কারণে, আমার এই ক্লাসে তাদের শারীরিক অসুস্থতা দূর হয়ে যেতে পারে। তারা চি-এর স্তর পার করে দুগ্ধ-শুভ্র শারীরিক অবস্থায় প্রবেশ করতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে ফালুন স্থাপন করা যেতে পারে। অনেক লোকের শরীর বেশ খারাপ থাকে, নিরন্তর তাদের শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করা হতে থাকে। শরীরের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-বিধান না করা হলে ফালুনকে কি ভাবে স্থাপন করা সম্ভব? এটা শুধু অল্পসংখ্যক লোকের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। দুশ্চিন্তা করবে না, আমি ইতিমধ্যেই শক্তির যন্ত্রকৌশল স্থাপন করেছি যা ফালুন তৈরি করতে পারবে।

প্রশ্ন: *ফালুন কীভাবে বহন করা হয়?*

উত্তর: ফালুন বহন করতে হয় না। আমি ফালুন পাঠিয়ে দিয়ে তোমাদের শরীরের তলপেটে স্থাপন করে দিই। এটা আমাদের এই বস্তুগত মাত্রাতে থাকে না, অন্য মাত্রাতে থাকে। তোমার তলপেটে খাদ্যনালি আছে, যদি এটাও এই মাত্রায় থাকে এবং ঘুরতে শুরু করে তাহলে কি ঘটতে পারে? এটা অন্য একটা বস্তুগত মাত্রায় থাকে, এবং এই মাত্রার সঙ্গে এর কোন দ্বন্দ্ব নেই।

প্রশ্ন: *পরবর্তী ক্লাসগুলোতে ফালুন দেওয়াটা চলতে থাকবে কি?*

উত্তর: তুমি শুধু একটাই পাবে। কিছু লোক অনেকগুলো ফালুনের আবর্তন অনুভব করতে পারে, সেগুলো সব বাইরে ব্যবহৃত হয় এবং তোমার শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করার জন্য ব্যবহৃত হয়। আমাদের এই শারীরিক

ক্রিয়ায় সবথেকে বড়ো বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, যখন শক্তি নির্গত হতে থাকে, তখন অনেক ফালুন পর পর বের হতে থাকে সেইজন্য এমন কি ক্রিয়া শুরু করার পূর্বেই অনেকগুলো ফালুন তোমার শরীরের মধ্যে ঘুরতে থাকে এবং শরীরের সবকিছু ঠিকঠাক করতে থাকে। যে ফালুনটা আমি তোমাকে সত্যি সত্যি দিয়েছি সেটা তলপেটের জায়গায় থাকে।

প্রশ্ন; *অনুশীলন করা বন্ধ করলে, ফালুন কি অন্তর্হিত হয়ে যাবে? ফালুন কত সময় ধরে আমার শরীরে থাকবে?*

উত্তর: যতদিন তুমি নিজেকে একজন সাধক হিসাবে দেখবে এবং আমার বলা চরিত্রের আবশ্যকতাগুলি মেনে চলবে, সে ক্ষেত্রে অনুশীলন না করলেও, এটা অন্তর্হিত তো হবেই না পরিবর্তে আরও শক্তিশালী হবে এবং তোমার গোংগ সামর্থ্যের বৃদ্ধি ঘটবে। কিন্ত বিপরীত দিকে তুমি যদি ক্রিয়াগুলি অন্য লোকের থেকে বেশী নিষ্ঠার সঙ্গে কর, অথচ আমার বলা চরিত্রের আবশ্যকতা অনুযায়ী আচরণ না কর, আমার আশঙ্কা হয় যে তোমার অনুশীলন ব্যর্থ হবে। যদিও তুমি ক্রিয়া করছ কিন্তু ফলপ্রসূ হবে না। তুমি যে প্রণালীতেই অনুশীলন কর না কেন তুমি যদি তার আবশ্যিক শর্তগুলি না মেনে চল, তাহলে তুমি সম্ভবত অশুভ পথে সাধনা করছ। তোমার মনের মধ্যে যদি সর্বদা খারাপ জিনিস থাকে এবং তুমি এইরকম চিন্তা করছ: ‘‘অমুক এতো খারাপ লোক, আমি একবার অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হলে ওকে দেখে নেব।’’ এমন কি তুমি ফালুন গোংগ শিখলেও, যখন তুমি ক্রিয়া করার সময়ে এই সমস্ত জিনিস যোগ করছ এবং আমার বলা চরিত্রের আবশ্যিক শর্তগুলো পালন করছ না তাহলে এটা কি অশুভ পদ্ধতির অনুশীলন করা হল না?

প্রশ্ন: *মাস্টার প্রায়ই বলেন, ‘‘এমন কি একশ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করলেও ফালুন পাবে না,’’ এর অর্থটা কি?*

উত্তর: অর্থাৎ এটি অত্যন্ত মূল্যবান। আমি তোমাদের শুধু মাত্র একটা ফালুন দিয়েছি, তা নয়। আমি অন্য আরও কিছু জিনিস দিয়েছি যেগুলো তোমার সাধনাকে নিশ্চিত করবে এবং মহামূল্যবান। যত টাকাই দাও না তা দিয়ে উপরের কোন জিনিসই পাওয়া যাবে না।

প্রশ্ন: *যে সব লোকেরা দেরি করে আসছে তারা কি ফালুন প্রাপ্ত হবে?*

উত্তর: শুধু যদি শেষ তিন দিনের পূর্বে তুমি আস তাহলে তোমার শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করার পরে ফালুন এবং অন্যান্য বহু জিনিস স্থাপন করা হবে। তুমি যদি শেষ তিনদিনে আস তাহলে ব্যাপারটা বলা মুশকিল। কিন্তু তোমার শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করা হবে। জিনিসগুলি স্থাপন করা খুবই কঠিন। যদি তোমার অবস্থা অনুকূল হয় তাহলে এগুলোকে তোমার শরীরে স্থাপন করা হবে।

প্রশ্ন: *শুধু কি ফালুনের দ্বারাই মানবশরীরের ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা সংশোধন করা হয়?*

উত্তর: সম্পূর্ণ সংশোধনটা ফালুন দ্বারা করা হয় না। মাস্টার সংশোধনের জন্য আরও অনেক পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকেন।

প্রশ্ন: *ফালুন গোংগ সৃষ্টির প্রাগৈতিহাসিক পটভূমিকা কি?*

উত্তর: আমার মনে হয় প্রশ্নটা খুবই বিরাট এবং বেশ উঁচুস্তরের এবং আমাদের এই স্তরের জ্ঞানের যে অধিকার এটা তার সীমা ছাড়িয়ে যায়, আমি এটা এখানে আলোচনা করতে পারব না। তবে এটুকু তোমাদের অবশ্যই জানা দরকার যে এটা বৌদ্ধধর্মের চিগোংগ নয়। এটা বুদ্ধমতের চিগোংগ, এটা বৌদ্ধধর্ম নয়। কিন্তু আমাদের এবং বৌদ্ধধর্মের উদ্দেশ্যটা একই, শুধু সাধনার পদ্ধতিটা আলাদা এবং এগোনোর পথটাও আলাদা। আমাদের লক্ষ্য একই।

প্রশ্ন: *ফালুন গোংগ-এর ইতিহাস কতটা পুরানো?*

উত্তর: আমি যে পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছি এবং আমি যে পদ্ধতি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করছি এই দুটো পদ্ধতি সম্পূর্ণ এক নয়। আমি যে ফালুনের সাধনা করেছি সেটা, আমি যে ফালুনের প্রচার করছি তার তুলনায় আরও বেশী ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল। এছাড়া এখনকার এই প্রণালীর তুলনায় আমার গোংগ আরও অনেক দ্রুত বিকশিত হয়েছিল। তৎসত্ত্বেও আমি যে সাধন প্রণালী জনগণের মধ্যে প্রচার করছি সেটাতেও গোংগ বেশ তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেইজন্য সাধকের চরিত্রের জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি, সাধারণ পদ্ধতিগুলোর তুলনায় আরও উঁচু এবং কঠোর। আমি জিনিসগুলোকে পুর্নবিন্যাস করে তারপরে জনগণের মধ্যে প্রচার করেছি

এবং এর আবশ্যকতাও আমার নিজের শেখা পদ্ধতির তুলনায় কম কঠোর, কিন্তু একটা সাধারণ সাধনা পদ্ধতির তুলনায় কঠোর। যেহেতু এটা মূল পদ্ধতির থেকে আলাদা, সেইজন্য আমিই এর প্রতিষ্ঠাতা। ফালুন গোংগ-এর ইতিহাস কত কাল ধরে চলে আসছে সেই প্রশ্নে, জনগণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার পূর্বের বছরগুলোকে বাদ দিলে বলা যায় যে, এটা শুরু হয়েছিল 1992 খৃষ্টাব্দের মে মাসে, চীনের উত্তরপূর্ব অঞ্চল থেকে আমি এর প্রচার শুরু করেছিলাম।

প্রশ্ন: *আমরা যখন আপনার বক্তৃতা শুনছি, সেই সময়ে মাস্টার আমাদের কি প্রদান করছেন?*

উত্তর: আমি সবাইকে ফালুন প্রদান করি, একটা ফালুন সাধনার জন্য এবং অন্য সব ফালুন শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করার জন্য। একই সাথে আমার ফা-শরীর তোমার প্রতি এবং তোমাদের প্রত্যেকের প্রতি ততক্ষণই খেয়াল রাখবে, যতক্ষণ তোমরা ফালুন গোংগ-এর সাধনা করতে থাকবে। তুমি সাধনা না করলে ফা-শরীর স্বাভাবিকভাবেই তোমার প্রতি নজর দেবে না। এমন কি তাকে বলা হলেও সে যাবে না। আমার ফা-শরীর স্পষ্টভাবে এবং সঠিকভাবে জানতে পারে যে তুমি কি চিন্তা করছ।

প্রশ্ন: *ফালুন গোংগের সাধনার দ্বারা আমি নিজে সঠিক ফল প্রাপ্ত করতে পারব কি?*

উত্তর: দাফা সীমাহীন। এমন কি তুমি যদি সাধনা করে তথাগত স্তরেও পৌঁছে যাও, সেটাই শেষ নয়, আমাদের এটা সৎ পথের সাধনা, তুমি সাধনা করতে থাক! সঠিক ফল প্রাপ্ত হবে।

2. অনুশীলনের তত্ত্ব এবং পদ্ধতি

প্রশ্ন: *মহান ঐশ্বরিক প্রদক্ষিণ পথ ক্রিয়া সমাপ্ত করে বাড়িতে যাওয়ার পরে কিছু লোক স্বপ্নের মধ্যে খুব স্পষ্টভাবে দেখেছে যে তারা আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। এই ব্যাপারটা কি?*

উত্তর: আমি তোমাদের বলব যে যখন এই সমস্ত অবস্থা, বসে ধ্যান করার সময়ে এবং স্বপ্নের মধ্যে ঘটে, সেগুলো স্বপ্ন নয়। তোমার মূল আত্মা তোমার এই ভৌতিক শরীরটা ছেড়ে বাইরে গেলে এই রকম হয়, যা স্বপ্নের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। স্বপ্নে কোন জিনিসকে এত স্পষ্টভাবে এবং এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখা যায় না। কিন্তু যখন তোমার মূল আত্মা শরীরটা ছেড়ে বাইরে যায়, তখন যা কিছু দেখতে পাও, এমন কি কীভাবে ভেসে যাচ্ছ, এ সবই খুব বাস্তবিক ভাবে দেখা যায় এবং খুব স্পষ্টভাবে স্মরণ করা যায়।

প্রশ্ন: *ফালুন বিকৃত হয়ে গেলে কি খারাপ পরিণাম হতে পারে?*

উত্তর : এর তাৎপর্য হচ্ছে, ব্যক্তি বিপথে চলে গিয়েছে এবং ফালুন তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে। এছাড়া এটা তোমার সাধনার সময়ে অনেক সমস্যা নিয়ে আসবে, এটা ঠিক যেন বড়ো রাস্তায় না গিয়ে পাশের গলিতে গিয়ে হারিয়ে গেছ এবং রাস্তা খুঁজে পাচ্ছ না। তুমি সমস্যার সম্মুখীন হবে এবং সেসব জিনিস প্রাত্যহিক জীবন যাত্রার মধ্যে প্রকটিত হবে।

প্রশ্ন: *যখন নিজে নিজে অনুশীলন করব, বাড়ির পরিবেশকে কীভাবে সামলাব, বাড়িতে ফালুন থাকতে পারে কি?*

উত্তর: যারা এখানে বসে আছ, তাদের অনেকেই তাদের বাড়িতে ফালুনের অস্তিত্ব দেখতে পেয়েছ, পরিবারের লোকেরাও এর থেকে উপকার পেতে শুরু করেছে। আমরা বলেছি যে একই সময়ে একই জায়গায় অনেক মাত্রার অস্তিত্ব রয়েছে, তোমার বাড়িটা কোন ব্যতিক্রম নয়, এর ব্যবস্থা করতে হবে। এটা সাধারণত যে উপায়ে সামলানো হয় সেটা হচ্ছে সমস্ত খারাপ জিনিস দূর করা হয় এবং তারপরে একটা সুরক্ষা-ফলক স্থাপন করা হয়, যাতে কোন খারাপ জিনিস আর বাড়িতে প্রবেশ করতে না পারে।

প্রশ্ন: *ক্রিয়া করার সময়ে চি যখন রোগগ্রস্ত স্থানে আঘাত করে তখন ব্যথা বোধ হয় এবং জায়গাটা ফুলে ওঠে? কেন এই রকম হয়?*

উত্তর : রোগ একধরনের কালো শক্তির সমাহার। ক্লাসের প্রারম্ভিক পর্বে আমরা একে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করার পরে রোগগ্রস্ত স্থানটা ফুলে

উঠেছে বোধ হয়, এর মূলটা তখন হারিয়ে যায় এবং বাইরে নির্গত হতে শুরু করে। এটা খুব শীঘ্রই বের হয়ে যায় এবং তখন রোগের অস্তিত্বই থাকে না।

প্রশ্ন: *আমার পুরানো রোগগুলো কয়েকদিন ক্লাস করার পরেই দূর হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কয়েকদিন পরে পুনরায় হঠাৎ করে উদয় হয়েছে। কেন এইরকম হল?*

উত্তর: যেহেতু আমাদের সাধনা পদ্ধতিতে উন্নতিলাভ অত্যন্ত দ্রুত হয়ে থাকে এবং একটা স্তর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পার হয়ে যায়, এমন কি তুমি লক্ষ্যও কর নি, প্রকৃতপক্ষে তোমার রোগটকে ইতিমধ্যেই নিরাময় করা হয়ে গেছে। পরবর্তীকালের লক্ষণগুলি হচ্ছে আমি যে রকম আলোচনা করছিলাম, সেটা হচ্ছে ‘‘দুঃখদুর্দশাগুলোর’’-র আবির্ভাব হওয়া। মনোযোগ দিয়ে অনুভব করলে এবং লক্ষ্য করলে দেখবে যে এগুলো তোমার পুরানো রোগের লক্ষণগুলির মতো একই রকম নয়। তুমি যদি অন্য চিগোংগ মাস্টারদের কাছে এটা ঠিক করতে যাও, তারাও কিছু করতে পারবে না। কারণ এটা হচ্ছে তোমার গোংগের বৃদ্ধির সময়ে তোমার কর্মের অভিব্যক্তি।

প্রশ্ন: *সাধনার সময়ে ওষুধ খেতে পারব কি পারব না?*

উত্তর: এই বিষয়টা তুমি নিজেই উপলব্ধি কর। সাধনার সময়ে ওষুধ গ্রহণ করার অর্থ সাধনার দ্বারা রোগ নিরাময় করার ক্ষমতাকে বিশ্বাস না করা। তুমি যদি বিশ্বাসই কর তাহলে তুমি কেন ওষুধ গ্রহণ করবে? কিন্তু তুমি যদি নিজের চরিত্রের আদর্শ বজায় রাখতে না পার, তাহলে একবার সমস্যার সৃষ্টি হলেই তুমি বলবে যে তোমাকে লি হোংগ জি ওষুধ খেতে বারণ করেছেন, কিন্তু লি হোংগ জি তোমাকে কঠোরভাবে চরিত্রের আদর্শ বজায় রাখতেও বলেছেন। তুমি কি সেটা করেছিলে? সত্যিকারের দাফা সাধকের শরীরে সাধারণ লোকেদের জিনিস থাকে না। সাধারণ লোকেদের যে সমস্ত রোগ হয়ে থাকে, সেসব কখনোই তোমার শরীরে হতে দেওয়া যাবে না। তুমি যদি তোমার চিন্তাগুলোকে সৎ রাখতে পার এবং সাধনার দ্বারা রোগ নিরাময় করার ক্ষমতাকে বিশ্বাস কর, তাহলে এটা নিয়ে কোনও চিন্তা করবে না, এবং কোন চিকিৎসাও করাবে না, তখন স্বাভাবিকভাবেই কেউ একজন তোমার রোগ নিরাময় করে দেবে। এখানে একটার পর

একটা দিন কেটে যাচ্ছে, আর তোমরা আরও ভালো বোধ করছ এবং আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছ। এটা কি ভাবে হচ্ছে? আমার ফা-শরীরগুলো ব্যস্ততার সঙ্গে তোমাদের অনেকের শরীরের ভেতরে এবং বাইরে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে, তারা এই জিনিসগুলোতে তোমাদের সাহায্য করে যাচ্ছে। যখন সাধনা করছ তখন যদি তুমি মনের ভিতরটা দৃঢ় না কর, যদি অবিশ্বাসের মনোভাব অথবা ''চেষ্টা করে দেখি'' এই ধরনের মনোভাব গ্রহণ কর, তাহলে তুমি কোনও কিছুই পাবে না। তুমি বুদ্ধকে বিশ্বাস করবে কি করবে না সেটা তোমার আলোকপ্রাপ্তির গুণ এবং জন্মগত সংস্কারের দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। যদি কোন বুদ্ধ আবির্ভূত হন এবং মানব চক্ষু দ্বারা তাঁকে পরিষ্কার দেখা যায়, তাহলে প্রত্যেকেই বৌদ্ধধর্ম শিখতে যাবে। সেক্ষেত্রে তোমার চিন্তার রূপান্তরের বিষয়টা আর থাকবে না। তোমাকে প্রথমে বিশ্বাসটা করতে হবে, একমাত্র তাহলেই তুমি ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে পারবে।

প্রশ্ন: *কিছু লোক মাস্টারকে এবং মাস্টারের শিষ্যদের আমন্ত্রণ করতে চায় রোগ নিরাময় করার জন্য। এটা কি সম্ভব?*

উত্তর: আমি জনগণের মধ্যে রোগ সারানোর উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি। যেখানে মানুষ থাকবে সেখানেই রোগ থাকবে। কিছু লোক আমার বক্তব্যগুলো ঠিক বুঝতেই পারে না, আমি ব্যাখ্যাটা আরও বেশী করে আর করব না। বুদ্ধমতের সাধনায় সমস্ত জীবের উদ্ধারের কথা বলা হয়, অতএব লোকেদের রোগ নিরাময় করা যায়। আমরা যখন অন্যদের রোগের চিকিৎসা করি, সেখানে সংগঠিত করা এবং প্রচারের একটা ব্যাপার থাকে। কারণ আমি সবে মাত্র জনগণের মধ্যে এসেছি এবং আমি সুপরিচিত নই, কেউ আমাকে চেনে না।, এবং সম্ভবত আমার বক্তৃতা শুনতেও কেউ আসবে না। পরামর্শ দিয়ে রোগ নিরাময়ের মাধ্যমে ফালুন গোংগ-এর ব্যাপারটা লোকেদের দেখানো সম্ভব হয়েছে, বস্তুত এইভাবে প্রচারের ফল খুবই ভালো হয়েছে, রোগ নিরাময়ের বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এটা করিনি। পেশাগত ভাবে শক্তিশালী গোংগ-এর দ্বারা রোগ নিরাময় করার ব্যাপারে নিষেধ আছে। পৃথিবীর নিয়মাবলির জায়গায় পৃথিবীর বাইরের নিয়মাবলি চালু করা ঠিক নয়। এই ধরনের পরিস্থিতি কাম্য নয় এবং এইভাবে রোগের নিরাময় করার পরিণামও ভালো হয় না। সাধনার শিক্ষার্থীদের প্রতি দায়িত্বশীল হওয়ার জন্য আমরা অবশ্যই তোমার শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করে তোমাকে রোগ মুক্ত করব, একমাত্র তবেই

তুমি উচ্চস্তরে সাধনা করতে পারবে। যদি তুমি সর্বদা তোমার রোগ নিয়ে চিন্তা কর এবং মূলত সাধনা করতে না চাও, সেক্ষেত্রে যদিও তুমি মুখে কিছু বলছ না, কিন্তু আমার ফা-শরীর তোমার সব চিন্তাগুলো পরিষ্কার ভাবে জানতে পারে, শেষে তুমি কিছুই পাবে না। ক্লাস চলাকালীন, আমরা ইতিমধ্যেই তোমাদের শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করে দিয়েছি। অবশ্য এর জন্য তোমাকে প্রথমে একজন সাধক হতে হবে। আমি তোমার রোগের চিকিৎসা শুরু করার পরে বক্তৃতা-ক্রমের মাঝে তোমার কাছে আরও টাকা চাইব----এইরকম আমরা করি না। যদি এখনও তোমার রোগের নিরাময় না হয়ে থাকে তাহলে সেটা তোমার আলোকপ্রাপ্তির গুণ-এর বিষয়। অবশ্য যাদের রোগটা খুব গুরুতর তাদের আমরা বাদ দিই না। প্রতিক্রিয়াটা হয়তো তোমার শরীরে প্রকটিত হয় নি, কিন্তু সেগুলো বস্তুত খুবই সাংঘাতিক এবং খুবই প্রবল। সম্ভবত একবার সামঞ্জস্যবিধান করাতে রোগটা পুরো ঠিক হয় নি, তবে আমরা ইতিমধ্যে যথাসাধ্য করেছি। এটা এরকম নয় যে তোমার প্রতি আমাদের কোন দায়িত্ব নেই, প্রকৃতপক্ষে রোগটা খুবই গুরুতর, যখন তুমি বাড়িতে ফিরে গিয়ে সাধনা করতে থাকবে, আমরা সর্বদা তোমার রোগ নিরাময় করতে থাকব, যতক্ষণ না তোমার রোগের সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। এই ধরনের পরিস্থিতি কমই হয়।

প্রশ্ন: *ক্রিয়া করার সময়ে কীভাবে শান্তভাব-এর মধ্যে প্রবেশ করব? ক্রিয়া করার সময়ে কর্মক্ষেত্রের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করাটা কি আসক্তি?*

উত্তর: ব্যক্তিগত স্বার্থের ব্যাপারগুলোকে নিস্পৃহভাবে দেখবে। মনের মধ্যে সাধারণভাবে একটা শান্তভাব বজায় রাখবে। তুমি যদি নিজে প্রস্তুত থাক, যদি আগেই জানতে পার যে দুর্ভোগ কখন আসবে, এবং দুর্ভোগটা কিরকম, তাহলে সেটা আর দুর্ভোগ হিসাবে গণ্য হবে না। দুর্ভোগগুলো সাধারণত হঠাৎ করেই আসে, তুমি যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও তাহলে নিশ্চিতভাবে এগুলোকে অতিক্রম করতে পারবে। এইভাবেই তোমার চরিত্র কতটা উঁচু, সেটা মূল্যায়ন করা যাবে। একবার তোমার আসক্তিগুলো দূর হয়ে যাবার পরে, তোমার চরিত্রের উন্নতি ঘটবে, তুমি আর অন্যদের সাথে লড়াই এবং সংগ্রাম করবে না। তোমার মন থেকে বিদ্বেষ এবং অসন্তোষের ভাব দূর হয়ে যাবে, তোমার চিন্তা বিভ্রান্তিকর হবে না, তখন তুমি শান্ত হওয়ার ক্ষমতার কথা বলতে পার। তুমি যদি এর পরেও শান্ত হতে না পার, তখন তুমি নিজেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি মনে করবে, চিন্তাগুলোকে তোমার নিজের নয় মনে করবে। চিন্তাগুলি যত বিচিত্র রকমেরই হোক না কেন,

তুমি সেগুলোর থেকে বেরিয়ে এসে চিন্তাগুলোকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে দাও। আরও কিছু লোক আছে যারা বুদ্ধের নাম জপ করার জন্য অথবা সংখ্যা গণনা করার জন্য পরামর্শ দিয়ে থাকে। এ সবই বিভিন্ন ধরনের কৌশলের অনুশীলন। যখন আমরা ক্রিয়া করি তখন আমরা চিন্তাকে কোন কিছুর প্রতি নিবদ্ধ করি না। কিন্তু তোমার এটা জানা দরকার যে তুমিই অনুশীলন করছ। কর্মস্থলে সমস্যার যে সব ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বার্থ জড়িয়ে নেই অথবা কোন আসক্তির ব্যাপার নেই, সেগুলো ভালো জিনিস। আমি একজন বৌদ্ধভিক্ষুর কথা জানি যিনি সাধনার এই দিকের জিনিসগুলো জানতেন। তিনি একটা মঠের অধ্যক্ষ ছিলেন এবং তাঁর অনেক কর্তব্য ছিল কিন্তু যখন তিনি ধ্যানে বসতেন, তিনি নিজেকে ওই সব জিনিস থেকে আলাদা করে ফেলতেন। এটা নিশ্চিত যে তিনি আর ওই সব জিনিস চিন্তা করতেন না। এটা একটা ক্ষমতা, তুমি যখন সত্যি সত্যি ক্রিয়া করছ তখন মনের মধ্যে কোন চিন্তাই রাখবে না। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ধারণা জাত চিন্তার লেশ মাত্র রাখবে না। তুমি যদি ব্যক্তিগত জিনিসগুলোকে কর্মস্থলের কাজের সঙ্গে না মেলাও, তাহলে তুমি এখনও ভালোভাবে কাজ করতে পারবে।

প্রশ্ন: *ক্রিয়া করার সময়ে খারাপ চিন্তার উদয় হলে কি করা উচিৎ?*

উত্তর: ক্রিয়া করার সময়ে অনেক খারাপ চিন্তার উদয় হতে পারে। তুমি সবে সাধনা শুরু করেছ, এই মুহূর্তে খুব উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব; এখনই আমরা তোমার উপরে খুব উঁচু আবশ্যকীয় শর্তাদি চাপিয়ে দেব না। যদি বলি, একটুও খারাপ চিন্তা মনের মধ্যে আসতে দেবে না, তাহলে সেটা অবাস্তব ব্যাপার। কারণ ধীরে ধীরে এটা সম্পন্ন হবে, শুরুতে এইরকম ঠিকই আছে, কিন্তু মনটাকে ছেড়ে দেবে না, কিছু সময় কেটে গেলে তোমার মন উন্নত হয়ে যাবে, নিজেকে উঁচু আদর্শ অনুযায়ী ধরে রাখতে পারবে, যেহেতু তুমি মহান পথ (দাফা)-এর সাধনা করছ। এই বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরে তুমি আর সাধারণ মানুষ থাকবে না। যে সব জিনিস তুমি শরীরে বহন করছ, সেগুলি এতই অনুপম যে তোমার চরিত্রের আবশ্যকতাগুলিও তখন কঠোর হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: *ক্রিয়া করার সময়ে মনে হয় মাথা এবং তলপেট ঘুরছে এবং বুকের জায়গায় অস্বস্তি বোধ হয়।*

উত্তর: ফালুন ঘোরার জন্য শুরুতে এই রকম হতে পারে। পরবর্তীকালে সম্ভবত এই লক্ষণগুলি আর থাকবে না।

প্রশ্ন: *ক্রিয়া করার সময়ে ছোট প্রাণী আকর্ষিত হয়ে এলে কি করব?*

উত্তর: যে কোন সাধনার অনুশীলনেই ছোট প্রাণীরা আকর্ষিত হতে পারে। কোন গুরুত্ব দেবে না তাহলেই ঠিক আছে। যেহেতু এটা একটা অনুকূল শক্তিক্ষেত্র, বিশেষ করে বুদ্ধমতের চিগোংগ-এ গোংগ-এর মধ্যে যে সব উপাদান আছে, তা সমস্ত জীবকে সাহায্য করে। যখন আমাদের ফালুন ঘড়ির কাঁটার অনুযায়ী ঘোরে তখন আমরা নিজেরা উপকৃত হই এবং যখন ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘোরে তখন অন্যরা উপকৃত হয়। তখন এটা আবার পিছন দিকে ঘুরতে থাকে, সেইজন্য আমাদের চারিদিকের সবকিছুই এর দ্বারা উপকৃত হয়।

প্রশ্ন: *বিশ্বের দুই প্রান্তভেদ ক্রিয়ার ক্ষেত্রে হাতটাকে একবার উঠিয়ে নামিয়ে আনাকে একবার ধরা হয় কি? বুদ্ধ সহস্রহস্ত প্রসারণ ক্রিয়া করার সময়ে হাত দুটো প্রসারিত করার পূর্বে নিজেকে খুব বিশাল এবং লম্বা মনে করব কি?*

উত্তর: প্রত্যেকটা হাত একবার উপরে উঠে নীচে নামলে সেটাকে একবার করেই গোনা হয়। বুদ্ধ সহস্রহস্ত প্রসারণ ক্রিয়ার সময়ে নিজের সম্বন্ধে চিন্তা করবে না। তুমি স্বাভাবিক ভাবেই নিজেকে বিশাল এবং লম্বা মনে করবে। তোমার শুধু এইটুকু বোধ থাকবে যে স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যে তুমিই সবথেকে বৃহৎ সত্তা এবং শুধু ওখানে দাঁড়িয়ে থাকাটাই যথেষ্ট। জেনে বুঝে সব সময়ে এই বোধটার পেছনে ছুটবে না, তাহলে সেটা একটা আসক্তি।

প্রশ্ন: *ধ্যান করার সময়ে যদি পদ্মাসনের মতো পা দুটো আড়াআড়িভাবে ভাঁজ করে বসতে না পারি তাহলে কি করব?*

উত্তর: তুমি যদি পদ্মাসনে বসতে না পার, তাহলে একটা চেয়ারের ধারে বসেও ধ্যান করতে পার ফল একই হবে। কিন্তু তুমি একজন সাধক, তুমি অবশ্যই অনুশীলনের মাধ্যমে একটার ওপরে আর একটা পা আড়াআড়ি ভাবে ভাঁজ করে রাখতে পারবে। তুমি একটা চেয়ারের ধারে বস এবং পা

দুটোকে আড়াআড়ি ভাবে ভাঁজ করে রাখার চর্চ্চা কর এবং শেষে তুমি অবশ্যই পদ্মাসন করতে পারবে।

প্রশ্ন: *যদি পরিবারের লোকেরা খারাপ কাজ করে এবং সত্য-করুণা-সহনশীলতা না মেনে চলে তাহলে কি করব?*

উত্তর: তোমার পরিবারের লোকেরা যদি ফালুন গোংগ-এর অনুশীলন না করে, সেটা কোনও সমস্যা নয়, প্রধান বিষয় হচ্ছে তোমার নিজের সাধনা, তুমি নিজে সাধনা করে যাও, চিন্তাটাকে খুব জটিল করবে না। অন্যদের সঙ্গে সহজভাবে চলবে, নিজের উপরেই চেষ্টাটা বেশী করে ব্যয় করবে।

প্রশ্ন: *প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় কোনও কোনও সময়ে আমি ভুল কাজ করি এবং পরে অনুতপ্ত হই, কিন্তু পরে আবার একই ব্যাপার পুনরায় ঘটে। আমার চরিত্র খুব নীচু হওয়ার জন্য এটা ঘটছে কি?*

উত্তর: যেহেতু তুমি এটা প্রশ্নের মধ্যে লিখে জানাচ্ছ। এটাই প্রমাণ করছে যে, তোমার চরিত্র ইতিমধ্যেই উন্নত হয়ে গেছে এবং তুমি তোমার ভুলগুলো স্বীকার করতে পারছ। সাধারণ লোকেরা ভুল কাজ করলে স্বীকারই করতে চায় না। এর অর্থ, তুমি ইতিমধ্যেই সাধারণ লোকেদের অতিক্রম করে গেছ। তুমি প্রথমবার ভুল করেছ এবং তোমার চরিত্র বজায় রাখতে পার নি, এটা একটা প্রক্রিয়া, এর পরের বার আবার যখন সমস্যার সম্মুখীন হবে তখন আবার উন্নতির চেষ্টা করবে।

প্রশ্ন: *চল্লিশ অথবা পঞ্চাশ বছর বয়সের লোকেরা ''তিনটে ফুলের মাথার উপরে একত্রিত হওয়া'' অবস্থায় পৌঁছাতে পারবে কি?*

উত্তর: যেহেতু আমরা শরীর ও মনের যুগ্ম সাধনা করি, সেইজন্য বয়স কম না বেশী সেটা কোন ব্যাপার নয়। যদি তুমি একমনে অনুশীলন করতে থাক এবং আমার উপদেশ অনুযায়ী চরিত্রের আবশ্যকতাগুলি মেনে চলতে থাক, তাহলে তোমার সাধনার সঙ্গে সঙ্গে নিরন্তর তোমার আয়ু বর্ধিত হতে থাকবে। তাহলে এই সময়টা কি সাধনার জন্য যথেষ্ট হয়ে গেল না? কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে বিশেষত মন ও শরীরের যুগ্ম সাধনার ক্ষেত্রে, তোমার জীবনের এই বর্ধিত সময়ে, যদি তোমার চরিত্রে সমস্যার উদ্ভব হয়, তাহলে তোমার জীবনে বিপদ ঘনিয়ে আসবে। যেহেতু

তোমার জীবন সাধনা করার উদ্দেশ্য বর্ধিত করা হয়েছে, সেইজন্য তোমার চরিত্র একবার বিপথগামী হলে, সেই মুহূর্তে তোমার জীবনটা বিপদে পড়বে।

প্রশ্ন: *হাতের মুঠিতে বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে ''নমনীয়তার মধ্যে কাঠিন্য'' বলতে ঠিক কতটা শক্তিকে বোঝাচ্ছে?*

উত্তর: এটা তোমাকে নিজেকেই খুঁজে বার করতে হবে। যেমন, যখন আমরা বৃহৎ হস্ত মুদ্রা করি তখন হাত দুটোকে দেখতে খুব নমনীয় মনে হয় কিন্তু মুদ্রাগুলি করার সময়ে বাস্তবে বলপ্রয়োগ করতে হয়। অগ্রবাহু ও হাতের কব্জির মধ্যে, আঙ্গুলগুলোর মধ্যে অনেক শক্তির প্রয়োগ করতে হয়। যেহেতু দেখতে খুব নমনীয়, এবং বাস্তবে শক্তিটা বেশ প্রবল, সেইজন্য বলা হয় ''নমনীয়তার মধ্যে কাঠিন্য'' আমি তোমাদের জন্য হস্তমুদ্রা প্রদর্শন করার সময়ে সেটা তোমাদের ইতিমধ্যেই প্রদান করেছি। ধীরে ধীরে তোমরা অনুশীলনের সময়ে সেটা অনুভব করতে পারবে।

প্রশ্ন: *পুরুষ এবং নারীর মধ্যে কামজ সম্পর্কের কি কোনও প্রয়োজন নেই? কম বয়সের লোকেদের কি বিবাহবিচ্ছেদ করা উচিৎ?*

উত্তর: কাম-এর ব্যাপারে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। তোমাদের বর্তমান স্তরে ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুণী হতে বলা হচ্ছে না, কিন্তু তোমরা নিজেরাই এসব হতে চাইছ। মূল ব্যাপারটা হচ্ছে তোমার কামজ আসক্তিটাকে পরিত্যাগ করতে হবে। তুমি যে সব আসক্তি ছাড়তে চাও না সে সবই পরিত্যাগ করতে হবে। সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে এটা এক ধরনের বাসনা। কিন্তু সাধক হিসাবে আমাদেরকে এটা ত্যাগ করতে হবে, এটাকে নিস্পৃহভাব দেখতে হবে। কিছু লোক ঠিক এর পিছনেই ছুটে বেড়ায়, তাদের মাথার মধ্যে এই সব জিনিস ঢুকে আছে, যা এমন কি সাধারণ লোকেদের ক্ষেত্রেও খুব অতিরিক্ত মনে হবে। একজন সাধকের ক্ষেত্রে এটা আরও অনুচিৎ। যেহেতু তুমি সাধক এবং তোমার পরিবারের লোকেরা সাধনা করে না, সেইজন্য এখনকার অবস্থায় স্বাভাবিক জীবনযাপন বজায় রাখ। যখন তুমি উঁচুস্তরে পৌঁছে যাবে তখন তুমি নিজেই জানতে পারবে যে তোমার কি করা উচিৎ।

প্রশ্ন: *বসে ধ্যান করার সময়ে ঘুমিয়ে পড়লে সেটা কি ঠিক? কখনো কখনো আমি তিন মিনিট পর্যন্ত বেঁহুশ হয়ে যাই, কেন এই রকম হচ্ছে, বুঝতে পারছি না?*

উত্তর: ঘুমিয়ে পড়াটা ঠিক নয়, ধ্যানের সময়ে ঘুমানো যায় কি? ধ্যানের সময়ে ঘুমানোটা এক ধরনের আসুরিক বাধা। তোমার বলা এই ধরনের বেহুঁশ অবস্থা হওয়া উচিৎ নয়, হয়তো তুমি প্রশ্নটা পরিষ্কার করে লেখনি। তিন মিনিট চেতনা না থাকাটা কোন হিসাবের মধ্যে আসে না। যে সব লোকেদের ডিংগ (ধ্যানাবস্থা যখন মন শূন্য অথচ সচেতন) অবস্থায় প্রবেশ করার ক্ষমতা খুব উঁচু, তাদের প্রায়ই অচেতন অবস্থার উদয় হয়, তবে অনেক সময় ধরে এই রকম চলতে থাকাটা ঠিক নয়।

প্রশ্ন: *এটা কি সত্যি যে কোন লোক স্থির সংকল্পের দ্বারা সঠিক ফল প্রাপ্তির জন্য সাধনা করলে সেটা প্রাপ্ত হবে? যদি জন্মগত সংস্কার নীচু হয়, তাহলে কি হবে ?*

উত্তর: এসব তোমার স্থির সংকল্প আছে কি নেই তার উপর নির্ভরশীল, মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে তোমার এই স্থির সংকল্পটা কতটা দৃঢ়। যাদের জন্মগত সংস্কার নীচু তাদের ক্ষেত্রে স্থির সংকল্প এবং আলোকপ্রাপ্তির গুণ-এর উপরে ব্যাপারটা নির্ভর করে।

প্রশ্ন: *সর্দি অথবা জ্বর হলে ক্রিয়া করতে পারব কি?*

উত্তর: আমি তোমাদের বলছি, যে এই বক্তৃতাটা শেষ হওয়ার পরে তোমাদের আর কখনোও রোগে আক্রান্ত হবে না, তোমরা সম্ভবত বিশ্বাস করবে না। আমার শিষ্যদের সময়ে সময়ে সর্দি বা জ্বরের মতো লক্ষণ দেখা যায়, সেটা হচ্ছে বাধা এবং দুর্ভোগ অতিক্রম করা, যার অর্থ তাদের উঁচুস্তরে ওঠার সময় হয়ে গেছে। তারা নিজেরা সেটা বুঝতে পারে এবং ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দেয় না, সেটা নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যায়।

প্রশ্ন: *গর্ভবতী মহিলারা কি ফালুন গোংগ অনুশীলন করতে পারে ?*

উত্তর: এটা কোন সমস্যা নয়, যেহেতু ফালুনকে অন্য একটি মাত্রাতে স্থাপন করা থাকে। আমাদের এই পদ্ধতিতে কোনও শ্রমসাধ্য শরীর

সঞ্চালনের ব্যাপার নেই, যা গর্ভবতী মহিলার উপরে খারাপ প্রভাব ফেলতে পারে। এটা তাদের শরীরের পক্ষে মঙ্গলদায়ক।

প্রশ্ন: *যখন মাস্টার আমাদের থেকে দূরে থাকেন, তখন কি কোনও মহাজাগতিক দূরত্বের ব্যাপার থাকে?*

উত্তর: অনেক লোকের এই রকম চিন্তাধারা আছে: ''মাস্টার বেজিংয়ে নেই, আমরা কি করব?'' এটা ঠিক যেন তোমার অন্য কোনও চিগোংগ পদ্ধতি অনুশীলন করার মত একটা ব্যাপার। মাস্টার তোমার প্রতি, দিনের পর দিন দৃষ্টি রাখতে পারবেন না, আমি তোমাকে ফা শিখিয়েছি, আমি তোমাকে তার নিয়মাবলিও শিখিয়েছি, তোমাকে ক্রিয়ার এই সংগ্রহগুলো শিখিয়েছি, এছাড়া সব জিনিসগুলোর একটা পুরো সেট তোমাকে দিয়েছি, তুমি কীভাবে সাধনা করবে সেটা তোমার নিজের উপরে নির্ভর করছে। তুমি এটা বলতে পার না যে আমি তোমার পাশে থাকলেই ব্যাপারটা নিশ্চিত আর দূরে থাকলে নিশ্চিত নয়। আমরা বৌদ্ধধর্মের শিষ্যদেরকে নিয়ে তোমাদের একটা উদাহরণ বলব। শাক্যমুনি দুই হাজারেরও বেশী বছর আগে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন, কিন্তু ওই শিষ্যরা কোনও রকম দ্বিতীয় চিন্তা না করে এক মনে এখনও সাধনাটা চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তুমি সাধনা করবে কি করবে না, সেটা তোমার নিজের বিষয়।

প্রশ্ন: *ফালুন গোংগ অনুশীলনের ফলে কি বিগু[73] (উপবাস) স্থিতি আসবে?*

উত্তর: না এটা হবে না, কারণ বিগু হচ্ছে মহান আদি তাও-মতের একটা সাধনা পদ্ধতি, যা বুদ্ধ-মত এবং তাও-মতেরও পূর্বে বিদ্যমান ছিল। এই পদ্ধতিটা সাধারণত একান্তবাস সাধনার অর্ন্তভূক্ত। সেই সময়ে যেহেতু কোন মঠসম্বন্ধীয় প্রণালীর প্রচলন ছিল না, সেইজন্য তারা সাধনার মাঝপথে পাহাড়ে চলে যেত, যেখানে কেউ খাবার পৌঁছে দিতে পারবে না। এই সময়ে, তারা একাকী সাধনা করত, ছয় মাস থেকে এক বৎসর স্থিরভাবে থাকার প্রয়োজন হতো, সেইজন্য তারা এই পদ্ধতিটা (বিগু) গ্রহণ করত। আজকে আমাদের এই সাধনায় বিগুর প্রয়োজন নেই। এই পদ্ধতিটা এক বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা হতো, এবং এটা কোনও অলৌকিক

---

[73]বিগু - উপবাস; খাদ্যশস্য ত্যাগ; খাদ্য এবং জল ত্যাগ।

ক্ষমতার ব্যাপার নয়। কিছু লোক এটা শেখায়। আমি বলব যদি গোটা পৃথিবীর সব মানুষের খাবারের প্রয়োজন না থাকে, সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সামাজিক পরিস্থিতির বিপর্যয় ঘটবে। তখন সমস্যার সৃষ্টি হবে। লোকেরা কেউ যদি কোন খাবার না খায় তাহলে সেটাকে কি মানব সমাজ বলে। সেটা হবে না এবং সেইরকম হতেও দেওয়া যাবে না।

প্রশ্ন: *এই পাঁচটি ক্রিয়ার সেট তোমাকে কোন্ স্তরে নিয়ে যাবে?*

উত্তর: এই পাঁচটা ক্রিয়ার সেটের মাধ্যমে আমরা খুব উঁচু স্তরে সাধনা করতে পারব, অবশ্য সময় এলে পরেই তুমি নিজেই জানতে পারবে যে তুমি কোন্ স্তরে সাধনা করতে চাও। যেহেতু আমাদের এই পদ্ধতির কোন শেষ নেই, তুমি যখন সত্যিই সেই জায়গায় পৌঁছে যাবে সেখানে তোমার জন্য আরও একটা পূর্বনির্ধারিত বন্দোবস্ত করা থাকবে এবং এমন কি আরও উঁচু স্তরের মহান পথ (দাফা) তুমি প্রাপ্ত হবে।

প্রশ্ন: *''ফা অনুশীলনকারীকে শোধন করছে'' অর্থাৎ ফালুন সর্বদা ঘোরার ফলে আমাদের কি ক্রিয়া না করলেও চলবে?*

উত্তর: ক্রিয়া করাটা মঠের সাধনার থেকে আলাদা, মঠে সাধনা করতে চাইলে বসে ধ্যান করতে হবে, সেটা একটা দক্ষতা তার জন্য অনুশীলনের প্রয়োজন। তুমি এটা বলতে পার না যে তুমি শুধু গোংগ বৃদ্ধি করতে চাইবে, আর এটা তোমার মাথার উপর কোন ক্রিয়া না করেই বৃদ্ধি পেতে থাকবে---তোমাকে কীভাবে অনুশীলনকারী বলা যাবে? প্রত্যেকটা সাধনা প্রণালীর মধ্যেই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হওয়া নিজস্ব জিনিসের একটা সেট থাকে যেগুলোকে বিকশিত করার জন্য ক্রিয়া করা প্রয়োজন।

প্রশ্ন: *অন্য পদ্ধতিতে সাধনা করা লোকেরা দাবি করে: ''যে সব পদ্ধতি মানসিক ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয় না সেগুলো সাধনার পথ নয়,'' এটা কি ঠিক?*

উত্তর: লোকেরা নানান ধরনের অনেক কথা বলে থাকে, কিন্তু কোন লোকই আমার মত মহান পথ(দাফা)-এর কথা বলে নি। বুদ্ধমতে বিশ্বাস করা হয় যে, যে সব সাধনা পদ্ধতি উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা হয় সেগুলো খুব উঁচুস্তরের নয়, সাধনা পদ্ধতিতে উদ্দেশ্য থাকলে সেটা সঞ্চালনকে ইঙ্গিত

করে না। ধ্যান করা এবং হাত দুটো একত্রিত করে জিয়েয়িন করাটাও সঞ্চালন সুতরাং সঞ্চালনের আকার এবং সংখ্যা, বেশী বা কম হওয়ার উপরে সাধনা নির্ভর করে না। উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে করা ব্যাপারটা তোমার মানসিক ইচ্ছার প্রতি ঈঙ্গিত করে। কোন কিছুর পেছনে ছোটার ব্যাপার বলতে হলে, যদি কেউ মানসিক ইচ্ছা নিয়ে কোনও কিছুর পেছনে ছোটে, তাহলে সেটা আসক্তি এবং সেটাই উদ্দেশ্যমূলকভাবে করা, এটাই হচ্ছে এর অর্থ।

প্রশ্ন: *চরিত্র এবং সদ্‌গুণ সমান নয়, আপনি বলেছেন সদ্‌গুণ একজন ব্যক্তির স্তর নির্ধারণ করে, আবার আপনি বলেছেন চরিত্র যত উঁচু হবে গোংগও তত উঁচু হবে। এই দুটো বক্তব্য কি পরস্পর বিরোধী?*

উত্তর: তোমরা হয়তো পরিষ্কার করে শুনতে পাও নি! চরিত্রের মধ্যে আছে এক বিস্তৃত ক্ষেত্র, তার মধ্যে সদ্‌গুণ একটা অংশ, এছাড়াও তার মধ্যে আছে ''সহনশীলতা'', কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা, আলোকপ্রাপ্তির গুণ, পারস্পরিক মতবিরোধের মোকাবিলা করার ক্ষমতা ইত্যাদি। এগুলো সবই চরিত্রের বিষয়, এর মধ্যে আরও আছে গোংগ-এর রূপান্তর এবং সদ্‌গুণের রূপান্তর, এটা একটা বিস্তৃত ব্যাপার। তোমার সদ্‌গুণ কতটা আছে সেটা দেখে গোংগ-এর উচ্চতা বলা যাবে না তার বদলে, এটা বলা যাবে যে ভবিষ্যতে কতটা গোংগ বিকশিত হতে পারে। একমাত্র চরিত্রের উন্নতির মাধ্যমেই সদ্‌গুণ গোংগ-এ রূপান্তরিত হবে।

প্রশ্ন: *আমার পরিবারের লোকেরা প্রত্যেকে বিভিন্ন রকম চিগোংগ পদ্ধতি অনুশীলন করে। এগুলো পরস্পরের উপর প্রভাব ফেলবে কি?*

উত্তর: না, অন্তত ফালুন গোংগ-এর উপরে নয়। কিন্তু অন্য পদ্ধতিগুলোতে, নিজেরা একে অপরের উপরে প্রভাব ফেলবে কি না সেটা আমি বলতে পারব না। ফালুন গোংগের ক্ষেত্রে এটা বলা যায় যে, কেউ এতে বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। এছাড়া তোমার পরিবারের লোকেরা তোমার থেকে উপকৃত হবে। কারণ আমরা সৎপথে সাধনা করি এবং তুমি বিপথগামী হবে না।

প্রশ্ন: *বর্তমান সমাজে অনেক ভাবে বক্তব্য প্রচার করা হয়ে থাকে, যেমন চিঠি-র শৃঙ্খল। কীভাবে এর মোকাবিলা করব।*

উত্তর: আমি তোমাদের বলছি, এসব পুরোপুরি লোক ঠকানোর জিনিস। তুমি তার চিঠি ফেরৎ পাঠাবে না। একেবারে বোকা বোকা ব্যাপার। তুমি এটাকে গুরুত্ব দিও না। তুমি জিনিসটাকে একবার দেখেই বলতে পারবে যে এটা সৎ কি সৎ নয়। আমাদের এই ফা-এর চরিত্রের সাধনার আবশ্যকতাগুলি কঠোর। কিছু চিগোংগ মাস্টারকে আমি ''চিগোংগ ব্যবসায়ী'' বলব কারণ তারা চিগোংগকে এক ধরনের পণ্যসামগ্রী হিসাবে ব্যবহার করছে এবং এটাকে মূলধন করে এর বিনিময়ে টাকা রোজগার করছে। ওই লোকগুলোর কাছে সত্যিকারের শেখানোর মতো কিছুই নেই, যদি সামান্য কিছু থাকেও, সেটাও উঁচুস্তরের নয়, এমন কি অশুভ জিনিসও আছে।

প্রশ্ন: *যদি ফালুন গোংগ শিক্ষার্থীদের মঠের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়ে থাকে, তাহলে তারা কি করবে? তারা কি সেটা ছেড়ে দেবে?*

উত্তর: এর সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই। যদিও তুমি ইতিমধ্যেই বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছ, সেটা একটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র।

প্রশ্ন: *আমাদের কয়েকজনের ফালুন গোংগ শেখার পরে থেকেই বোধ হচ্ছে যেন মাথা ফুলে গেছে এবং মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে।*

উত্তর: সম্ভবত তোমরা নূতন শিক্ষার্থী, যাদের শরীরের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-বিধান হয় নি। আমি যে শক্তিটা প্রেরণ করি সেটা খুবই প্রবল, তোমার রোগগ্রস্ত চি কে যখন শরীরের বাইরে বের করে দেওয়া হচ্ছে তখন মাথাটা ফুলে উঠেছে বোধ হবে। যখন আমরা তোমার মাথার অসুখের চিকিৎসা করব তখন এটা ঘটবে এবং এটা একটা ভালো ব্যাপার। তবে যত দ্রুত অসুখটাকে দূর করা হবে, প্রতিক্রিয়া তত বেশী তীব্র হবে। যখন আমরা সাতদিনের ক্লাসের আয়োজন করি কিছু লোক সেটা সহ্য করতে পারে না। যদি সেটা আরও কমিয়ে আনি তাহলে সমস্যার সৃষ্টি হবে। কারণ যে শক্তিটা আমি প্রেরণ করি সেটা খুব প্রবল এবং প্রতিক্রিয়াটাও অত্যন্ত তীব্র। ফলে, মাথার ফুলে ওঠাটা অসহ্য বোধ হতে থাকে। দশ দিনের ক্লাস, মনে হয়, অপেক্ষাকৃত নিরাপদজনক হবে। যারা দেরীতে ক্লাসে যোগ দিয়েছ তাদের প্রতিক্রিয়া কিছুটা বেশী হবে।

প্রশ্ন: *সাধনার সময়ে আমরা কি ধূমপান অথবা মদ্যপ্যন করতে পারি? আমাদের কাজের জন্য বিশেষ প্রয়োজনে মদ্যপান করতে হলে কি করব?*

উত্তর: বিষয়টা আমরা এইভাবে দেখি, আমাদের বুদ্ধমতের চিগোংগ-এ মদ্যপান ত্যাগ করা প্রয়োজন। কিছু কাল মদ্যপান না করার পরে সম্ভবত আবার মদ্যপান করতে ইচ্ছা হতে পারে, ধীরে ধীরে এটা ছেড়ে দেবে। কিন্তু খুব বেশী সময় নিও না, অন্যথায় শাস্তি পাবে! ধূমপান সম্বন্ধে আমি মনে করি এটা ইচ্ছাশক্তির ব্যাপার। যতক্ষণ তুমি এটা ছাড়তে চাইবে ততক্ষণ এটা ছেড়ে থাকতে পারবে। সাধারণ লোকেরা প্রায়ই চিন্তা করে: ''আমি আজ ধূমপান ছেড়ে দেব,'' কয়েকদিন পরে তারা এটাতে আর লেগে থাকতে পারে না। তখন আবার কয়েকদিন পরে তারা আবার ঐ চিন্তাটা করে এবং আবার ধূমপান ছাড়তে চেষ্টা করে। এইভাবে তারা কোনদিনই আর ধূমপান ছাড়তে পারে না। সাধারণ মানুষ এই পৃথিবীতে বসবাস করছে এবং পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের সময়ে সামাজিক আদান-প্রদান অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তুমি ইতিমধ্যে সাধনা আরম্ভ করেছ, সেইজন্য তুমি নিজেকে আর সাধারণ মানুষ মনে করবে না। ইচ্ছাশক্তি থাকলেই তুমি লক্ষ্যটা অর্জন করতে পারবে। অবশ্য আমার কিছু শিক্ষার্থী এখনও ধূমপান করে যাচ্ছে, সে নিজে থেকে এটা ছেড়ে থাকতে পারে, কিন্তু কেউ যখন তাকে একটা সিগারেট এগিয়ে দেয়, তখন তার মুখের উপর আর না বলতে পারে না। সে ধূমপান করতে চায়, এবং কয়েকদিন ধূমপান ছাড়া থাকলে সে অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু আবার যদি ধূমপান করে তখনও সে অস্বস্তি বোধ করে। নিজেকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখবে! কিছু লোক ব্যবসার জনসংযোগের দিকটা দেখে, যেখানে প্রায়ই অতিথিদের সাথে ভোজন এবং মদ্যপান করে। এই সমস্যার সমাধান করা কঠিন। যতটা সম্ভব কম মদ্যপান করবে, অথবা অন্য কোনও উপায় চিন্তা করে এটা সমাধান করার চেষ্টা করবে!

প্রশ্ন: *যখন ফালুনের ঘূর্ণন দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা না থাকে, তখন যদি আমরা চিন্তা করি যে এটা ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী ঘুরছে, অথচ সেই সময়ে এটা বাস্তবে ঘড়ির বিপরীত দিকে ঘুরছে, সেক্ষেত্রে ফালুনের উপরে কোনও প্রভাব সৃষ্টি হবে কি?*

উত্তর: ফালুন নিজে নিজেই ঘুরছে, তোমার মানসিক ইচ্ছার দ্বারা একে পরিচালিত করার কোন প্রয়োজন নেই। আমি এটা আরও একবার জোর

দিয়ে বলতে চাই: মানসিক ইচ্ছার প্রয়োগ করবে না এবং মানসিক ইচ্ছা একে নিয়ন্ত্রণ করতেও পারবে না। এটা ভাববে না যে মানসিক ইচ্ছার দ্বারা একে বিপরীত দিকে জোর করে ঘোরাতে পারবে। তলপেটে অবস্থিত ফালুনকে মানসিক ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। যে ফালুনগুলো বাইরে থেকে শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করছে, সেগুলো তোমার মানসিক ইচ্ছাকে গ্রহণ করতে পারে, যদি তুমি সেগুলোকে বিশেষ দিকে ঘুরতে দিতে চাও, তুমি সেটা অনুভব করতে পারবে। আমি তোমাদের বলব: এটা করবে না, মানসিক ইচ্ছা দিয়ে অনুশীলন করতে পারবে না। মানসিক ইচ্ছা প্রয়োগ করে অনুশীলন করলে সেটা ‘‘অনুশীলনকারী দ্বারা গোংগ-এর শোধন,’’ হয়ে যাচ্ছে না কি? কিন্তু এটা ফালুন অথবা ফা দ্বারা অনুশীলনকারীর শোধন হওয়া উচিৎ। তোমার মানসিক ইচ্ছার ব্যাপারগুলোকে কিছুতেই ত্যাগ করছ না কেন? যে কোন সাধনায় উঁচু স্তরে পৌঁছে গেলে, এমন কি তাওমতের সাধনাতেও, মানসিক ইচ্ছার দ্বারা পরিচালনার ব্যাপার আর থাকে না।

প্রশ্ন: *ফালুন গোংগ অনুশীলনে সবথেকে ভালো ফল পাওয়ার জন্য কোন্ সময়, কোন্ স্থান এবং কোন্ দিক সর্বোত্তম? দিনের মধ্যে কতবার করাটা সঠিক? ভোজনের আগে অথবা পরে ক্রিয়া করার মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কি?*

উত্তর: যেহেতু ফালুন দেখতে গোল এবং এই বিশ্বের-ই ক্ষুদ্র প্রতিরূপ, এর সাধনা করার অর্থ এই বিশ্বেরই মূল তত্ত্বের সাধনা করা। এছাড়া এই বিশ্ব গতিশীল, বিপরীত দিক দিয়ে এর অর্থ ফা অনুশীলনকারীকে শোধন করছে এবং এটা অন্য যে সব সাধনার তত্ত্ব প্রচারিত আছে তাদের থেকে আলাদা। এটাই একমাত্র প্রণালী যেখানে ‘‘ফা অনুশীলনকারীকে শোধন করছে’’। অন্য সব সাধনা পদ্ধতি দ্যান -এর পথ গ্রহণ করে। তারা মানসিক ইচ্ছার সাহায্যে গোংগ-এর সাধনা করে এবং দ্যান সঞ্চয় করে রাখে, আমরা এটার ব্যবহার করি না। আমাদের এই পদ্ধতি যে কোন সময়ে অনুশীলন করা যায়। যখন তুমি অনুশীলন করছ না তখন গোংগ তোমাকে শোধন করছে। কোন সময় বেছে নেওয়ার প্রয়োজন নেই। যদি তোমার হাতে সময় বেশী থাকে তাহলে বেশী সময় ক্রিয়া করবে, সময় কম থাকলে ক্রিয়া কম করবে। আমাদের ক্রিয়াগুলি করার ক্ষেত্রে আবশ্যকতা বিশেষ কঠোর নয়, কিন্তু চরিত্রের ব্যাপারে আমাদের আবশ্যকতা অত্যন্ত কঠোর। আমাদের ক্রিয়া করার সময়ে কোন দিকের

কথা বলা হয় না, যে কোনও দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ক্রিয়া করা সম্ভব। যেহেতু এই বিশ্ব আবর্তনশীল এবং গতিশীল। তুমি যদি পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়াও তাহলে সেটাই নিশ্চিতভাবে পশ্চিম দিক নাও হতে পারে, তুমি যদি পূর্ব দিকে মুখ করে দাঁড়াও তাহলে সেটাই নিশ্চিতভাবে পূর্ব দিক নাও হতে পারে। আমি আমার শিষ্যদের শ্রদ্ধাপূর্বক পশ্চিমদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে ক্রিয়া করতে বলেছিলাম, কিন্তু বাস্তবে এর কোন প্রভাব পড়ে নি। ঘরের ভিতরে এবং বাইরে, যে কোনও স্থানে ক্রিয়া করা যায়। কিন্তু আমার এখনও মনে হয় যে একটা অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ হাওয়া বাতাসযুক্ত, ভালো পরিবেশ যুক্ত একটা মাঠ আমাদের খোঁজ করা উচিৎ। এটা বিশেষ করে নোংরা জিনিস, যেমন জঞ্জালের পাত্র, শৌচালয় ইত্যাদি থেকে দূরে হওয়া উচিৎ। অন্য সব ব্যাপারের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। দাফা-এর সাধনার সঙ্গে সময়, স্থান এবং দিকের কোন সম্পর্ক নেই। ভোজনের পূর্বে অথবা ভোজনের পরে সবসময়েই তুমি ক্রিয়া করতে পার, কিন্তু যদি পেট ভর্তি করে খুব বেশি খেয়ে থাক, সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়া করলে অস্বস্তি হতে পারে, সবথেকে ভালো হয় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া, আবার খুব ক্ষিদেয় পেট চোঁ চোঁ করে ডাকতে থাকলেও মনকে শান্ত করা যাবে না। তোমরা নিজের নিজের পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে।

প্রশ্ন: *ক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে আমাদের কোন কিছু করার প্রয়োজন আছে কি? মুখমন্ডল মুছবে কি মুছবে না?*

উত্তর: ক্রিয়া শেষ করার পরে আমরা ঠান্ডা জল বা এইধরনের জিনিসকে ভয় পাই না। মুখমন্ডল এবং হাত মোছামুছি করি না। ওই সব জিনিসগুলোকে শরীরের নাড়ীগুলোকে এবং আকুপাংচার বিন্দুগুলোকে খোলার জন্য প্রাথমিক অবস্থায় প্রয়োগ করা হয়। আমরা দাফা-র সাধনা করি, ওই সব জিনিসের দরকার নেই। তুমি এখন আর ঠিক সেই অবস্থায় নেই, যেখানে সবে মাত্র তোমার শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করা হয়েছে। সাধারণ লোকের পক্ষে সাধক হওয়া সম্ভবত বেশ কঠিন এবং খুবই কঠিন, এছাড়া কিছু চিগোংগ পদ্ধতি মানব শরীরকে সরাসরি রূপান্তরিত করতেও পারে না, এবং তাদের কিছু কিছু আবশ্যকতা ভীষণ জটিল। আমাদের এখানে ওসব নেই এবং ওইসব ধারণাও নেই। আমি যে সব কথা বলি নি, সে সবের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবে না, শুধু যত্ন করে সাধনাটা চালিয়ে যাও। যেহেতু আমরা দাফা-র সাধনা করি, সেইজন্য তোমার শরীরের প্রাথমিক অবস্থায় নানান জিনিসকে ভয় পাওয়ার এবং নানান জিনিসের প্রয়োজন

বোধ করার যে পর্ব, সে সবই কয়েকদিনের মধ্যেই কাটিয়ে উঠতে পারবে। আমি বলছি না যে এটা অন্য সাধনা পদ্ধতিতে কয়েক বৎসর অনুশীলনের সমান, কিন্তু মোটামুটি একইরকম। নীচু স্তরের জিনিস যেমন এই দিক, এই নাড়ী ইত্যাদি, এসব নিয়ে আমি কথা বলি না। আমরা শুধু উঁচু স্তরের জিনিস নিয়ে আলোচনা করি। দাফা-র সাধনা হচ্ছে সত্যিকারের সাধনা। এটা সাধনা, ব্যায়াম নয়।

প্রশ্ন: *ক্রিয়া শেষ করার পরে পরেই বাথরুমে বা শৌচালয়ে যেতে পারি কি? আমার মূত্রে অনেক বুদবুদ থাকে, চি নির্গত হয়ে যাচ্ছে কি?*

উত্তর: এটা কোন সমস্যা নয়। যেহেতু আমরা উঁচু স্তরে সাধনা করি, আমাদের মূত্রে বা মলের মধ্যে সত্যিই শক্তি থাকে। অবশ্য ওইটুকু শক্তি কোন হিসাবের মধ্যে আসে না এবং এর কোন প্রভাবও নেই। দাফা সাধনার অর্থ সমস্ত জীবের উদ্ধার হওয়া, ওইটুকু শক্তির নির্গমন হয়ে যাওয়া কোনও ব্যাপার নয়। আমরা যা ফিরে পাই তা অনেক বেশী। ক্লাসে পড়ানোর সময়ে আমি অত্যন্ত ক্ষমতাশালী শক্তি প্রেরণ করি, সেটা এইসব দেয়ালগুলোতে রয়ে যায়।

প্রশ্ন: *আমরা ফালুন গোংগ-এর প্রচার করতে পারি কি? যারা ক্লাসে আসে নি, তাদেরকে আমরা শেখাতে পারি কি? যারা ক্লাসে আসে নি তারা সহায়তা কেন্দ্রে অনুশীলন করতে পারে কি? শহরের বাইরে থাকা আত্মীয়স্বজনকে এবং বন্ধুবান্ধবকে টেপ এবং বই পাঠাতে পারি কি?*

উত্তর: আমাদের এই ফা জনগণের মধ্যে প্রচার করে আরও বেশী লোককে উপকার করলে তুমি বিপথগামী হবে না। আমি তোমাদেরকে অনেক ফা (বিধি) শিখিয়েছি এবং ফা (বিধি) সম্বন্ধে জানতে দিয়েছি, উঁচুস্তরের জিনিস ব্যাখ্যা করেছি এবং উঁচুস্তরের জিনিস দেখতে দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে জিনিসগুলো আগেই শিখিয়ে দিয়েছি যেহেতু আমার আশঙ্কা হচ্ছিল যে যদি অপেক্ষা করি, সেক্ষেত্রে তোমরা যখন সেগুলোকে দেখবে অথবা সেগুলোর সম্মুখীন হবে তখন হয়তো বুঝতে পারবে না। তুমি অন্যদের ক্রিয়াগুলি শেখাতে পার, কিন্তু তোমার ফালুন স্থাপন করার ক্ষমতা নেই। তুমি তখন কি করবে? আমি বলেছি যে তুমি যদি দ্বিধাগ্রস্তভাবে সাধনা কর এবং ঠিকভাবে অনুশীলন না কর তাহলে আমার ফা শরীর তোমাকে পরিত্যাগ করবে। যদি তুমি সঠিকভাবে সাধনা কর তাহলে ফা-শরীর তোমার প্রতি

লক্ষ্য রাখবে। অতএব তুমি যখন কাউকে ক্রিয়াগুলি শেখাবে, তুমি তখন আমার শেখানো তথ্যগুলিকে বহন করবে যার মধ্যে ফালুন তৈরি করার শক্তির যন্ত্রকৌশলও থাকে। তোমার শেখানো ব্যক্তি যদি মন দিয়ে অনুশীলন করে তাহলে ফালুন তৈরি হবে। পূর্বনির্ধারিত সম্পর্ক থাকলে অথবা জন্মগত সংস্কার ভালো থাকলে ব্যক্তি ওই জায়গাতেই ফালুন প্রাপ্ত হবে। আমাদের বইতে সবকিছু একেবারে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যাতে কেউ না শেখালেও, ভালোভাবে সাধনা করা সম্ভব হয়।

প্রশ্ন: *ফালুন গোংগ-এ শ্বাস-এর ব্যাপারে শেখানো হয় কি? আমরা শ্বাস কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করব?*

উত্তর: আমাদের এই ফালুন গোংগ-এর সাধনার সময়ে শ্বাস নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজন নেই এবং শ্বাস এর ব্যাপারে আমরা কোনও কিছু শেখাইও না। এটা প্রারম্ভিক স্তরে শেখার জিনিস। আমাদের এখানে এর প্রয়োজন নেই কারণ শ্বাস-এর নিয়ন্ত্রণ করা হয় দ্যান-এর সাধনার জন্য, যেখানে বায়ু যোগ করা হয় অগ্নির পুষ্টির সাধনের জন্য। শ্বাস-এর ঊর্দ্ধমুখী গতি এবং নিম্নমুখী গতি, লালা গলাধঃকরণ এসবই দ্যান সাধনার জন্য। আমরা এভাবে সাধনা করি না। তোমার সমস্ত প্রয়োজন ফালুন-ই মিটিয়ে দেবে। কিছু আরও উঁচু এবং আরও কঠিন জিনিস মাস্টারের ফা-শরীরের দ্বারা সম্পাদিত হবে। যে কোন সাধনা পদ্ধতিই হোক না কেন এমন কি তাও মতের যেখানে দ্যান সাধনার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে, সেগুলোর কোনটাই মানসিক ইচ্ছা দ্বারা সম্পাদিত করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে একটা সাধনা পথে, একজন উচ্চস্তরের মহান মাস্টারই ব্যক্তিকে সাধনায় এগোতে সাহায্য করেন এবং ওই জিনিসগুলোর রূপান্তর করেন এবং এসবই ওই ব্যক্তির অজান্তে হয়ে থাকে। তুমি এসব নিজের মানসিক ইচ্ছা দ্বারা সম্পন্ন করতে পারবে না। কেবল মাত্র আলোকপ্রাপ্ত এবং গোংগ উন্মোচিত হয়ে যাওয়া ব্যক্তিই এসব করতে পারেন।

প্রশ্ন: *অনুশীলনের সময়ে মনকে কেন্দ্রীভূত রাখার প্রয়োজন আছে কি? ক্রিয়া করার সময়ে মনোযোগ কোথায় নিবদ্ধ করব?*

উত্তর: আমরা এখানে মনকে কেন্দ্রীভূত রাখার কথা বলি না। আমি সবাইকে বলব যে মনকে কেন্দ্রীভূত করবে না এবং এই আসক্তিটা ত্যাগ কর। কোনও মানসিক ইচ্ছার আবশ্যকতা নেই। তৃতীয় ক্রিয়ার সেটে

যেখানে দুটো হাতের তালু চি বহন করছে যা বিশ্বের দুই প্রান্ত ভেদ করছে, এখানে শুধু একবার চিন্তা করলেই চলবে, অন্য আর কিছু চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন: *শক্তি সংগ্রহ করা এবং চি সংগ্রহ করা কি একই ব্যাপার?*

উত্তর: আমরা চি কিসের জন্য সংগ্রহ করব। আমরা দাফা-র সাধনা করি। ভবিষ্যতে তুমি এমন কি চি নির্গতও করতে পারবে না। আমরা এই নিম্নস্তরের চি-এর সাধনা করি না। পরিবর্তে আমরা আলো নির্গত করি। ফালুন এই শক্তি সংগ্রহ করে, আমরা নিজেরা করি না। যেমন, এই বিশ্বের দুই প্রান্ত ভেদ করার ক্রিয়াতে, এটা চি সংগ্রহ করে না, প্রকৃতপক্ষে শরীরটাকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়, এর দ্বারা শক্তি সংগ্রহ করার মত কাজটাও সম্পন্ন হয়, কিন্তু এটাই মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। একজন ব্যক্তি চি কীভাবে সংগ্রহ করে? তুমি দাফা-র সাধক, সেইজন্য তোমার হাতটাকে একবার আন্দোলিত করার সাথে সাথে মাথার উপরে বেশ ভার বোধ করবে, কারণ প্রচুর পরিমাণ চি চলে আসে। কিন্তু কিসের জন্য তোমার চি-এর প্রয়োজন। কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে শক্তি সংগ্রহ করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন: *''একশ দিনের মধ্যে ভিত নির্মাণ '' এবং '' ভ্রূণ-এর শ্বাস'' ফালুন গোংগ-এর অন্তর্গত কি?*

উত্তর: এগুলো সবই নীচুস্তরের পদ্ধতি, আমরা এসব সাধনা করি না। ওই সব অস্থায়ী এবং প্রারম্ভিক পর্ব আমরা অনেক আগেই পার করে এসেছি।

প্রশ্ন: *ফালুন গোংগ য়িন এবং য়িয়াংগ -এর ভারসাম্যের প্রতি গুরুত্ব দেয় কি?*

উত্তর: এসবই চি-এর সাধনার অন্তর্গত নীচুস্তরের জিনিস। তুমি এই চি-এর স্তর পার হয়ে গেলেই তোমার শরীরের ভিতরে য়িন এবং য়িয়াংগ-এর ভারসাম্যের প্রশ্নটা আর থাকবে না। তুমি যে মতের সাধনাই কর না কেন, যখনই মাস্টারের থেকে সত্যিকারের শিক্ষা প্রাপ্ত হবে, তুমি অবধারিতভাবে এই নীচু স্তরটা পার করে যাবে। পূর্বে তুমি যা যা শিখেছিলে সে সবই তোমাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করতে হবে, কিছুই রাখবে না। এই নতুন

স্তরে এক সেট নতুন জিনিসের সাধনা করতে হবে, এই নতুন স্তরটা অতিক্রম করে যাওয়ার পরে পুনরায় অন্য এক সেট নতুন জিনিসের সাধনা করতে হবে, ব্যাপারটা এইরকমই হয়।

প্রশ্ন: *বজ্রপাতের সময়ে ক্রিয়া করা যাবে কি? ফালুন গোংগ অনুশীলনকারীরা শব্দকে ভয় পায় কি?*

উত্তর: আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি। আমি একবার বেজিংয়ে বড়ো একটা অট্টালিকা প্রাঙ্গনে শিক্ষার্থীদের শেখাচ্ছিলাম, তখন বৃষ্টি আসবে আসবে করছে এবং ভীষণ বজ্রপাত হচ্ছিল, আমি যে সব ক্রিয়া শিষ্যদের শিখিয়ে ছিলাম, সেগুলিই সবাই ওখানে অনুশীলন করছিল, তারা তখন পদচারনা দ্বারা ফালুনের গতিশীল স্থিতি-র ক্রিয়া করছিল, আমি দেখলাম বৃষ্টি এসে যাচ্ছে অথচ তাদের ক্রিয়া তখনও সমাপ্ত হয় নি। যাই হোক প্রচন্ড বৃষ্টিটা আর পড়লই না, মেঘগুলো খুব নীচে ছিল এবং অট্টালিকার উপর দিয়ে গড়াগড়ি দিচ্ছিল, ভয়ঙ্কর ভাবে বজ্রপাত হচ্ছিল এবং মেঘের গর্জন হচ্ছিল, খুব অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছিল। সে সময় একটা বজ্রবিদ্যুৎ ফালুনের ধারে এসে লাগল। কিন্তু আমাদের সামান্যতম আঁচও লাগে নি, আমরা পরিষ্কারভাবে দেখলাম যে বজ্রবিদ্যুৎটা কীভাবে মাটিতে এসে পড়ল, অথচ আমাদের কোনও ক্ষতি হল না। এর বক্তব্য হচ্ছে আমাদের এই সাধনা পদ্ধতি আমাদেরকে সুরক্ষা প্রদান করছে। আমি যখন অনুশীলন করি তখন আবহাওয়া কেমন, এটা চিন্তা করি না এবং যখনই আমি অনুশীলন করার কথা চিন্তা করি, ঠিক তখনই অনুশীলন করি। যতক্ষণ সময় থাকে ততক্ষণ অনুশীলন করি, আর শব্দ সম্বন্ধে আমার কোন ভীতি নেই। অন্য পদ্ধতিতে শব্দের প্রতি ভীতি থাকে, যেহেতু তুমি যখন খুবই শান্ত অবস্থায় থাক এবং হঠাৎ কোন জোরাল শব্দ শোন তখন এরকম বোধ হয় যেন সারা শরীরের চি ফেটে যাবে এবং চকিতে শরীরের বাইরে বের হয়ে যাবে। কিন্তু চিন্তা করবে না, আমাদের সাধনা বিপথে যাবে না। অবশ্য তুমি শান্ত জায়গায় জন্য যথাসাধ্য খোঁজ করবে যাতে ভালোভাবে অনুশীলন করতে পার।

প্রশ্ন: *মাস্টারের ছবি কি মনশ্চক্ষে ফুটিয়ে তুলতে পারি?*

উত্তর: মনের মধ্যে ছবি ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন নেই। তোমার দিব্যচক্ষু খুলে গেলে তুমি আমার ফা-শরীরকে তোমার পাশেই দেখতে পারবে।

প্রশ্ন: *এই পাঁচ সেট ক্রিয়ার অনুশীলনের সময়ে কোন আবশ্যকতা আছে কি? সবগুলো ক্রিয়া কি একই সাথে করা উচিৎ? যে ক্রিয়াতে নয়বার পুনরাবৃত্তি করা আবশ্যক, তখন আমরা মনে মনে গণনা করতে পারি কি? যদি ক্রিয়াটা নয়বারের বেশী করি অথবা ক্রিয়ার কিছু সঞ্চালন সঠিকভাবে মনে না থাকে তাহলে কোন প্রতিক্রিয়া হবে কি?*

উত্তর: পাঁচ সেট ক্রিয়ার মধ্যে যে কোনও একটা সেট অনুশীলন করতে পার। আমার মনে হয় অন্য ক্রিয়াগুলি করার পূর্বে প্রথম ক্রিয়ার সেট অনুশীলন করা সবথেকে ভালো। যেহেতু এটা পুরো শরীরটাকে খুলে দেয়, তুমি প্রথমে এটা একবার করবে। তখন তোমার সম্পূর্ণ শরীরটা পর্যাপ্ত ক্রিয়াশীল হয়ে খুলে যাওয়ার পরে, অন্য ক্রিয়াগুলি করলে ফল আরও ভালো হবে। বেশী সময় পেলে বেশী সময় অনুশীলন করবে, কম সময় পেলে কম সময় অনুশীলন করবে অথবা তুমি যে কোন একটা ক্রিয়ার সেট বেছে নিয়েও অনুশীলন করতে পার। তৃতীয় এবং চতুর্থ ক্রিয়ার সেট প্রত্যেকটা 'ন'বার করে করবে এবং এটা বইতে লেখা আছে যে তুমি এটা মনে মনে গুণতে পার। তুমি বাড়িতে গিয়ে একবার চেষ্টা করতে পার। তোমার বাচ্চাকে ডেকে নাও এবং তুমি অনুশীলন করার সময় তাকে পাশে দাড়িয়ে গণনা করতে বল। 'ন'বার -এর পরে তুমি শক্তির যন্ত্রকৌশলটাকে আর অনুভব করতে পারবে না, যেহেতু আমার জিনিসগুলি এইভাবেই কাজ করে। শুরুর দিকে তোমার এটা নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন, কিন্তু একবার অভ্যাস হয়ে গেলে তুমি স্বাভাবিক ভাবেই থেমে যাবে। যদি ক্রিয়াগুলির কিছু সঞ্চালন সঠিকভাবে মনে না থাকে অথবা বেশী বার বা কম বার কর, সেগুলোকে সংশোধন করে নিলেই চলবে।

প্রশ্ন: *ক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়াটাই অনুশীলনের শেষ হয়ে যাওয়া নয় কেন?*

উত্তর: ফালুন নিজে নিজেই ঘুরছে। তুমি ক্রিয়া বন্ধ করলে সেই মুহূর্তে সে জানতে পারে, সে অমিত শক্তিধর এবং তৎক্ষণাৎ শরীর থেকে নির্গত হওয়া সমস্ত জিনিস ফিরিয়ে নেয় এবং কাজটা তুমি মানসিক ইচ্ছার দ্বারা যে ভাবে করতে তার তুলনায় আরও ভালোভাবে সম্পন্ন করে। এটা মোটেই অনুশীলনের শেষ হওয়া নয়, শুধুমাত্র শক্তিটাকে ফিরিয়ে নেওয়া হয়। অন্য সাধনা পদ্ধতিগুলোতে শারীরিক ক্রিয়া শেষ হলেই অনুশীলনও শেষ হয়ে যায়। আমাদের এই পদ্ধতিতে অনুশীলন সব সময়েই চলছে, এমন কি যখন ক্রিয়া শেষ হয়ে গেছে। অতএব অনুশীলন শেষ করা যাবে

না। এমন কি ফালুনের ঘোরাটা থামাতে চাইলেও তুমি থামাতে পারবে না। আমি যদি আরও গভীরভাবে এটা ব্যাখ্যা করি তুমি বুঝতে পারবে না। তুমি যদি একে থামাতে পার তাহলে আমিও এখানে থেমে যাব, এবং তুমি কি আমাকে থামাতে পারবে?

প্রশ্ন : *জিয়েয়িন (দুটো হাত একত্রিত করা) এবং হেশি (দুটো হাতকে বুকের সামনে প্রণামের ভঙ্গিতে রাখা) এই দুটো স্থিতিকে কি আমরা দন্ডায়মান অবস্থানের মতো করতে পারি কি?*

উত্তর: প্রথম সেটের বুদ্ধ সহস্রহস্ত প্রসারণ-ক্রিয়াকে দন্ডায়মান অবস্থান ক্রিয়ার মতো করা যাবে না। প্রসারণের জন্য খুব বেশী শক্তির প্রয়োগ করবে না তাহলে তুমি সমস্যার সম্মুখীন হবে।

প্রশ্ন: *ক্রিয়ার সময়ে বাহুমূল কি সবসময়ে ফাঁকা রাখা উচিৎ? প্রথম ক্রিয়াটা করার সময়ে বাহুমূল শক্ত বোধ হয়, এর কারণটা কি?*

উত্তর: তুমি কি অসুস্থ? প্রাথমিক অবস্থায় তোমার শরীরের যখন সামঞ্জস্য-বিধান করা হচ্ছে তখন এই ধরনের ঘটনার অভিজ্ঞতা হতে পারে। কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে কিন্তু সেগুলো ক্রিয়ার দ্বারা সংঘটিত হয় নি।

প্রশ্ন; *যে সব লোকেরা মাস্টার লি-র ক্লাসে অংশ গ্রহণ করে নি তারা কি শিক্ষার্থীদের সাথে পার্কে অনুশীলন করতে পারে?*

উত্তর: হ্যাঁ পারে। যে কোন শিক্ষার্থীই অন্যদের ক্রিয়াগুলি শেখাতে পারে। যখন শিক্ষার্থীরা অন্যদের ক্রিয়া শেখাবে, সেটা আমি এখানে যে রকমভাবে শেখাচ্ছি এই রকম হবে না, আমি এখানে সরাসরি তোমার শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করছি। কিন্তু এরকম কিছু লোক আছে যারা শিক্ষার্থীদের কাছে শিখে যখনই অনুশীলনটা শুরু করে তখনই ফালুন প্রাপ্ত হয়। কারণ প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পেছনে আমার ফা-শরীর আছে, যে সরাসরি এই ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ সবই লোকেদের পূর্বনির্ধারিত সম্পর্কের উপরে নির্ভর করে। পূর্বনির্ধারিত সম্পর্কটা জোরালো হলে, ব্যক্তি ওই স্থানেই ফালুন প্রাপ্ত হবে, যদি পূর্বনির্ধারিত সম্পর্ক জোরালো না হয় সেক্ষেত্রে অনেকদিন অনুশীলনের পরে ব্যক্তি নিজে নিজেই ধীরে ধীরে এইরকম ঘূর্ণায়মান যন্ত্রকৌশল বিকশিত করতে পারে। এবং আরও

অনুশীলন করতে করতে এই ঘূর্ণায়মান যন্ত্রকৌশল থেকে ফালুন-এর বিকাশ ঘটবে।

প্রশ্ন: *''ঐশ্বরিক ক্ষমতার শক্তিবৃদ্ধি''-র এই শান্ত ক্রিয়াতে হস্তমুদ্রাগুলির অর্থ কি?*

উত্তর: আমাদের ভাষা দিয়ে একে ব্যাখ্যা করা যাবে না। প্রত্যেকটা মুদ্রার মধ্যে অনেক ধরনের অর্থ থাকতে পারে। সাধারণভাবে এর অর্থ:''আমি ক্রিয়া আরম্ভ করব এবং বুদ্ধ ফা অনুশীলন করব। আমি আমার শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করব এবং সাধনার অবস্থায় প্রবেশ করব।''

প্রশ্ন : *যখন একজন ব্যক্তি সাধনার মাধ্যমে দুগ্ধ-শুভ্র শারীরিক অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন শরীরের সমস্ত ছিদ্র খুলে যায় কি এবং শারীরিক শ্বাস প্রক্রিয়া প্রস্তুত হয়ে যায় কি?*

উত্তর: তোমরা সবাই এটা অনুভব করার চেষ্টা কর, তোমরা ইতিমধ্যেই এই স্তরটা পার করে এসেছ। তোমাদের শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করে এই দুগ্ধ-শুভ্র শারীরিক অবস্থায় আনার জন্য আমি বক্তৃতা দিয়েছি দশ ঘন্টারও বেশী সময় ধরে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের এই অবস্থায় নিয়ে এসেছি, অন্য সাধনা পদ্ধতিগুলোতে তার জন্য এক দশকের বেশী, কয়েক দশক অথবা তার বেশী সময় ধরে অনুশীলন করতে হতো। যেহেতু এই ধাপে চরিত্রের কোন আবশ্যকতা নেই, মাস্টারের ক্ষমতার উপরে ভিত্তি করেই এটা সম্পন্ন হয়। এমন কি তোমরা কিছু অনুভব করার আগেই এই স্তরটা পার হয়ে গেছ, সম্ভবত এর জন্য কয়েকটা ঘন্টাই মাত্র লেগেছে। হয়তো কোনও একদিন তুমি বেশী সংবেদনশীল হয়ে গেলে কিন্তু কিছু সময় পরে তুমি আর অতটা সংবেদনশীল থাকলে না, বাস্তবে একটা বড় স্তর পেরিয়ে গেল। অন্য সাধনা পদ্ধতিতে তুমি এই অবস্থায় এক বৎসর বা কয়েক বৎসর থাকবে, প্রকৃতপক্ষে ওগুলো সবই নীচুস্তরের জিনিস।

প্রশ্ন: *বাসে চড়ে যাওয়ার সময়ে অথবা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার সময়ে ফালুন গোংগের সব শরীর সঞ্চালনগুলো সম্বন্ধে চিন্তা করা যাবে কি?*

উত্তর: আমাদের ক্রিয়া করার ক্ষেত্রে কোনও মানসিক ইচ্ছার প্রয়োগ করার অথবা প্রত্যেক দিন বিশেষ সময় ধরে অনুশীলন করার প্রয়োজন নেই, অবশ্য যত বেশী সময় ধরে করতে পারবে ততই ভালো ফল হবে। তুমি অনুশীলন না করলে, অন্য দিক দিয়ে এই ফালুন গোংগ পদ্ধতি তোমাকে শোধন করতে থাকে। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় অনুশীলন বেশি করা ভাল, এটা শক্তিশালী হবে। কিছু শিক্ষার্থী এই রকম পরিস্থিতি লক্ষ্য করেছে যে তারা যখন কয়েক মাসের জন্যে ব্যবসার কাজে বাইরে ভ্রমণ করে, সেই সময়ে খুব ব্যস্ত থাকার কারণে অনুশীলন করার সময় পায় না, অথচ সামান্যতম প্রভাবও পড়ে না। যখন তারা ফিরে আসে ফালুন তখনও ঘুরতেই থাকে, কারণ এ কখনোও থামে না। তুমি নিজের হৃদয়ের মধ্যে নিজেকে একজন অনুশীলনকারী হিসাবে মনে করলে এবং চরিত্রকে রক্ষা করে চলতে পারলে এ ঘুরতেই থাকবে। কিন্তু এখানে একটা ব্যাপার আছে। তুমি যদি অনুশীলন না কর এবং নিজেকে একজন সাধারণ মানুষের সাথে গুলিয়ে ফেল, তাহলে এটা অন্তর্হিত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: *ফালুন গোংগ এবং তন্ত্র বিদ্যা একসাথে অনুশীলন করা যাবে কি?*

উত্তর: তন্ত্র বিদ্যাতেও ধর্মচক্র(ফালুন)-এর উপযোগ আছে। কিন্তু আমাদের সাধনার সঙ্গে এই পদ্ধতি একসাথে অনুশীলন করা যাবে না। যদি তুমি তন্ত্র বিদ্যায় সাধনা করে থাক এবং ধর্মচক্র ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে তুমি তন্ত্র বিদ্যাতেই সাধনা চালিয়ে যেতে পার কারণ তন্ত্র বিদ্যাও একটা সৎ সাধনা প্রণালী, কিন্তু একসাথে এই দুটো পদ্ধতিকে অনুশীলন করা যাবে না। তন্ত্র বিদ্যার এই ধর্মচক্র মধ্য(central) নাড়ির বিকাশ সাধন করে থাকে এবং এটা অনুপ্রস্থভাবে ঘোরে। এই ধর্মচক্র আমাদের ফালুনের থেকে আলাদা। এর চক্রের সাথে মন্ত্র থাকে। আমাদের ফালুন তলপেটে, খাড়া অবস্থায় থাকে এবং চ্যাপ্টা দিকটা বাইরের দিকে মুখ করে থাকে। আমাদের তলপেট যতটা বড় আমার এই একটা ফালুনই তার পুরো জায়গাটা জুড়ে থাকে। যদি আর একটা রাখা হয় তবে সব কিছু গন্ডগোল হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: *ফালুন গোংগ অনুশীলন করার সময়ে আমরা কি বুদ্ধমতের অন্য সাধনা পদ্ধতির আনুশীলন করতে পারি। আমরা কি বোধিসত্ত্ব গুয়ানইন-এর নাম জপ করা টেপ শুনতে পারি? বুদ্ধমতের গৃহী শিষ্যরা ফালুন*

গোংগ শেখার পরে শাস্ত্রপাঠ করতে পারবে কি? আমরা একই সাথে অন্য ক্রিয়ার অনুশীলন করতে পারব কি?

উত্তর: আমি মনে করি না। প্রত্যেকটা পদ্ধতিই হচ্ছে সাধনার এক একটা পথ। যদি তুমি সত্যিই সাধনা করতে চাও এবং কেবলমাত্র রোগ দূর করা এবং সুস্বাস্থ্য অর্জন করা নয় তাহলে তুমি অবশ্যই একটা পদ্ধতিতে সাধনা করবে। এটা একটা গম্ভীর বিষয়। উঁচু স্তরে সাধনার ক্ষেত্রে একটা পথে সাধনা করা আবশ্যক। এটা একটা নিশ্চিত সত্য। এমন কি বুদ্ধমতের বিভিন্ন সাধনা পদ্ধতিগুলোর ক্ষেত্রেও একটাকে অন্যটার সঙ্গে মেশানো উচিৎ নয়। আমরা যে সাধনা পদ্ধতির কথা বলি তা উচ্চস্তরের এবং এটা বহুকাল পূর্ব থেকে হস্তান্তরিত হয়ে আসছে। তুমি কি অনুভব করছ তার উপরে নির্ভর করে সাধনা করাটা ঠিক নয়। অন্য মাত্রা থেকে দেখলে বিবর্তন প্রক্রিয়াটা অত্যন্ত গম্ভীর এবং ভীষণ জটিল। ঠিক যেমন একটা সূক্ষ্ম নির্দেশী যন্ত্রের কোন একটা অংশ বের করে যদি অন্য কিছু দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয় তাহলে সেটা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙ্গে যাবে। সাধনার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। অন্য কোন কিছুই মেশানো উচিৎ নয়। তুমি যদি মেশাও তাহলে ভুল হওয়াটা অবশ্যম্ভাবী। সব সাধনার ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা একই। তুমি যদি সাধনা করতে চাও তাহলে অবশ্যই একটা পদ্ধতিতে মনোযোগ দিতে হবে। যদি একটা পদ্ধতিতে মনোনিবেশ না কর তাহলে সাধনা একেবারেই হবে না। একটা কথা আছে ‘‘সব মতের সব থেকে ভালো জিনিসটা গ্রহণ করা।’’ এটা কেবলমাত্র রোগ নিরাময় করা এবং স্বাস্থ্যের উন্নতির স্তরেই প্রযোজ্য। এটা তোমাকে সাধনার উঁচুস্তরে নিয়ে যেতে পারবে না।

প্রশ্ন: *অন্য সাধনা পদ্ধতির লোকেদের সঙ্গে এক সাথে অনুশীলন করলে আমরা একে অপরের উপর প্রভাব ফেলব কি?*

উত্তর: সে যে পথেই সাধনা করুক না কেন তাওমতের চিগোংগ, অতিপ্রাকৃত চিগোংগ অথবা বুদ্ধমতের চিগোংগ, যতক্ষণ এটা সৎ থাকবে, ততক্ষণ এটা আমাদের সামান্যতম বাধাও দিতে পারবে না, তুমিও তাকে কোন বাধা দিতে পারবে না। যদি সে তোমার কাছাকাছি জায়গায় অনুশীলন করে তবে সেটা তার পক্ষে মঙ্গলদায়ক হবে। যেহেতু ফালুন একটা বুদ্ধিমান সত্তা এবং দ্যানের সাধনা করে না, এ নিজে নিজেই অন্যদের সাহায্য করতে পারে।

প্রশ্ন: *আমরা কি আমাদের শরীর ঠিক করার জন্য অন্য চিগোংগ মাস্টারকে বলতে পারি? আমরা যদি অন্য চিগোংগ মাস্টারদের বক্তৃতা শুনি তাহলে তার কোন প্রভাব পড়বে কি?*

উত্তর: আমি বিশ্বাস করি এই ক্লাস শেষ হওয়ার পরে তোমার শরীর কেমন অবস্থায় পৌঁছল সেটা তুমি অনুভব করতে পারবে। কিছু সময় কেটে যাওয়ার পরে তোমার শরীরে আর রোগের সংক্রমণের অনুমতি দেওয়া হবে না। যখন আবার সমস্যা আসবে, সেগুলো সর্দি লাগার মতো অথবা পেট ব্যাথার মতো বোধ হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে এগুলো আলাদা। এগুলো হচ্ছে সব দুর্ভোগ এবং পরীক্ষা। তুমি যদি অন্য চিগোংগ মাস্টারদের খোঁজ কর, এর অর্থ তুমি আমার বলা কথাগুলিকে বুঝতে পার নি অথবা বিশ্বাস কর নি। এই ধরনের কোন কিছুর পেছনে ছোটার মানসিকতা ধরে রাখলে, তুমি অশুভ বার্তাগুলোকে আকর্ষিত করবে যেগুলো তোমার সাধনায় বিঘ্ন ঘটাবে। যদি সেই চিগোংগ মাস্টার অশুভ আত্মার দ্বারা আবিষ্ট হয়ে তার থেকে গোংগ প্রাপ্ত হয়ে থাকে তাহলে তুমিও সেই অশুভ জিনিসগুলিকে আকর্ষিত করবে। অন্যের বক্তৃতা শুনতে চাওয়ার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে, এই শুনতে চাওয়ার ইচ্ছাটা কি কোন কিছুর পেছনে ছোটা হচ্ছে না? তোমাকে নিজেকেই এই বিষয়টা উপলব্ধি করতে হবে। এটা চরিত্রের বিষয়, আমি হস্তক্ষেপ করব না। যদি সে খুব উচ্চস্তরের তত্ত্ব আর চরিত্র নিয়ে ব্যাখ্যা করে তাহলে হয়তো ব্যাপারটা ঠিক হতেও পারে। কিন্তু তুমি আমার ক্লাসে অংশ গ্রহণ করেছ এবং অনেক চেষ্টার মাধ্যমে তোমার শরীরের সামঞ্জস্যবিধান করেছি। প্রাথমিক অবস্থায় অন্য সব পদ্ধতির বার্তাগুলো তোমার শরীরের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ছিল এবং তোমার শরীরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। এখন তোমার শরীরের সমস্ত কিছুর সামঞ্জস্যবিধান করে সেটাকে সর্বোত্তম অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খারাপ জিনিস দূর করা হয়েছে এবং ভালো জিনিস রেখে দেওয়া হয়েছে। অবশ্য আমি তোমাদের অন্য সাধনা পদ্ধতি শিখতে বারণ করছি না। তোমার যদি বোধ হয় যে ফালুন গোংগ ভালো নয়, সেক্ষেত্রে অন্য সাধনা পদ্ধতি শিখতে পার। কিন্তু আমার মনে হয় তুমি যদি খুব বেশী ভিন্ন ভিন্ন জিনিস শেখ সেটা তোমার পক্ষে ভালো নয়। তুমি ইতিমধ্যেই দাফা-র সাধনা করছ এবং আমার ফা-শরীর তোমার পাশেই রয়েছে। উচ্চস্তরের জিনিস প্রাপ্ত হয়েও তুমি আবার ফিরে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করতে চাইছ?

প্রশ্ন: *ফালুন গোংগ শেখার সময়ে আমি অন্য সব পদ্ধতি শিখতে পারি কি? যেমন, মালিশ, আত্মরক্ষা, এক আঙ্গুল জেন, তাইজি চোয়ান ইত্যাদি, আমরা এই পদ্ধতিগুলোতে অনুশীলন না করে শুধু এসবের সঙ্গে সম্পর্কিত বইগুলি পড়তে পারি কি?*

উত্তর: মালিশ এবং আত্মরক্ষা সম্বন্ধে পড়াশোনা করা যেতে পারে। কিন্তু যখন নিষ্ঠুরতার উদয় হবে তখন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে। এক আঙ্গুল জেন এবং তাইজি চোয়ান চিগোংগ-এর অন্তর্ভুক্ত। তুমি যদি ওগুলো অনুশীলন কর তাহলে তুমি ওই জিনিসগুলো যোগ করছ, সেক্ষেত্রে তোমার শরীরে অবস্থিত আমার জিনিসগুলো সব অশুদ্ধ হয়ে যাবে। যে বইগুলো চরিত্র সম্বন্ধে বলেছে সেগুলো পড়তেও পার। কিন্তু কিছু লেখক নিজেরা পরিষ্কার ভাবে না বুঝেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলে যার ফলে তোমাদের চিন্তাগুলি বিভ্রান্ত হতে পারে।

প্রশ্ন: *''মাথার সামনে চক্র ধরে রাখা''-র এই অবস্থানের সময়ে কখনো কখনো হাতে স্পর্শ হয়ে যায়। এটা কি ঠিক?*

উত্তর: হাতে স্পর্শ হওয়া উচিৎ নয়। আমাদের আবশ্যকতা হচ্ছে অল্প ফাঁক রাখা। হাতে স্পর্শ হয়ে গেলে হাতের শক্তিটা শরীরে ফিরে যায়।

প্রশ্ন: *দ্বিতীয় সেটের ক্রিয়ার অনুশীলনের সময়ে যদি আমরা বাহু দুটোকে আর ধরে রাখতে না পারি তাহলে বাহুদুটোকে নীচে নামিয়ে এনে পুনরায় ক্রিয়াটা চালিয়ে যেতে পারি কি?*

উত্তর: সাধনা খুব কষ্টকর, তুমি ক্লান্ত বোধ করে বাহুদুটো নামিয়ে রাখলে সেটা ফলপ্রসূ হবে না। এটা আবশ্যক যে যত বেশি সময় ধরে করতে পারবে তত ভালো ফল হবে। কিন্তু তুমি তোমার ক্ষমতা অনুযায়ী করবে।

প্রশ্ন: *পূর্ণ পদ্মাসনে মহিলাদের ক্ষেত্রে বাঁ পা কেন ডান পা-এর নীচে থাকে?*

উত্তর: কারণ আমাদের সাধনায় একটা মৌলিক ব্যাপারের কথা বলা হয়ে থাকে। একজন মহিলার শরীর পুরুষের শরীরের থেকে ভিন্ন। সেইজন্য একজন মহিলা তার মূল শরীরের দ্বারা নিজের রূপান্তর করতে চাইলে,

সাধনাটা মহিলার শরীরের গড়নের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হওয়া উচিৎ। মহিলাদের ক্ষেত্রে বাঁ পা ডান পা-এর ভার বহন করে যেটা তার শারীরিক অবস্থার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ। এটা পুরুষদের ক্ষেত্রে বিপরীত যেহেতু তাদের মৌলিক প্রকৃতিটা ভিন্ন।

প্রশ্ন: *অনুশীলন করার সময়ে টেপ অথবা সংগীত শোনা অথবা শ্লোক উচ্চারণ করাটা কি ঠিক?*

উত্তর: ভালো বুদ্ধমতের সংগীত তুমি শুনতে পার। কিন্তু সত্যিকারের সাধনায় কোনও সংগীতের প্রয়োজন নেই, যেহেতু শান্ত অবস্থায় প্রবেশের ক্ষমতাটা প্রয়োজন। সংগীত শোনাটা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের চিন্তাকে একটা চিন্তা দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা।

প্রশ্ন: *বিশ্বের দুই প্রান্তভেদ ক্রিয়া করার সময়ে আমাদের শরীরটাকে কি শিথিল রাখব অথবা বলপ্রয়োগ করব?*

উত্তর: বিশ্বের দুই প্রান্তভেদ-এর ক্রিয়ার সময়ে স্বাভাবিক ভাবে দাঁড়ানো আবশ্যক এবং শরীরটাকে শিথিল রাখবে, প্রথম সেটের ক্রিয়ার মত নয়, প্রথম ক্রিয়া ছাড়া অন্য সব ক্রিয়ার সময়ে শরীর শিথিল রাখবে।

3.চরিত্রের সাধনা

প্রশ্ন: *আমি সত্য, করুণা এবং সহনশীলতা পালন করতে চাই। কিন্তু গতকাল স্বপ্নে আমি একজনের সঙ্গে খুবই তীব্রভাবে ঝগড়া করেছি। আমি সহনশীল হতে চেয়েও হতে পারি নি। এটা কি আমার চরিত্রের উন্নতির জন্য হয়েছিল?*

উত্তর: অবশ্যই। স্বপ্ন কি সেটা আমি ইতিমধ্যে তোমাদের জানিয়েছি, অতএব তোমরা নিজেরাই এটা চিন্তা করে উপলব্ধি কর, যে সব ঘটনা থেকে তোমার চরিত্রের উন্নতি হবে সে সব হঠাৎ করেই আসবে। তুমি কখন মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে এদের সাদরে অভ্যর্থনা করতে পারবে তার জন্য এরা অপেক্ষা করবে না। একজন ব্যক্তি ভালো না খারাপ সেটা

বিচারের একমাত্র উপায় হচ্ছে, যখন সে মানসিকভাবে প্রস্তুত নয় তখন তার পরীক্ষা করা।

প্রশ্ন: *ফালুন গোংগ-এর সত্য, করুণা এবং সহনশীলতার মধ্যে ‘‘সহনশীলতার’’ অর্থ বলতে কি এটাই বোঝায় যে, ভালো হোক অথবা খারাপ হোক সমস্ত কিছুই সহ্য করতে হবে?*

উত্তর: আমি যে সহনশীলতার কথা বলেছি সেটা ইঙ্গিত করে তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থের বিষয়ে এবং তুমি যে সব জিনিসের আসক্তি এখনও ত্যাগ করতে পারে নি সেই সব বিষয়ে, যাতে তোমার চরিত্রের উন্নতি হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ‘‘সহনশীলতা’’ কোনও ভয়ঙ্কর ব্যাপার নয় এমন কি সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও ভয়ঙ্কর নয়। একটা গল্প বলব। হান শিন নামে এক দক্ষ বরিষ্ঠ সেনাপতি ছিলেন, তিনি যুবাবস্থা থেকে রণক্রীড়া ভালবাসতেন। সেই সময়ে রণ ক্রীড়ার শিক্ষার্থীরা তরবারি সঙ্গে রাখতে পছন্দ করত। যখন হানশিন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, একটা মস্তান ছেলে তাকে এসে বলল: ‘‘তুমি তরবারি সঙ্গে রেখেছ কেন? তোমার লোককে মারার সাহস আছে কি? যদি সাহস হয় তাহলে প্রথমে আমাকে মার।’’ এটা বলতে বলতে সে তার গলাটা সামনে এগিয়ে দিল। সে বলল: ‘‘যদি আমাকে মারতে সাহস না হয় তাহলে আমার দু পায়ের মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে যাও!’’ হান শিন তখন তার দু পায়ের মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়েছিলেন। তাঁর সহনশীলতার ক্ষমতা খুব বেশী ছিল। কেউ সহনশীল হলে কিছু লোক সেটাকে দুর্বলতা মনে করে, যেন সহজেই তার উপরে জবরদস্তি করা যাবে। বাস্তবে যারা সহনশীলতার অনুশীলন করে তাদের ইচ্ছাশক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়। কোন জিনিস ঠিক অথবা ভুল সেটা জানতে হলে দেখতে হবে ব্যাপারটা সত্যি সত্যি বিশ্বের সত্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কিনা। কোন একটা ঘটনায় তুমি হয়তো ভাবছ তোমার কোনও দোষ নেই, এবং অন্য লোক তোমাকে অপমান করেছে, বস্তুত তুমি চূড়ান্তভাবে জানতে পারবে না যে কেন এইরকম হল? তুমি বলবে: ‘‘আমি জানি, এটা একটা সামান্য ব্যাপার থেকে ঘটেছে।’’ আমি যেটা বলব সেটা অন্য তত্ত্ব, যেটাকে আমাদের এই বস্তুগত মাত্রাতে দেখতে পাওয়া যায় না। মজা করে বলা যেতে পারে, হয়তো তুমি পূর্ব জন্মে কারোর কাছে ঋণী ছিলে। তাহলে তুমি কীভাবে বিচার করবে যে সেটা ঠিক ছিল না ভুল ছিল? আমাদের সহনশীল হতে হবে। তুমি কীভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে প্রথমে অন্যকে অপমান করে তারপরে সহনশীল হবে? যে

ব্যক্তি তোমাকে বাস্তবিক অপমান করেছে তার প্রতি শুধু সহনশীল থাকলেই হবে না, তুমি তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে। কেউ যদি তোমাকে গালমন্দ করে এবং তোমার সম্বন্ধে শিক্ষকের কাছে অভিযোগ করে, সেক্ষেত্রেও তুমি মনে মনে তাকে ধন্যবাদ জানাবে। তুমি বলবে: ''আমি আহঃ কিউ হয়ে গেলাম না কি?'' অবশ্য এটা তোমার মত। এই ঘটনাকে সে যেভাবে মোকাবিলা করেছে, তুমি যদি সেটা অন্য ভাবে মোকাবিলা কর সেক্ষেত্রে তুমি তোমার চরিত্রের উন্নতি করবে। এই বস্তুগত মাত্রায় সে লাভ পেয়েছে, কিন্তু অন্য মাত্রায় সে তোমাকে কিছু জিনিস দেবে, দেবে না কি? তোমার চরিত্রের উন্নতি হল এবং কালো পদার্থগুলো রূপান্তরিত হয়ে গেল। তোমার তিন দিক দিয়ে লাভ হল। তুমি কি তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে না? সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে একে উপলব্ধি করা কঠিন। তবে আমি তো আর সাধারণ মানুষদের কাছে বক্তৃতা দিচ্ছি না, আমি সাধকদের কাছে বক্তৃতা দিচ্ছি।

প্রশ্ন: *যে সব লোকেরা অশুভ আত্মা দ্বারা আবিষ্ট হয় নি, তারা তাদের চরিত্রের উন্নতি করে অশুভ আত্মাকে এড়িয়ে যেতে পারবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ইতিমধ্যেই অশুভ আত্মা দ্বারা আবিষ্ট, সে কীভাবে এর থেকে মুক্তি পাবে?*

উত্তর: একটা সৎ চিন্তা একশটা অশুভকে দমন করতে পারে। তুমি আজ দাফা প্রাপ্ত হয়েছ। এর পর থেকে কোন আবিষ্ট করা অশুভ আত্মা এমন কি যদি তোমাকে লাভও প্রদান করে, তুমি সে সব গ্রহণ করবে না। যদি এরা তোমার কাছে টাকা পয়সা, খ্যাতি, ব্যক্তিগত লাভ নিয়ে আসে, তুমি মনের ভিতরে খুব আনন্দ অনুভব করে ভাব ''দেখ আমার কত ক্ষমতা'' এবং তুমি অন্যদের সামনে জাহির করতে থাক। আবার যখন তুমি অস্বস্তি বোধ করছ এবং এদের সঙ্গে থাকতে চাইছ না, তখন মাস্টারের খোঁজ করছ নিরাময়ের জন্য। কিন্তু এরা যখন তোমাকে সুবিধা প্রদান করে তখন কেন ঠিকমত আচরণ কর না? আমরা এ সবের দায়িত্ব নিতে পারব না। কারণ এরা তোমাকে যা যা সুবিধা প্রদান করেছে সবই তুমি গ্রহণ করেছ। তুমি যদি শুধু সুবিধাই চাও তাহলে সেটা ঠিক নয়। তুমি এদের কাছে কোন জিনিসই চাইবে না, এমন কি ভালো জিনিস নিয়ে এলেও চাইবে না। শুধু মাস্টারের শেখানো পদ্ধতি অনুসারে সাধনা করে যাও, একবার তুমি নিজেকে সৎ হিসাবে প্রতিপন্ন কর এবং একবার মনটাকে সুদৃঢ় কর। যখন এদের নিয়ে আসা ভালো জিনিসও তুমি গ্রহণ করবে না তখনই এরা ভয়

পেয়ে যাবে এবং জানবে যে তাদের চলে যাওয়া উচিৎ। যদি এরা তোমার সাথে থেকে যায় তাহলে এরা খারাপ কাজ করবে, সে সময়ে আমি এদের মোকাবিলা করতে পারব। আমি একবার হাতটা আন্দোলিত করলেই এরা অন্তর্হিত হয়ে যাবে, ছায়াটুকুও থাকবে না। কিন্তু এই কাজটা হবে না যদি তুমি এদের দেওয়া সুবিধাগুলো গ্রহণ করতে চাও।

প্রশ্ন: *পার্কে অনুশীলন করলে লোকেরা অশুভ আত্মা দ্বারা আবিষ্ট হবে কি?*

উত্তর: আমি এটা অনেকবার ব্যাখ্যা করেছি। আমরা সৎ পথে সাধনা করি। একটা সৎ মন একশটা অশুভ জিনিসকে দমন করতে পারে। সৎ পথের সাধনায় মন খুব পবিত্র থাকে, সেইজন্য কোন কিছুই তার কাছে ঘেঁষতে পারে না। ফালুন একটা দারুন জিনিস, কোনও অশুভ জিনিস তোমার সাথে জুড়তে তো পারেই না, এমন কি তোমার কাছে আসতেও ভয় পায়। তোমার বিশ্বাস না হলে তুমি অন্য জায়গায় অনুশীলন করে দেখতে পার। ওগুলো তোমাকে ভয় পায়। আমি যদি তোমাদের জানাই এখানে কত সংখ্যক অশুভ আত্মা আছে, তোমরা সবাই ভয় পেয়ে যাবে। বেশ কিছু লোক অশুভ আত্মা দ্বারা আবিষ্ট হয়ে আছে। রোগ নিরাময় এবং শরীর সুস্থ করার লক্ষ্যটা অর্জন করার পরেও অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছ, তুমি কি পেতে চাও? চিন্তা সৎ না হলে এইসব সমস্যা আসতে পারে। কিন্তু এই লোকগুলোকেও দোষ দেওয়া যায় না, কারণ তারা নিয়মগুলি জানে না। আমার জনসাধারণের মধ্যে আসার উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে, লোকেদের এই সব ভুল জিনিসগুলোকে ঠিক করা।

প্রশ্ন: *ভবিষ্যতে কোন্ কোন্ অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটবে?*

উত্তর: আমি এই বিষয়ে কোন কিছু বলতে চাই না। যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তির পরিস্থিতি ভিন্ন ভিন্ন, অতএব বলা খুবই কঠিন। বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী, ভিন্ন ভিন্ন অলৌকিক ক্ষমতার বিকাশ ঘটে। প্রধান কারণটা হচ্ছে প্রতিটি স্তরে তোমার চরিত্রটা কেমন। আসক্তিগুলোর যে দিকটা তুমি দূর করতে পারবে সেই দিকের অলৌকিক ক্ষমতাগুলিই বিকশিত হবে। কিন্তু অলৌকিক ক্ষমতাগুলি প্রাথমিক অবস্থাতেই থাকে সেইজন্য এরা বেশী শক্তিশালী হয় না। চরিত্র খুব উঁচুতে না পৌঁছানো পর্যন্ত তোমাকে অলৌকিক ক্ষমতাগুলি প্রদান করা হবে না। তবে আমাদের এই শেখানোর

ক্লাসে কিছু ব্যক্তির জন্মগত সংস্কার বেশ ভাল, তাদের ইতিমধ্যেই অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত হয়েছে, যার ফলে তাদের মধ্যে কেউ কেউ যদি বৃষ্টির মধ্যেও হাঁটাচলা করে, তবুও ভিজবে না। আবার কিছু ব্যক্তির দূর থেকে কোন জিনিসকে নড়াবার ক্ষমতাও বিকশিত হয়েছে।

প্রশ্ন: *''চরিত্রের সাধনা'' অথবা ''সমস্ত আসক্তি দূর করা'' বলতে বুদ্ধমতের 'শূন্যতা' এবং তাওমতের 'অনস্তিত্বতা' কে ইঙ্গিত করে কি?*

উত্তর: আমাদের উল্লেখিত চরিত্র এবং সদ্‌গুণ, বুদ্ধমতের 'শূন্যতা' অথবা তাওমতের 'অনস্তিত্বতা'-র অন্তর্ভুক্ত নয়, বরঞ্চ বুদ্ধমতের 'শূন্যতা' এবং তাওমতের 'অনস্তিত্বতা' আমাদের চরিত্র-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে।

প্রশ্ন: *একজন বুদ্ধ চিরকাল কি বুদ্ধই রয়ে যাবে?*

উত্তর: সাধনার মাধ্যমে আলোকপ্রাপ্তি লাভ করার পরে তোমাকে একজন আলোকপ্রাপ্ত সত্তা হিসাবে গণ্য করা হবে অর্থাৎ একজন উচ্চস্তরের সত্তা। কিন্তু এটা নিশ্চিত নয় যে তুমি কখনোই খারাপ কাজ করবে না। অবশ্য সাধারণভাবে ঐ স্তরে তুমি খারাপ কাজ করবে না, যেহেতু তুমি সত্যটা দেখতে পেয়েছ। কিন্তু তুমি যদি নিজেকে ঠিকভাবে সামলাতে না পার তাহলে তুমিও একইভাবে নীচে নেমে যাবে। যদি তুমি সর্বদা ভালো কাজ করে যাও তাহলে চিরকাল ওখানেই রয়ে যাবে।

প্রশ্ন: *উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি বলতে কি বোঝায়?*

উত্তর: এটা কিছু ব্যাপার দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে, (1) ব্যক্তির জন্মগত সংস্কার খুবই ভাল, (2) আলোকপ্রাপ্তির গুণ অসাধারণ, (3) সহ্যশক্তি প্রচন্ড, (4) আসক্তি খুবই কম, এবং পার্থিব জিনিসগুলোকে খুবই নিস্পৃহ চোখে দেখে। এরাই হচ্ছে উচ্চকোটির আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তি। এরকম লোক খুঁজে পাওয়া খুবই কঠিন।

প্রশ্ন: *যে সব লোকেদের জন্মগত সংস্কার ভালো নয়, তারা যদি ফালুন গোংগ অনুশীলন করে, তাহলে তাদের গোংগ বিকশিত হবে কি?*

উত্তর; যাদের জন্মগত সংস্কার ভালো নয় সেই সব লোকেদেরও গোংগ বিকশিত হবে, কারণ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই কিছুটা সদ্‌গুণ আছে। কোনও সদ্‌গুণ নেই এইরকম হওয়া অসম্ভব, কেউই সেইরকম নয়। এমন কি যদি তোমার শরীরে সাদা পদার্থ নাও থাকে, তাহলেও কালো পদার্থ থাকবেই। এই কালো পদার্থকে সাধনার মাধ্যমে সাদা পদার্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব, এটা শুধু একটা অতিরিক্ত ধাপ। যখন সাধনার সময়ে তুমি কষ্ট সহ্য করবে, চরিত্রের উন্নতি সাধন করবে, এবং ত্যাগ করবে তখনই তোমার গোংগ প্রাপ্তি হবে। সাধনা হচ্ছে প্রাথমিক শর্ত, তারপরেই মাস্টারের ফা-শরীর একে গোংগ-এ রূপান্তরিত করবে।

প্রশ্ন: *একজন ব্যক্তির জন্মের সাথে সাথে তার পুরো জীবনটা ছক করা থাকে। কঠিন সংগ্রামের দ্বারা একে পরিবর্তন করা যায় কি?*

উত্তর; অবশ্যই পরিবর্তন করা যায়। তোমার এই কঠিন সংগ্রামটাও ছক করা থাকে, অতএব কঠিন সংগ্রাম ছাড়া উপায় নেই। তুমি একজন সাধারণ মানুষ, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারকে পাল্টাতে পারবে না।

প্রশ্ন; *যেহেতু আমাদের দিব্যচক্ষু খোলেনি, সেক্ষেত্রে যে সব বার্তা আমরা গ্রহণ করে থাকি সেগুলো ভালো না খারাপ সেটা কীভাবে বুঝব?*

উত্তর: তোমার পক্ষে নিজে নিজে এটা আলাদা করে চিহ্নিত করা কঠিন। তোমার সাধনা প্রক্রিয়ার মধ্যে অনেক সমস্যা রাখা থাকে তোমার চরিত্রের পরীক্ষার জন্য। আমার ফা-শরীর তোমাকে জীবন হানির বিপদ থেকে রক্ষা করবে, কিন্তু ফা-শরীর কিছু সমস্যার ক্ষেত্রে দায়িত্ব নেবে না। সেসব সমস্যা তোমাকেই নিজে নিজে পার হতে হবে, তোমাকেই নিজে নিজে সমাধান করতে হবে এবং তোমাকেই নিজে নিজে উপলব্ধি করতে হবে। কিছু সময়ে যখন খারাপ বার্তা আসবে, হয়তো তারা তোমাকে আজকের লটারির নম্বরটা বলতে পারে, নম্বরটা ঠিকও হতে পারে, ভুলও হতে পারে, অথবা তারা তোমাকে অন্য কিছুও বলতে পারে, সবই এটা দেখার জন্য যে তুমি কীভাবে এগুলোর মোকাবিলা কর। তোমার মন সৎ থাকলে এগুলো ঢুকতে পারবে না। যতক্ষণ তুমি চরিত্রকে রক্ষা করে যেতে পারবে, ততক্ষণ কোন সমস্যা হবে না।

প্রশ্ন: *যখন মনের ভাব এবং মনোবল অস্থির অবস্থায় থাকে, তখন কি ক্রিয়া করতে পারি?*

উত্তর: যখন মনের ভাব খারাপ অবস্থায় থাকে তখন তুমি বসে শান্ত হতে পারবেই না। তোমার মনের মধ্যে খারাপ জিনিসের চিন্তাগুলি প্রবলভাবে বইতে থাকে। ক্রিয়া করার সময়ে বার্তাগুলি থাকে, যখন মনের মধ্যে খারাপ জিনিসের চিন্তা থাকে, তখন তোমার ক্রিয়া করার সময়ে ওই জিনিসগুলো ঢুকে পড়ে এবং তুমি নিজে অনুশীলনটাকে অশুভ তৈরি করে ফেল। তুমি যে ক্রিয়াগুলি অনুশীলন কর সেগুলো হয়তো কোনও বিখ্যাত শিক্ষক, কোনও মহান মাস্টার অথবা তন্ত্রবিদ্যার কোন জীবিত বুদ্ধ, তোমাকে শিখিয়েছেন। কিন্তু তুমি যদি তাঁদের দেওয়া চরিত্রের আবশ্যকতাগুলি কঠোরভাবে মেনে না চলো, তাহলে তুমি যেটা অনুশীলন করছ, সেটা তাঁদের সাধনার পথ নয়, যদিও তাঁরাই তোমায় এগুলো শিখিয়েছেন। তোমরা সবাই চিন্তা করো, যেমন ধরো, তুমি দন্ডায়মান অবস্থান ক্রিয়া অনুশীলন করছ এবং যথেষ্ট ক্লান্ত বোধ করছ, অথচ মনের ভেতরটা বেশ সচল রয়েছে এবং চিন্তা করছ, ‘‘আমাদের কারখানায় অমুক অত খারাপ কেন? সে আমার বিরুদ্ধে নালিশ করছে কেন? আমার বেতন কি উপায়ে বাড়াতে পারি? অথবা এখন জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যাচ্ছে, আমাকে অনেক কেনাকাটা করতে হবে।’’ তাহলে তুমি কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে অবচেতনভাবে এবং নিজের অজান্তেই অশুভ সাধনা করে ফেলছ না? অতএব যখন মনের ভাব খারাপ অবস্থায় থাকে, তখন ক্রিয়া না করাটাই সবথেকে ভালো।

প্রশ্ন: *অত্যন্ত উঁচু চরিত্রের মাপকাঠি কি?*

উত্তর: চরিত্র সাধনার থেকেই আসে, এর কোনও মাপকাঠি নেই, এটা সম্পূর্ণরূপে তোমার নিজের বোধশক্তির উপরে নির্ভর করে। তুমি যদি নিশ্চিতভাবে চরিত্রের মাপকাঠি নিয়ে বলতে চাও সেক্ষেত্রে তুমি যখন কোন কিছুর সম্মুখীন হবে তখন চিন্তা করা উচিৎ: ‘‘যদি কোন আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি এর সম্মুখীন হতেন, তাহলে তিনি কি করতেন?’’ আদর্শবান ব্যক্তিরা অবশ্যই অসাধারণ, কিন্তু তারা শুধু সাধারণ মানুষদের জন্য উদাহরণ সৃষ্টিকারী ব্যক্তি মাত্র।

প্রশ্ন: *অন্য চিগোংগ মাস্টারদের প্রত্যেকটা আলোচনা এবং বক্তৃতাকে সন্দেহজনক ভাবে দেখা উচিৎ নয়। যদি আমরা কোন ঠগবাজের পাল্লায় পড়ি যে টাকার জন্য লোকেদের ঠকায়, তখন কি করব?*

উত্তর: তোমরা হয়তো এই ধরনের কোন কিছুর সম্মুখীন হবে না। তারা কি বলছে সেটা তোমাদের প্রথমে দেখা উচিৎ। তুমি নিজে নিজেই বিচার করবে যে লোকটা ঠগবাজ কিনা। একজন চিগোংগ মাস্টার ভালো কি মন্দ সেটা তার চরিত্রের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে। ব্যক্তির চরিত্র যত উঁচু হবে তার গোংগও তত উঁচু হবে।

প্রশ্ন: *কর্ম অথবা বৌদ্ধধর্মে উল্লেখিত‘‘কর্মের ঋণ’’ কীভাবে দূর করব?*

উত্তর: সাধনা নিজেই কর্ম দূর করে। সব থেকে ভালো উপায় হচ্ছে নিজের চরিত্রের উন্নতি সাধন করা। তাহলেই তোমার কালো পদার্থ গুলো সাদা পদার্থ সদ্‌গুণ-এ রূপান্তরিত হবে, এবং তখন সদ্‌গুণ গোংগ-এ রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন: *ফালুন গোংগ অনুশীলনে আমাদের কোন অনুশাসন মেনে চলতে হবে কি?*

উত্তর: বৌদ্ধধর্মে যে সব জিনিসে নিষেধ আছে তার বেশীর ভাগ আমরাও করতে পারি না, কিন্তু আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিটা আলাদা। আমরা সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী নই, আমরা সাধারণ মানুষদের মধ্যে জীবনযাপন করি, সেইজন্য এটা আলাদা। কিছু জিনিসকে নিস্পৃহভাবে দেখলেই হবে। অবশ্য, তোমার গোংগ সামর্থ্য নিরন্তর বৃদ্ধি হতে হতে যখন খুব উঁচুস্তরে পৌঁছে যাবে, তখন তোমার চরিত্রের আবশ্যকতাও খুব উঁচু হবে।

4. দিব্যচক্ষু

প্রশ্ন: *যখন মাস্টার বক্তৃতা দিচ্ছিলেন আমি তাঁর মাথার উপরে তিন ফুট উঁচু সোনালী রঙের জ্যোর্তিবলয় দেখেছি এবং তাঁর মাথার আকারে অনেক সোনালী রঙের জ্যোর্তিবলয় তাঁর পেছনে ছিল ।*

উত্তর: এই ব্যক্তির দিব্যচক্ষু ইতিমধ্যেই বেশ উঁচু স্তরে পৌঁছে গেছে।

প্রশ্ন: *মাস্টারের শিষ্যরা যখন অন্যদের রোগ নিরাময় করছিল, তখন যেন সুরার সঙ্গে সোনালী আলো মিশ্রিত হয়ে তাদের মুখ থেকে নির্গত হয়ে সুক্ষ্ম কণার মতো ছড়িয়ে পড়ছিল।*

উত্তর: আমি বলব এই ব্যক্তি বেশ ভালো সাধনা করেছে, সে নির্গত হওয়া অলৌকিক ক্ষমতাগুলিকে দেখতে পারছিল।

প্রশ্ন: *যদি একজন বাচ্চার দিব্যচক্ষু খুলে যায় তাহলে তার কোনও প্রভাব পড়ে কি? দিব্যচক্ষু খোলা থাকলে শক্তি নির্গত হয় কি?*

উত্তর: ছয় বছর বয়সের নিচের বাচ্চাদের দিব্যচক্ষু খুব সহজেই খুলে যায়। যদি বাচ্চা অনুশীলন না করে তাহলে দিব্যচক্ষু খোলা থাকলে, শক্তি নির্গত হবে, তার পরিবারের মধ্যে একজনের অনুশীলন করা উচিৎ। সব থেকে ভালো হয় প্রত্যেকদিন একবার করে তাকে দিব্যচক্ষুর ভিতর দিয়ে তাকে দেখতে দেওয়া, তাহলে দিব্যচক্ষু বন্ধ হবে না, এবং একই সাথে বেশী শক্তি নির্গত হবে না। ছোট বাচ্চাদের পক্ষে সবথেকে ভালো হয় নিজে নিজে সাধনা করা। যত বেশী তারা দিব্যচক্ষু ব্যবহার করবে তত বেশী শক্তি নির্গত হতে থাকবে। তার ভৌতিক শরীরের উপরে কোনও প্রভাব পড়ে না, তবে তার সব থেকে মূল জিনিসগুলির উপরে পড়ে। কিন্তু যদি বাচ্চার জিনিসগুলি ভালোভাবে সংরক্ষণ করা যায় তাহলে কোনও প্রভাব পড়বে না। এইমাত্র আমি যা বললাম সেটা বাচ্চাদের জন্য, বড়োদের জন্য নয়। কিছু লোকের দিব্যচক্ষু পুরোপুরি খুলে গেছে, তারা শক্তি নির্গত হয়ে যাওয়াকে ভয় পায় না। কিন্তু তারা উঁচু স্তরের জিনিসগুলিকে দেখতে পারে না। আবার কেউ কেউ খুব উঁচুস্তরের জিনিস দেখতে পায়, যখন সে দেখে, তখন ফা-শরীর অথবা অন্য কোন উঁচুস্তরের মাস্টার তাকে শক্তি প্রদান করে, এটা কোনও সমস্যা নয়।

প্রশ্ন: *আমি মাস্টারের শরীরে সোনালী দীপ্তি দেখেছি, এমন কি মাস্টারের ছায়াতেও দেখেছি। কিন্তু সেগুলো চোখের পলকে অন্তর্হিত হয়ে গেল। ব্যাপারটা কি হল?*

উত্তর: ওটা আমার ফা-শরীর। আমি বক্তৃতা দিচ্ছি এবং আমার মাথার উপরে একটা শক্তি স্তম্ভ আছে, আমার স্তর অনুযায়ী সেটা এই রকম। চোখের পলকে এটা অন্তর্হিত হয়ে গেল কারণ তুমি দিব্যচক্ষু কীভাবে

ব্যবহার করতে হয় সেটা জান না, তুমি ভৌতিক চোখ ব্যবহার করে দেখতে চেয়েছিলে।

প্রশ্ন: *অলৌকিক ক্ষমতাগুলির প্রয়োগ কি করে করব?*

উত্তর: আমি ভাবছি যদি কেউ অলৌকিক ক্ষমতাকে সামরিক বিজ্ঞান, অথবা অন্য উচ্চতর প্রযুক্তিতে অথবা গোয়েন্দাগিরিতে প্রয়োগ করতে পারে, তাহলে সমস্যা হবে। আমাদের এই বিশ্বের একটা প্রকৃতি আছে। যদি ক্ষমতাগুলির প্রয়োগ বিশ্বের প্রকৃতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হয় তাহলে সেগুলো কাজ করবে, যদি সংগতিপূর্ণ না হয় তাহলে কাজ করবে না। এমন কি কাউকে এগুলির দ্বারা ভালো কাজ করতে বললেও, সে হয়তো উঁচু স্তরের কোন জিনিস প্রাপ্ত হবে না। সে হয়তো এগুলোকে শুধু অনুভব বা বোধ করতে পারবে। যদি কেউ ছোটখাট অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োগ করে তাহলে মানব সমাজের স্বাভাবিক বিকাশের ক্ষেত্রে কোনও ক্ষতি হবে না। যদি কেউ কিছু জিনিসের পরিবর্তন করতে চায়, এবং যখন সেটা বেশ বিরাট ব্যাপার হয়, সেক্ষেত্রে সেটা তার করার প্রয়োজন আছে কি নেই, সে ব্যাপারে তার বক্তব্যকে হিসাবের মধ্যে ধরা হয় না। কারণ এই সমাজের বিকাশ তার ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটে না। সে হয়তো কোন কিছু প্রাপ্ত করতে চায়, কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তার হাতে নেই।

প্রশ্ন: *একজন ব্যক্তির চেতনা কীভাবে তার শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে এবং বাইরে বের হয়?*

উত্তর: আমরা যে চেতনার কথা বলি সেটা সাধারণত মাথার উপর দিয়ে বের হয়। অবশ্য এটা এইভাবে বের হওয়ার মধ্যেই সীমিত নয়। এটা শরীরের যে কোন স্থান দিয়েই বের হতে পারে, যা অন্য সাধনা পদ্ধতিগুলোর থেকে আলাদা, যেখানে জোর দিয়ে বলা হয় যে এটা মাথার উপর দিয়েই শরীরকে ছাড়তে পারে। একই ব্যাপার ঘটে শরীরের ভেতরে প্রবেশের ক্ষেত্রেও।

প্রশ্ন: *দিব্যচক্ষুর জায়গায় একটা লাল আলো আছে, তার মধ্যে আছে একটা কালো গর্ত, যা খুব দ্রুত প্রস্ফুটিত হয়, দিব্যচক্ষু খুলেছে কি? কখনো কখনো নক্ষত্রের আলো এবং বিদ্যুতের ঝলকও সঙ্গে দেখা যায় কেন?*

উত্তর: যখন তুমি নক্ষত্রের আলো দেখছ তার মানে দিব্যচক্ষু খুলে যাবে। যখন বিদ্যুতের ঝলক দেখছ তখন এটা বস্তুত পুরোপুরিই খুলে গেছে।

প্রশ্ন: *আমি মাস্টারের মাথার উপরে এবং শরীরের উপরে লাল এবং সবুজ রঙের জ্যোর্তিবলয় দেখেছি। কিন্তু চোখ বন্ধ করার পরে আর কোন কিছু দেখতে পেলাম না। আমি কি প্রান্তিক দৃষ্টি দিয়ে দেখেছি।*

উত্তর: তুমি প্রান্তিক দৃষ্টি ব্যবহার কর নি। তুমি শুধু চোখ বন্ধ করে কীভাবে দেখতে হয়, সেটা জান না, তুমি চোখ খোলা রেখে দেখতে পার। প্রায়শই লোকেরা তাদের ইতিমধ্যে খুলে যাওয়া দিব্যচক্ষুর ব্যবহার জানে না। কখনো কখনো অনিচ্ছাকৃতভাবে তারা চোখ খোলা অবস্থায় কিছু জিনিস দেখতে পারে। কিন্তু যখনই ভালোভাবে তুমি জিনিসগুলি দেখতে চাইছ, তুমি বস্তুত নিজের চোখ ব্যবহার করতে শুরু করেছ, সেইজন্য জিনিসগুলো আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। যখন তুমি মনোযোগ দিচ্ছ না, তখন আবার দেখতে পারবে।

প্রশ্ন; *আমার মেয়ে আকাশে কিছু বৃত্ত দেখতে পায়, কিন্তু সে পরিষ্কার করে বলতে পারে না, আমার তাকে ফালুন প্রতীক চিহ্ন দেখালে সে বলে এটাই সেগুলো। তার দিব্যচক্ষু সত্যিই খুলে গেছে কি?*

উত্তর: ছয় বৎসরের নিচের বয়সের বাচ্চারা ফালুন প্রতীক চিহ্নের উপরে একবার তাকালেই তাদের দিব্যচক্ষু খুলে যেতে পারে। যাইহোক তোমার এটা করা উচিত নয়। ছোট বাচ্চারা এটা দেখতে পারে।

প্রশ্ন: *দিব্যচক্ষু খুলে গেছে কিন্তু প্রয়োগ করতে পারছি না, দয়া করে মাস্টার এটা ব্যাখ্যা করবেন?*

উত্তর: দিব্যচক্ষু পুরোপুরি খুলে গেলে, এমন কি সে আগে প্রয়োগ করতে না জানলেও তখন এটার প্রয়োগ জেনে যাবে। যখন এটা অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে যাবে এবং প্রয়োগ খুব সহজ হয়ে যাবে এমন কি যে লোকেরা পূর্বেও এর প্রয়োগ জানত না, তখন তারাও এর প্রয়োগ জানতে পারবে। দিব্যচক্ষু প্রয়োগ করে জিনিস দেখাটা অনিচ্ছাকৃতভাবে ঘটবে। যখন তুমি আরও যত্ন নিয়ে দেখতে চাইবে তখন বিনা ইচ্ছাতেই তুমি তোমার নিজের চোখ

ব্যবহার করতে চেষ্টা করবে এবং অক্ষি স্নায়ু ব্যবহার করবে, অতএব তুমি আর কিছুই দেখতে পারবে না।

প্রশ্ন: *দিব্যচক্ষু খুলে গেলে আমরা সম্পূর্ণ বিশ্ব দেখতে পারব কি?*

উত্তর: আমাদের দিব্যচক্ষু খোলার ক্ষেত্রে স্তর ভাগ আছে, অর্থাৎ কতটা সত্য তুমি দেখতে পারবে সেটা তোমার স্তরের দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে থাকে। দিব্যচক্ষু খুলে যাওয়ার অর্থ এটা নয় যে তুমি বিশ্বের সমস্ত কিছু দেখতে পারবে। কিন্তু তুমি আরও সাধনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে তোমার স্তরের উন্নতি করবে, সবশেষে আলোকপ্রাপ্তি হলে তখন তুমি আরও অনেক কিছু দেখতে সক্ষম হবে। এমন কি তখনও তুমি যা দেখবে সেটাই যে সম্পূর্ণ বিশ্বের সত্য সেটাও নিশ্চিত নয়। কারণ শাক্যমুনি যখন তার জীবনকালে ধর্ম প্রচার করেছিলেন, তখন তিনি অবিরাম নিজের উন্নতি সাধন করে যাচ্ছিলেন। প্রত্যেকটা সময়ে যখন নতুন নতুন স্তরে পৌঁছাতেন তখন আবিষ্কার করতেন যে, এতদিন ধরে যে ধর্ম প্রচার করে আসছিলেন সেটা স্থায়ী নয়। আরও উঁচু স্তরে পৌঁছে তিনি আবার দেখতেন যে ঠিক আগে তার বলা কথাগুলি সঠিক নয়। সেইজন্য শেষে তিনি, বলেছিলেন: ‘‘কোনও ধর্মই নিশ্চিত নয়’’। প্রত্যেকটা স্তরে আছে তার নিজস্ব নিয়মাবলি। এমন কি তাঁর পক্ষেও সম্পূর্ণ বিশ্বের সত্যটা জানা অসম্ভব ছিল। আমাদের সাধারণ লোকেদের দৃষ্টির স্তর অনুযায়ী, এই পৃথিবীতে সাধনার মাধ্যমে তথাগত স্তর অর্জন করাটাই একটা অকল্পনীয় ব্যাপার মনে হয়। কারণ তারা শুধু এই তথাগত স্তরের কথাই জানে। তারা জানেই না যে আরও উঁচু উঁচু স্তর আছে সেইজন্য তারা উচ্চতর জিনিস জানতে বা গ্রহণ করতে পারে না। তথাগত হচ্ছে বুদ্ধ ফা-এর একটা খুব নীচের স্তর। এই ইঙ্গিতটা পাওয়া যায় এই কথা থেকে, ‘‘মহান ফা সীমাহীন।’’

প্রশ্ন: *আমরা আপনার শরীরে যে সব জিনিস দেখতে পারছি সে সবের সত্যিই অস্তিত্ব আছে কি?*

উত্তর: অবশ্যই। এগুলোর সত্যিই অস্তিত্ব আছে। সব মাত্রাগুলিই পদার্থ দিয়ে তৈরি, শুধুমাত্র তাদের গঠনপ্রণালীটা আমাদের থেকে আলাদা।

প্রশ্ন: *ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার পূর্বাভাসগুলি প্রায়ই সত্য হয়।*

উত্তর: এটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ বাণী করার অলৌকিক ক্ষমতা যেটার সম্বন্ধে আমরা আগেই আলোচনা করেছি, প্রকৃতপক্ষে এটা একটা নীচুস্তরের ক্ষমতা যার সাহায্যে ভাগ্যকে জানতে পারা যায়। আমরা যে গোংগ-এর সাধনা করি সেটা অন্য মাত্রাতে আছে যেখানে সময়-মাত্রার কোনও ধারণা নেই; দূরত্ব যত বেশীই হোক না কেন সব একই ব্যাপার।

প্রশ্ন: *অনুশীলনের সময়ে রঙ্গিন মানুষ, রঙ্গিন আকাশ এবং চিত্র সমূহের আবির্ভাব কেন ঘটে?*

উত্তর: তোমার দিব্যচক্ষু খুলে গেছে। তুমি যা দেখেছ সে সব অন্য মাত্রার জিনিস। ওই মাত্রাটা স্তরে স্তরে ভাগ করা আছে তুমি হয়তো এর কোন একটা স্তর দেখেছ, যা এই রকম সুন্দর।

প্রশ্ন: *অনুশীলনের সময়ে আমি জোরে একটা শব্দ শুনলাম এবং বোধ হল যেন আমার শরীরটা ফেটে খুলে গেল, হঠাৎ আমি অনেক কিছু পরিষ্কার বুঝতে পারলাম, কেন?*

উত্তর: কিছু লোকের ক্ষেত্রে সহজেই এই ধরনের অভিজ্ঞতা ঘটে। এটা একটা প্রক্রিয়া যেখানে শরীরের একটা অংশ ফেটে খুলে যায় এবং কিছু ব্যাপারে তোমার আলোকপ্রাপ্তি হয়। এটা পর্যায়ক্রমিক আলোকপ্রাপ্তির শ্রেণীভূক্ত। তুমি যখন একটা স্তরের সাধনা শেষ করবে, শরীরের একটা অংশ ফেটে খুলে যাবে, এসবই স্বাভাবিক।

প্রশ্ন: *সময়ে সময়ে এরকম বোধ হয় যেন আমি নড়তে পারছি না, কারণটা কি?*

উত্তর: সাধনার প্রাথমিক পর্যায়ে তোমার হয়তো হঠাৎ বোধ হল যে তুমি যেন তোমার হাত অথবা শরীরের কোনও অংশ নাড়াতে পারছ না। কেন এইরকম হয়? এর কারণ তুমি একটা অলৌকিক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছ যাকে বলে ''ডিংগ (স্থির) গোংগ''। এটা তোমার জন্মগত ক্ষমতাগুলির একটা এবং খুবই শক্তিশালী। যখন কেউ খারাপ কাজ করে পালাতে থাকে, তুমি বলতে পার ''ডিংগ'' তৎক্ষণাৎ সে আর নড়তে পারবে না।

প্রশ্ন: *কখন আমরা অন্যদের রোগ নিরাময় করতে পারব? আমি পূর্বে অন্যদের রোগের চিকিৎসা করতাম, কিছু ক্ষেত্রে রোগ নিরাময় হতো।*

আমার ফালুন গোংগ শেখার পরে যদি লোকেরা আমার কাছে রোগ নিরাময়ের জন্য আসে তাহলে আমি কি চিকিৎসা করব?

উত্তর: আমার মনে হয় এই ক্লাসের লোকেদের ক্ষেত্রে তোমরা পূর্বে যে ধরনের ক্রিয়াই অনুশীলন করে থাক না কেন, এবং যত বেশী দিন ধরেই অনুশীলন করে থাক না কেন, অথবা লোকেদের রোগ নিরাময় করার স্তরে পৌঁছাতে পেরেছ কি পার নি, এই নীচু স্তরে, আমি চাই না যে তোমরা লোকেদের রোগের চিকিৎসা কর, কারণ তোমরা নিজেরাও, এমন কি জান না যে তোমরা কোন অবস্থায় আছ। যদি তুমি পূর্বে লোকেদের রোগ নিরাময় করে থাক তার কারণ হয়তো সেই সময়ে তোমার সৎ মানসিকতা ছিল, যেটা কাজ করেছিল, অথবা পাশ দিয়ে অতিক্রম করা কোন মাস্টার তোমাকে সাহায্য করেছিল, যেহেতু তুমি ভালো কাজ করেছিলে। সাধনার মাধ্যমে যে শক্তি তোমার বিকশিত হয়েছে, তাই দিয়ে কিছু কাজ করতে পারবে কিন্তু এটা তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। রোগীর চিকিৎসা করার সময়ে তুমি ও রোগী একই ক্ষেত্রে থাকবে। একটা সময়ের পরে রোগীর কালো চি তোমাকে রোগীর থেকেও বেশী অসুস্থ করে তুলবে। তুমি যদি রোগীকে জিজ্ঞাসা কর, ''তুমি ভালো আছ কি?'' সে বলবে ''কিছুটা ভালো আছি'' এটা কি ধরনের চিকিৎসা? কিছু চিগোংগ মাস্টার বলে: ''আগামীকাল একবার আসবে এবং পরশুদিন আবার একবার আসবে, আমি তোমাকে একটা পর্ব ধরে চিকিৎসা করব'' এবং সে চিকিৎসায় পর্বের কথাও বলে থাকে। এটা কি লোককে ঠকানো নয়? উঁচুস্তরে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপরে লোকেদের চিকিৎসা করাটা বেশী ভালো হবে না কি? যাকেই চিকিৎসা করবে সেই ভালো হয়ে যাবে, সেটা কত বেশী আনন্দের ব্যাপার হবে! যদি তোমার গোংগ বিকশিত হয়ে থাকে এবং সেটা যদি নীচু স্তরের না হয় এবং এটা যদি আবশ্যক হয় যে তোমাকে রোগের চিকিৎসা করতেই হবে, তাহলে আমি তোমার হাত খুলে দিয়ে, রোগের চিকিৎসা করার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদান করব। কিন্তু তুমি যদি উঁচুস্তরে সাধনা করতে চাও তাহলে আমার মনে হয়, এই ধরনের জিনিস না করাই সব থেকে ভালো। মহান ফা-এর প্রচারের জন্য এবং সামাজিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ করার জন্য আমার কিছু শিষ্য রোগের চিকিৎসা করেছিল। যেহেতু তারা আমার হয়ে চিকিৎসা করেছিল, এবং আমার দ্বারা প্রশিক্ষিত ও সুরক্ষিত ছিল, সেইজন্য কোন সমস্যা হয় নি।

প্রশ্ন: *অলৌকিক ক্ষমতার উদয় হলে অন্যদের বলা যাবে কি?*

উত্তর: যারা ফালুন গোংগ অনুশীলন করে তাদের বলা যেতে পারে, তবে তোমাকে বিনয়ী হতে হবে, তাহলে কোন সমস্যা নেই। তোমাদের সবার একত্রে অনুশীলন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, তোমরা যাতে পরস্পরের মধ্যে নিজেদের অভিজ্ঞতা এবং মতামতগুলির বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষালাভ করতে পার। অবশ্য তোমার সঙ্গে যদি বাইরের সেইসব লোকেদের সাক্ষাৎ হয়, যাদের অলৌকিক ক্ষমতা আছে, তাহলে তাদেরও বলতে পার, শুধু জাহির করে না বললেই হল, তাহলে সেটা সত্যিই কোনও ব্যাপার নয়। কিন্তু যদি তুমি জাহির করে বলতে চাও যে তুমি কত ক্ষমতাশালী তাহলে সমস্যা হতে পারে। যদি অনেকদিন ধরে জাহির করে বেড়াও তাহলে তোমার অলৌকিক ক্ষমতাগুলি আর থাকবে না। যদি তুমি চিগোংগের ঘটনাগুলো সম্বন্ধে কথা বলতে চাও এবং আলোচনা করো, এবং তোমার নিজের কোনও বিভ্রান্তিকর চিন্তা না মেশাও তাহলে আমি বলছি যে কোনও সমস্যা হবে না।

প্রশ্ন: *বুদ্ধমতে শূন্যতা নিয়ে বলে এবং তাওমতে অনস্তিত্বতা নিয়ে বলে, আমরা কি নিয়ে বলব?*

উত্তর: বুদ্ধমতের ‘‘শূন্যতা’’ এবং তাওমতের ‘‘অনস্তিত্বতা’’ তাদের সাধনা পথের বিশিষ্ট ব্যাপার। অবশ্য আমাদের এখানেও ওই স্তরে পৌঁছনো আবশ্যক, আমরা উদ্দেশ্য নিয়ে সাধনার কথা বলি এবং অনিচ্ছাকৃতভাবে গোংগ প্রাপ্তির কথা বলি। চরিত্রের সাধনা করলে এবং আসক্তিগুলোকে পরিত্যাগ করলে শেষে তার ফলও শূন্যতা এবং অনস্তিত্বতা। কিন্তু ওগুলোকে আমরা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিই না। যেহেতু তোমাকে এই বস্তুগত পৃথিবীতে জীবনযাপন করতে হয়। সেইজন্য তোমার কর্মক্ষেত্রে যাওয়া প্রয়োজন এবং একটা জীবিকা থাকা প্রয়োজন। তোমাকে অবশ্যই কাজ করতে হবে, আর কাজ করতে গেলেই তখন অনিবার্যভাবে ভালো কাজ এবং মন্দ কাজের প্রশ্ন এসে যায়, তাহলে কি করা উচিৎ? আমরা চরিত্র-এর সাধনা করি, যা আমাদের সাধনা পদ্ধতির সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, যতক্ষণ তোমার চিন্তা সৎ থাকছে এবং তুমি যে কাজ করছ সেটা আমাদের আবশ্যকতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ থাকছে ততক্ষণ চরিত্র নিয়ে কোন সমস্যা হবে না।

প্রশ্ন: *আমরা সাধারণভাবে কি উপায়ে আমাদের অলৌকিক ক্ষমতাগুলির বিকাশকে অনুভব করতে পারব?*

উত্তর: তোমার সাধনার প্রারম্ভিক অবস্থায় যদি অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত হয় তাহলে সেটা অনুভব করা সম্ভব। যদি অলৌকিক ক্ষমতা এখনও বিকশিত না হয়ে থাকে অথচ শরীর সংবেদনশীল থাকে, সেক্ষেত্রে অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত হলে অনুভব করতে পারবে। যদি এই দুটোর কোনওটাই না থাকে তাহলে তোমার পক্ষে অনুভব করার কোন উপায় নেই, এক্ষেত্রে তুমি যা করতে পার সেটা হচ্ছে ওগুলোর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সাধনা করে যাওয়া। আমাদের ষাট থেকে সত্তরভাগ শিক্ষার্থীর দিব্যচক্ষু খুলে গেছে এবং তারা দেখতেও পারে, আমি সবই জানি। যদিও তোমরা কিছু বল না, তোমরা তোমাদের চোখ পুরো খুলেই দেখে থাক। আমি তোমাদের একত্রে অনুশীলন করতে কেন বলি? আমি চাই তোমরা নিজেদের ছোট ছোট গোষ্ঠীর মধ্যে আলোচনা এবং মত বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষালাভ কর। কিন্তু সাধনা পদ্ধতির উপরে দায়িত্বশীল থাকার জন্য তোমার নিজের গোষ্ঠীর বাইরে লাগামছাড়া কথা বলবে না। নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে আলোচনা এবং মত বিনিময়ের মাধ্যমে উন্নতিসাধন করাটা গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন: *ফা-শরীর কিরকম দেখতে? আমার ফা-শরীর আছে কি?*

উত্তর: একজন ব্যক্তির ফা-শরীর, সেই ব্যক্তির মতই দেখতে হয়। তোমার এখনও ফা-শরীর নেই, তোমার সাধনা যখন একটা বিশেষ জায়গায় পৌঁছাবে, তুমি ত্রিলোক ফা সাধনা শেষ করে অত্যন্ত উঁচুস্তরে প্রবেশ করলে একমাত্র তখনই ফা-শরীর বিকশিত হবে।

প্রশ্ন: *এই ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরে মাস্টারের ফা-শরীর আর কতদিন আমার সঙ্গে থাকবে?*

উত্তর: একজন শিক্ষার্থী হঠাৎ করে উঁচুস্তরের জিনিসের সাধনা শুরু করলে, সেটা তার ক্ষেত্রে একটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হয়ে যায়। এটা কেবল তার চিন্তার পরিবর্তন নয়, বরঞ্চ সম্পূর্ণ ব্যক্তির পরিবর্তনের দিকে ইঙ্গিত করে। একজন সাধারণ মানুষ যদি হঠাৎ করে এমন একটা জিনিস পায় যেটা একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে তার পাওয়ার কথা নয়, তখন সেটা বিপদজনক হয়ে যায় এবং তার জীবন সংকটে পড়ে যায়। তখন আমার ফা-শরীর অবধারিত ভাবে তাকে সুরক্ষা প্রদান করবে। আর যদি এইটুকু কাজ না করি, এবং ফা-এর প্রচার করি তাহলে সেটা লোকেদের ক্ষতি

করার সমান। অনেক চিগোংগ মাস্টারই সাধনা শেখাতে এবং এই রকম কাজ করতে ভয় পায় কারণ তারা এই দায়িত্বটা বহন করতে পারে না। আমার ফা-শরীরগুলো তোমাকে সর্বদা সুরক্ষা প্রদান করে যাবে, যতক্ষণ না তোমার আলোকপ্রাপ্তি ঘটে। যদি তুমি মাঝপথে সাধনা ছেড়ে দাও, তাহলে আমার ফা-শরীরগুলো নিজেরাই তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে।

প্রশ্ন: *মাস্টার বলেন, ''সাধারণ লোকেদের সাধনা, ক্রিয়া করার উপরে নির্ভর করে না, কিন্তু চরিত্রের উপরে নির্ভর করে''। এটা বলতে পারা যায় কি যে ব্যক্তির চরিত্র উঁচু থাকলে, সে ক্রিয়াগুলি না করেই সাধনায় সঠিক ফল প্রাপ্ত করতে পারবে ?*

উত্তর: তত্ত্বগতভাবে ব্যাপারটা এই রকমই। যতক্ষণ চরিত্রের সাধনা করতে থাকবে, সদ্‌গুণকে গোংগ-এ রূপান্তরিত করা যাবে। কিন্তু তুমি অবশ্যই নিজেকে সাধক মনে করবে। যদি নিজেকে সাধক না মনে কর তাহলে সদ্‌গুণ সঞ্চয় হতে থাকবে, তুমি হয়তো বিরাট পরিমাণ সদ্‌গুণ সঞ্চয় করে ফেলতে পার, সর্বদা সৎ মানুষ হিসাবে থেকে সদ্‌গুণ সঞ্চয় করতে থাকবে। এমন কি নিজেকে সাধক হিসাবে বিবেচনা করেও তুমি আর এগোতে পারবে না, যেহেতু তুমি উঁচুস্তরের ফা সম্বন্ধে জান না। তোমরা সবাই জান যে আমি অনেক জিনিস ব্যক্ত করেছি। মাস্টারের সুরক্ষা ছাড়া, উঁচুস্তরের সাধনা করা খুবই কঠিন। এমন কি একটা দিনও তুমি উঁচুস্তরে সাধনা করতে পারবে না। সেইজন্য সাধনায় সঠিক ফল প্রাপ্ত করা অত সহজ নয়। কিন্তু তোমার চরিত্রের উন্নতি সাধনের পরে তুমি বিশ্বের প্রকৃতির সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে যেতে পার।

প্রশ্ন: *দূর নিয়ন্ত্রিত চিকিৎসার তত্ত্ব কি?*

উত্তর: তত্ত্বটা খুবই সরল, বিশ্ব বড়ো হয়ে যেতে পারে ছোটও হয়ে যেতে পারে, অলৌকিক ক্ষমতার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে। আমি প্রাথমিকভাবে একটা জায়গায় থাকব, কোথাও যাব না, কিন্তু যে অলৌকিক ক্ষমতা নির্গত করব সেটা আমেরিকার মতো অতটা দূরবর্তী স্থানে কোনও রুগীর কাছে পৌঁছে যাবে (তার চিকিৎসা করার জন্য)। আমি অলৌকিক ক্ষমতাটাকে তার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি অথবা সরাসরি তার আত্মাকে এখানে আহ্বান করেও আনতে পারি। এটাই হচ্ছে দূর নিয়ন্ত্রিত চিকিৎসার তত্ত্ব।

প্রশ্ন: *কত রকমের অলৌকিক ক্ষমতা বিকশিত হতে পারে, সেটা জানতে পারি কি?*

উত্তর: দশ হাজারেরও বেশী অলৌকিক ক্ষমতা আছে। নির্দিষ্টভাবে ঠিক কতগুলো আছে সেটা জানার প্রয়োজন নেই। এই তত্ত্ব এবং এই ফা জানাটাই যথেষ্ট, বাকিটুকুর জন্য তোমাকে নিজেকেই সাধনা করতে হবে। খুব বেশি জিনিস জানার আবশ্যকতাও নেই এবং সেটা তোমার পক্ষে ভালোও নয়। একজন মাস্টার প্রথাগতভাবে শিষ্যের খোঁজ করে এবং তাকে গ্রহণ করে, কিন্তু শিষ্য কোন কিছুই জানে না এবং মাস্টারও তাকে কিছু বলেন না। সবকিছু তাকে নিজেকেই উপলব্ধি করতে হবে।

প্রশ্ন: *আমি ক্লাসে চোখ বন্ধ করে দেখতে পারছি যে আপনি মঞ্চের উপর থেকে বক্তৃতা দিচ্ছেন, আপনার শরীরের উপরের ভাগটা কালো, টেবিলটাও কালো, আপনার পেছনের পোষাকটা গোলাপী রঙের, কখনো কখনো সবুজ রঙের আলো আপনাকে ঘিরে থাকছে। এটা কি হচ্ছে?*

উত্তর: এটা তোমার স্তরের প্রশ্ন। দিব্যচক্ষু ঠিক যখন খোলে তখন তুমি সাদাকে কালো দেখবে এবং কালোকে সাদা দেখবে। তোমার স্তরের কিছুটা উন্নতি হওয়ার পরে সব কিছু তুমি সাদা দেখবে। পুনরায় স্তরের উন্নতি হওয়ার পরে রঙগুলোকে পৃথক করতে পারবে।

5. দুর্ভোগ

প্রশ্ন: *দুর্ভোগগুলো কি মাস্টার শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যবস্থা করে রাখেন?*

উত্তর: তোমরা এরকম বলতে পার। এগুলো তোমাদের চরিত্রের উন্নতির জন্য ব্যবস্থা করা থাকে। যেমন ধরো, তোমার চরিত্র আবশ্যক স্তর পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে নি, তাহলে তোমার সাধনা সম্পূর্ণ হয়ে আলোকপ্রাপ্তি হবে কি? যেমন একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রকে কলেজে পাঠালে সেটা ঠিক হবে কি? আমার মনে হয় না সেটা ঠিক হবে! যখন তোমার চরিত্রের সত্যিকারের উন্নতি ঘটে নি, যখন তুমি সব কিছুকে নিস্পৃহভাবে দেখতে পারছ না, যখন তুমি সব কিছুকে পরিত্যাগ করতে পারছ না, তখন যদি তোমাকে উঁচুস্তরে সাধনা করতে দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে কোন একটা সামান্য

ব্যাপার নিয়ে তুমি একজন আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দেবে, সেটা গ্রহণযোগ্য নয়! কেন আমরা চরিত্রের উপর এতটা গুরুত্ব দিই, এটাই তার কারণ।

প্রশ্ন: *সাধক এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের মধ্যে তফাৎটা কি?*

উত্তর: আমাদের সাধকদের সঙ্গে সাধারণ মানুষদের দুর্ভোগের মধ্যে খুব একটা তফাৎ নেই। তোমার সাধনার পথ অনুযায়ী তোমার দুর্ভোগগুলোকে সুবিন্যস্ত করা আছে। সাধারণ মানুষেরা কর্মের ঋণ শোধ করছে, তাদের সবারই দুর্ভোগ আছে। এর অর্থ এই নয় যে, তুমি যেহেতু সাধক, সেইজন্য তোমার দুর্ভোগ থাকবে এবং যেহেতু সে সাধারণ মানুষ, তার দুর্ভোগ থাকবে না। দুটো ক্ষেত্রে একই ব্যাপার। এটা শুধু এই যে তোমার দুর্ভোগগুলোকে সাজানো আছে তোমার চরিত্রের উন্নতি সাধনের জন্য, আর তার দুর্ভোগগুলোকে সাজানো আছে তার কর্মের ঋণ শোধ করার জন্য। প্রকৃতপক্ষে দুর্ভোগগুলো তোমার নিজেরই কর্ম, যেটাকে আমি তোমার (শিষ্য) চরিত্রের উন্নতির জন্য ব্যবহার করছি।

প্রশ্ন: *দুর্ভোগগুলো কি সেই একাশীটা দুর্ভোগের মত যা ঘটেছিল শাস্ত্র প্রাপ্তির জন্য পশ্চিম দিকে যাত্রার সময়ে?*

উত্তর: কিছুটা মিল আছে। সাধকের জীবন পূর্ব থেকেই বন্দোবস্ত করা থাকে, তোমার জীবনে দুর্ভোগ খুব বেশী হবে না আবার খুব কমও হবে না। কিন্তু আবশ্যক নয় যে সেটা একাশীটাই হবে। এটা নির্ভর করে তুমি তোমার জন্মগত সংস্কার অনুযায়ী কতটা উঁচু পর্যন্ত সাধনা করতে পারবে তার উপরে, সাধনায় তুমি যে স্তরটা অর্জন করতে পারবে, সেই অনুযায়ী এগুলোর পরিকল্পনা হয়ে থাকে। যা কিছু সাধারণ মানুষের থাকে অথচ সাধকের থাকা উচিৎ নয়, সে সব ত্যাগ করার প্রক্রিয়া সাধক অনুভব করতে পারবে, এটা সত্যিই কঠিন। তুমি যে সব জিনিস ত্যাগ করতে পারছ না, সেগুলো যাতে ত্যাগ করতে পার আমরা তার উপায় চিন্তা করব এবং দুর্ভোগের মাধ্যমে তোমার চরিত্রের উন্নতি ঘটবে।

প্রশ্ন: *যখন আমরা অনুশীলন করি, তখন যদি কিছু লোক ক্ষতি করার চেষ্টা করে, কি করব?*

উত্তর: যদি ফালুন গোংগ অনুশীলন কর, তাহলে অন্য লোকেরা ক্ষতি করার চেষ্টা করলে ভয় পাবে না। প্রাথমিক অবস্থায় তোমার কাছে বিরাজমান আমার ফা-শরীর তোমাকে রক্ষা করবে। কিন্তু এটা নিশ্চিত নয় যে তুমি কোনও কিছুরই সম্মুখীন হবে না। তুমি সারাদিন সোফায় বসে চায়ে চুমুক দিয়ে যাবে আর গোংগ বৃদ্ধি হতে থাকবে, ব্যাপারটা সেইরকম নয়! কখনো কখনো দুর্ভোগের সম্মুখীন হলে যদি তুমি আমার নাম ধরে ডাক তাহলে তোমার চোখের সামনে আমাকে দেখতে পারবে, আমি হয়তো তোমাকে সাহায্য করব না, কারণ এই বাধাটা তোমাকেই পার হতে হবে। কিন্তু তুমি যদি সত্যি সত্যি বিপদের সম্মুখীন হও তখন আমি তোমাকে সাহায্য করব। সে যাই হোক সত্যিকারের কোনও বিপদ থাকবে না। কারণ তোমার জীবনের পথ ইতিমধ্যেই পাল্টে দেওয়া হয়েছে এবং কোনও অপ্রত্যাশিত ঘটনা বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না।

প্রশ্ন: *দুর্ভোগগুলোকে কীভাবে সামলাব?*

উত্তর: আমি বারবার এটা জোর দিয়েছি: তোমার চরিত্রকে রক্ষা করে চল! তুমি যদি এটা নিশ্চিত করতে পার যে খারাপ কাজ করবে না, সেটা খুব ভালো। এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যখন অন্যরা কোন বিশেষ কারণে তোমার স্বার্থে অবৈধভাবে হস্তক্ষেপ করছে, তখন যদি তুমি সাধারণ মানুষের মতো প্রতিরোধ কর, তাহলে তুমিও সাধারণ মানুষ হয়ে গেলে। যেহেতু তুমি একজন সাধক, তুমি ওই রকম আচরণ করতে পার না। তুমি যখন সেসব জিনিসের মুখোমুখি হও যা তোমার চরিত্রে হস্তক্ষেপ করে সেসবই ঘটে তোমার চরিত্রের উন্নতির জন্য। তুমি কীভাবে এর মোকাবিলা করছ, তুমি নিজেকে সংযত রাখতে পারছ কি না এবং এই ব্যাপারটার মাধ্যমে নিজের চরিত্রের উন্নতি সাধন করতে পারছ কি না, এগুলোর উপরেই সবকিছু নির্ভর করছে।

6.মাত্রা এবং মানবজাতি

প্রশ্ন: *বিশ্বে কতগুলো মাত্রার স্তর আছে?*

উত্তর: আমি যতদূর জানি, এই বিশ্বে অগুণতি মাত্রার স্তর আছে। অন্য আর সব মাত্রার অস্তিত্বের ক্ষেত্রে, অন্য মাত্রাগুলিতে কি আছে এবং কারা

থাকে, সেটা আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে জানা খুব কঠিন। আধুনিক বিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত এসবের কোনও বস্তুগত প্রমাণও দেখাতে পারেনি। যদিও কিছু চিগোংগ মাস্টার এবং অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি অন্য মাত্রাগুলিকে দেখতে পারে। এর কারণ অন্য মাত্রাগুলিকে দিব্যচক্ষুর মাধ্যমে দেখা যায় এবং মানুষের ভৌতিক চোখ দিয়ে দেখা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন: *প্রত্যেক মাত্রার মধ্যে কি সত্য, করুণা এবং সহনশীলতা এই তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে?*

উত্তর: হ্যাঁ প্রত্যেক মাত্রার মধ্যে সত্য, করুণা এবং সহনশীলতা এই তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে। যে সব লোকেরা এই বৈশিষ্ট্য মেনে চলে তারা ভালো মানুষ এরং যারা এর বিরুদ্ধে তারা খারাপ মানুষ। যারা এর মধ্যে সম্মিলিত হয়ে যেতে পারে তাদের আলোকপ্রাপ্তি হয়।

প্রশ্ন: *আদি মানবজাতি কোথা থেকে এসেছিল?*

উত্তর: আদি বিশ্বে এত বেশী উল্লম্বস্তর অথবা এত বেশী অনুভূমিক স্তর ছিল না। সেটা খুব সরল ছিল, এর বিকাশ এবং আবর্তনের প্রক্রিয়ার মধ্যে জীবনের উৎপত্তি ঘটেছিল, যেটাকে আমরা বলি সব থেকে আদি জীবন, যা এই বিশ্বের অনুরূপ ছিল, সেখানে কোনও খারাপ জিনিসের অস্তিত্ব ছিল না। বিশ্বের অনুরূপ হওয়ার ফলে এই জীবন এবং বিশ্ব একই রকম ছিল এবং বিশ্বের সমস্ত ক্ষমতা তার ছিল। বিশ্বের বিকাশ এবং বিবর্তনের সাথে সাথে কতকগুলো স্বর্গলোকের আবির্ভাব ঘটেছিল। পরে আরও বেশী করে জীবনের আবির্ভাব হতে থাকল। আমাদের নীচুস্তর অনুযায়ী বলা যায় সামাজিক গোষ্ঠীগুলির উদ্ভব হল এবং পরে তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের সৃষ্টি হল। এই বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় কিছু লোকের মধ্যে পরিবর্তন ঘটল এবং বিশ্বের প্রকৃতি থেকে তারা আরও বেশী দূরে বিপথে চালিত হতে থাকল, পরিবর্তনের ফলে তারা আর অত ভালো থাকল না, তাদের ঐশ্বরিক ক্ষমতা হ্রাস পেল। সেইজন্য সাধকরা জোর দিয়ে বলে ‘‘সত্যে ফিরে চল’’, অর্থাৎ আদি অবস্থায় ফিরে চল। যার স্তর যত উঁচু হবে সে তত বেশী এই বিশ্বের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারবে এবং তার ক্ষমতাগুলি আরও শক্তিশালী হবে। সেই সময়ে বিশ্বের বিবর্তনের মধ্যে কিছু জীবন পরিবর্তিত হয়ে খারাপ হয়ে গেল, কিন্তু তারা

ধ্বংস প্রাপ্ত হল না। সেইজন্য পরিকল্পনা নেওয়া হল যাতে তারা পুনরায় উন্নতিসাধন করে, এই বিশ্বের সাথে সম্মিলিত হতে পারে। তাদের অপেক্ষাকৃত নীচের একটা স্তরে পাঠানো হল কিছুটা কষ্ট সহ্য করার জন্য, যাতে তাদের উন্নতি হতে পারে। পরে এই স্তরে অবিরাম আরও লোক আসতে থাকল। তখন এই স্তরে একটা বিভাজন ঘটল। যাদের চরিত্র আরও খারাপ হয়ে গেল তারা আর এই স্তরে থাকতে পারল না, সেইজন্য আরও নীচে পুনরায় একটা স্তর সৃষ্টি হল। ব্যাপারটা এইরকম চলতে থাকল এবং আরও নীচের দিকে ধীরে ধীরে একটার পর একটা স্তর পৃথক হয়ে তৈরি হতে থাকল যতক্ষণ না আজকের মানবজাতির এই স্তরটা তৈরি হল। এই হচ্ছে মানবজাতির উৎপত্তি।

Volunteer contacts for further information:

Kolkata	9143066856, 9830274826
Mumbai	9821381501, 9867256562
Bangalore	9886500273, 9341255561
New Delhi	9871679992, 9971513911
Nagpur	9822569386
Pune	9423215580
Gurgaon	9999218967
Hyderabad	9885476390, 9848591947
Jamshedpur	9939500428
Pondicherry	9944025970
Varanasi	9935529619
Chennai	9840125536
Kochi	9895036331

Websites:

www.falundafa.org

www.en.minghui.org

www.falundafaindia.org